Shakil Mahmud • Research Monograph

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH MONOGRAPHS

বিবর্তনের মহাযাত্রা

সমুদ্রতলের ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে জীবনের আদি উৎপত্তি থেকে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ, ডাইনোসরদের স্বর্ণযুগ এবং হোমো সেপিয়েন্সের উত্থানের মহাযাত্রা।

SHAKIL MAHMUD

গবেষক ও লেখক

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH SERIES

প্রথম সংকলিত সংস্করণ • ঢাকা ও সিঙ্গাপুর • ২০২৬

বিবর্তনের মহাযাত্রা

সমুদ্রতলের ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে জীবনের আদি উৎপত্তি থেকে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ, ডাইনোসরদের স্বর্ণযুগ এবং হোমো সেপিয়েন্সের উত্থানের মহাযাত্রা।

LIBRARY & CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA

Title: বিবর্তনের মহাযাত্রা
Author: Shakil Mahmud
Series: Shakil Mahmud Editorial & Research Series (Monograph Collection)
Subjects: Science -- History -- Philosophy -- Mathematics -- Civilization
Published: Dhaka & Singapore, 2026
Format: Digital Monograph Offprint (PDF) • Complete 20-Part Collected Edition
Permanent URI: https://shakilmahmud.com/series/evolution/

প্রস্তাবিত সাইটেশন:
Mahmud, Shakil. (2026). *বিবর্তনের মহাযাত্রা: The Complete 20-Part Collected Monograph*. Shakil Mahmud Research Series. https://shakilmahmud.com/series/evolution/

Open Scholarly Access: This collected monograph is published under Open Scholarly Access for personal study, academic citation, university pedagogy, and non-commercial research.

© 2026 Shakil Mahmud. All rights reserved. Typeset and published at Dhaka and Singapore.

Shakil Mahmud • Research Monograph

তাত্ত্বিক ভূমিকা

ভূমিকা: জ্ঞানের একীভূত রূপরেখা

চারশত কোটি বছর পূর্বে আদিম সমুদ্রতলের হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের ভূ-রাসায়নিক শক্তি থেকে প্রাণের প্রথম স্ব-অনুলিপনকারী অণুর জন্ম। এই মনোগ্রাফে ২০টি তথ্যসমৃদ্ধ অধ্যায়ে আরএনএ বিশ্ব, এন্ডোসিমবায়োসিস, ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ, স্থলের বিজয়, ডাইনোসরদের যুগ এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিবর্তনীয় মহাযাত্রা তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণামূলক কাজের উদ্দেশ্য কেবল তথ্য উপস্থাপন নয়, বরং চিন্তার গভীর বিকাশকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করা। প্রতিটি পরিচ্ছদ এক একটি যুগান্তকারী বৌদ্ধিক সংকটের সমাধান হিসেবে কীভাবে আবির্ভূত হয়েছে, তা এখানে পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো।

— Shakil Mahmud
Dhaka & Singapore, 2026

অধ্যায় সূচি

সূচিপত্র

প্রথম পর্যায়: প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় যুগ

খণ্ড ১ — অ্যাবায়োজেনেসিসের স্ফুলিঙ্গ — প্রাক-জৈবিক তাপগতিবিদ্যা, ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট এবং আরএনএ বিশ্ব — 1,251 শব্দ
অ্যাবায়োজেনেসিসের স্ফুলিঙ্গ — প্রাক-জৈবিক তাপগতিবিদ্যা, ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট এবং আরএনএ বিশ্ব

খণ্ড ২ — লুকা (LUCA) এবং জীবনের দ্বিমুখী বিস্তার — ব্যাকটেরিয়া বনাম আর্কিয়া — 1,191 শব্দ
লুকা (LUCA) এবং জীবনের দ্বিমুখী বিস্তার — ব্যাকটেরিয়া বনাম আর্কিয়া

খণ্ড ৩ — সৌরশক্তির বিপ্লব — সালোকসংশ্লেষণ, পানি বিভাজন এবং মহাজাগতিক অক্সিজেন বিপর্যয় — 1,189 শব্দ
সৌরশক্তির বিপ্লব — সালোকসংশ্লেষণ, পানি বিভাজন এবং মহাজাগতিক অক্সিজেন বিপর্যয়

খণ্ড ৪ — ইউক্যারিওটিক মহাবিস্ফোরণ — অ্যাসগার্ড আর্কিয়া, এন্ডোসিম্বিওসিস এবং জটিল কোষের উদ্ভব — 1,236 শব্দ
ইউক্যারিওটিক মহাবিস্ফোরণ — অ্যাসগার্ড আর্কিয়া, এন্ডোসিম্বিওসিস এবং জটিল কোষের উদ্ভব

খণ্ড ৫ — বহুকোষী জীবনের সূচনা — কোষীয় সংলগ্নতা, মরফোজেনেসিস এবং ইডিয়াকারান উদ্যান — 1,266 শব্দ
বহুকোষী জীবনের সূচনা — কোষীয় সংলগ্নতা, মরফোজেনেসিস এবং ইডিয়াকারান উদ্যান

দ্বিতীয় পর্যায়: মধ্যযুগীয় রূপান্তর

খণ্ড ৬ — ক্যামব্রিয়ান মহাবিস্ফোরণ — হক্স জিন, খোলসের জন্ম এবং শিকারী-শিকারের অস্ত্র প্রতিযোগিতা — 1,255 শব্দ
ক্যামব্রিয়ান মহাবিস্ফোরণ — হক্স জিন, খোলসের জন্ম এবং শিকারী-শিকারের অস্ত্র প্রতিযোগিতা

খণ্ড ৭ — কর্ডাটার সূর্যোদয় — মেরুদণ্ড, নটোকর্ড এবং মস্তিষ্কের ক্র্যানিয়াল বিবর্তন — 1,102 শব্দ
কর্ডাটার সূর্যোদয় — মেরুদণ্ড, নটোকর্ড এবং মস্তিষ্কের ক্র্যানিয়াল বিবর্তন

খণ্ড ৮ — গভীর জলের জয়যাত্রা — চোয়ালের উদ্ভাবন এবং আর্মার্ড প্লাকোডার্মের যুগ — 1,317 শব্দ
গভীর জলের জয়যাত্রা — চোয়ালের উদ্ভাবন এবং আর্মার্ড প্লাকোডার্মের যুগ

খণ্ড ৯ — জল থেকে ডাঙায় পদার্পণ — সারকোপটেরিজিয়ান টেট্রাপোডোমরফের ব্যবচ্ছেদ — 1,052 শব্দ
জল থেকে ডাঙায় পদার্পণ — সারকোপটেরিজিয়ান টেট্রাপোডোমরফের ব্যবচ্ছেদ

খণ্ড ১০ — কার্বনিফেরাস উভচর সাম্রাজ্য এবং জলনিরপেক্ষ অ্যামনিওটিক ডিমের বিপ্লব — 966 শব্দ
কার্বনিফেরাস উভচর সাম্রাজ্য এবং জলনিরপেক্ষ অ্যামনিওটিক ডিমের বিপ্লব

তৃতীয় পর্যায়: আধুনিক বিপ্লব ও বিজ্ঞান

খণ্ড ১১ — সিন্যাপসিডদের বিশ্বজয় এবং পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাপ্রলয় — 1,124 শব্দ
সিন্যাপসিডদের বিশ্বজয় এবং পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাপ্রলয়

খণ্ড ১২ — আর্কোসরদের জয়যাত্রা — ডাইনোসর সাম্রাজ্য, টেরোসর এবং পাখির বিবর্তন — 1,106 শব্দ
আর্কোসরদের জয়যাত্রা — ডাইনোসর সাম্রাজ্য, টেরোসর এবং পাখির বিবর্তন

খণ্ড ১৩ — স্তন্যপায়ীদের নিশাচর অধ্যায় এবং কে-পিজি উল্কাপাতের মহাপ্রলয় — 1,047 শব্দ
স্তন্যপায়ীদের নিশাচর অধ্যায় এবং কে-পিজি উল্কাপাতের মহাপ্রলয়

খণ্ড ১৪ — প্যালিওজিন স্তন্যপায়ী মহাবিস্ফোরণ এবং প্রাইমেটদের প্রথম পদচিহ্ন — 1,258 শব্দ
প্যালিওজিন স্তন্যপায়ী মহাবিস্ফোরণ এবং প্রাইমেটদের প্রথম পদচিহ্ন

খণ্ড ১৫ — ক্যাটারাইন বিভাজন: ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টি এবং মায়োসিন নরবানর মহাজাগরণ — 1,373 শব্দ
ক্যাটারাইন বিভাজন: ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টি এবং মায়োসিন নরবানর মহাজাগরণ

চতুর্থ পর্যায়: সমকালীন যুগ ও ভবিষ্যতের দিগন্ত

খণ্ড ১৬ — গ্রেট এপ বিভাজন এবং দ্বিপদ চলনের বায়োমেকানিক্স — 1,383 শব্দ
গ্রেট এপ বিভাজন এবং দ্বিপদ চলনের বায়োমেকানিক্স

খণ্ড ১৭ — অস্ট্রালোপিথেকাস, লেটোলির পদচিহ্ন এবং রোবাস্ট প্যারানথ্রোপাস — 1,321 শব্দ
অস্ট্রালোপিথেকাস, লেটোলির পদচিহ্ন এবং রোবাস্ট প্যারানথ্রোপাস

খণ্ড ১৮ — হোমো গণের আবির্ভাব এবং ওল্ডোয়ান পাথুরে প্রযুক্তি — 1,366 শব্দ
হোমো গণের আবির্ভাব এবং ওল্ডোয়ান পাথুরে প্রযুক্তি

খণ্ড ১৯ — হোমো ইরেক্টাস, আগুনের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশ্বিক অভিযাত্রা — 1,693 শব্দ
হোমো ইরেক্টাস, আগুনের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশ্বিক অভিযাত্রা

Shakil Mahmud • Research Monograph

খণ্ড ২০ আর্কাইক মোজাইক এবং আধুনিক মানবজাতির মহাজাগরণ 1,668 শব্দ
আর্কাইক মোজাইক এবং আধুনিক মানবজাতির মহাজাগরণ

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • প্রথম খণ্ড

অ্যাবায়োজেনেসিসের স্ফুলিঙ্গ — প্রাক-জৈবিক তাপগতিবিদ্যা, ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট এবং আরএনএ বিশ্ব

অ্যাবায়োজেনেসিসের স্ফুলিঙ্গ — প্রাক-জৈবিক তাপগতিবিদ্যা, ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট এবং আরএনএ বিশ্ব

1,251 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১: *চিত্র: আদিম সমুদ্রের তলদেশে ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট চিমনি (~৪.০ বিলিয়ন বছর আগে), যা প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্ট, অনুঘটক আয়রন-সালফার খনিজ এবং মাইক্রো-কম্পার্টমেন্ট সরবরাহ করে প্রি-বায়োটিক অ্যাবায়োজেনেসিস এবং আদিম কোষের সূচনা ঘটিয়েছিল।*

চারশো কোটি বছর আগে, তরুণ সূর্যের ম্লান আলোয় উদ্ভাসিত মহাসমুদ্রবেষ্টিত আদিম পৃথিবীতে মহাজাগতিক ইতিহাসের সবচেয়ে অবিশ্বাস্য রূপান্তরটি ঘটেছিল: নির্জীব ভূ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো স্বয়ংক্রিয় এবং স্ব-প্রতিলিপিকরণক্ষম প্রাণরসায়নের সীমারেখা অতিক্রম করেছিল। বিদ্যুৎ চমকের আকস্মিক কোনো দৈব দুর্ঘটনায় নয়, বরং গভীর সমুদ্রের ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের জটিল গোলকধাঁধায় গ্রহের অসম রাসায়নিক ভারসাম্য মুক্ত করার এক অনিবার্য তাপগতীয় পরিণতি হিসেবেই প্রাণের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হয়েছিল।

১. সাম্যাবস্থাহীন তাপগতিবিদ্যা এবং গ্রহীয় বিভবের মুক্তি

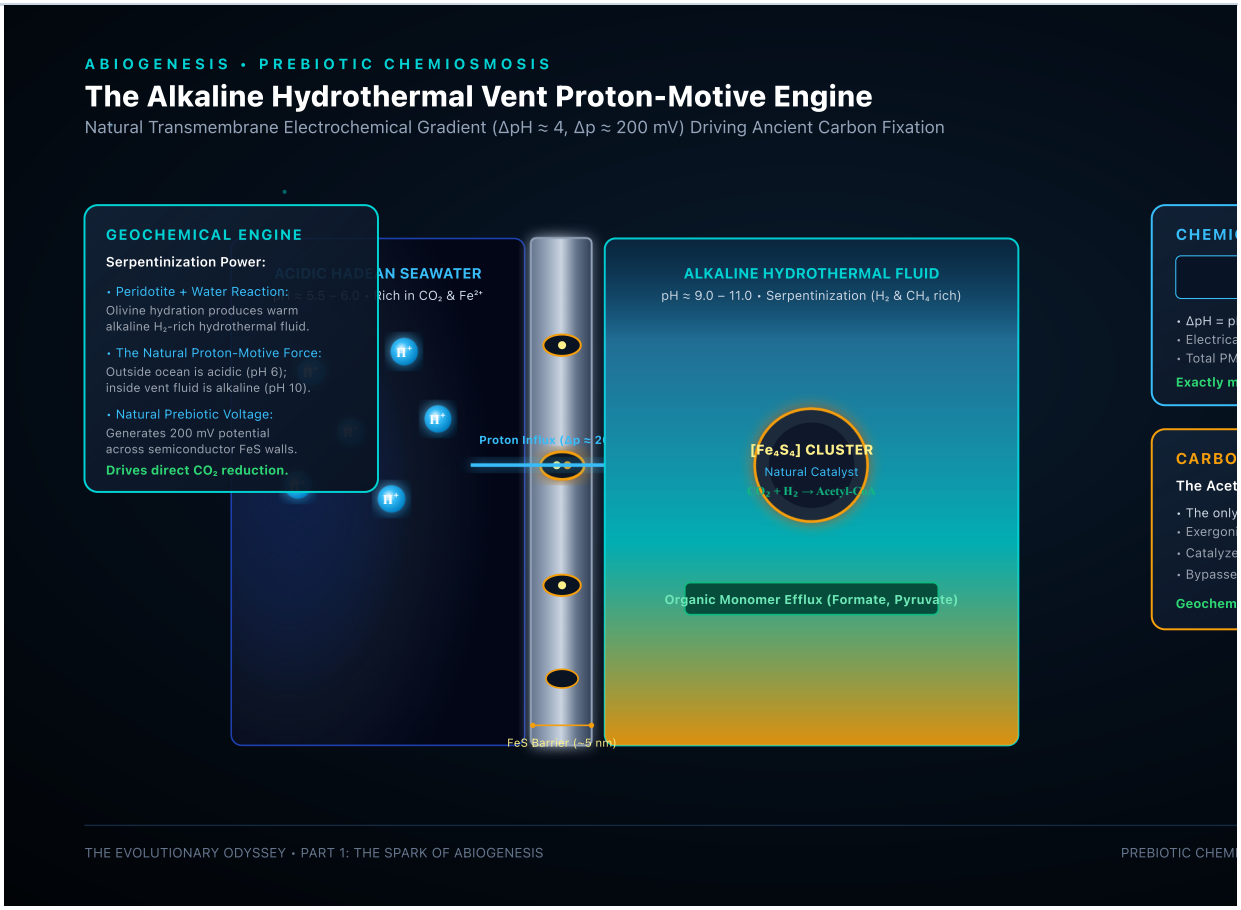
শাস্ত্রীয় তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুসারে ($dS \geq \frac{dQ}{T}$), যেকোনো ভৌত ব্যবস্থা সময়ের সাথে সাথে সর্বোচ্চ এনট্রপি বা বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু জীবন্ত কোষ হলো প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সাম্যাবস্থাহীন অপচয়মূলক কাঠামো (non-equilibrium dissipative structure)। ১৯৪৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানী এরউইন শ্রোডিঙ্গার তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন, জীবন পরিবেশ থেকে অনবরত ঋণাত্মক এনট্রপি (\Delta S < 0) গ্রহণ করে নিজেকে তাপগতীয় ভারসাম্য বা মৃত্যুর দিকে বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

হেডিয়ান যুগের আদি পৃথিবী ছিল মূলত একটি বিশাল প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ব্যাটারি। পৃথিবীর ম্যান্টল এবং ক্রাস্টে ছিল বিজারিত লোহা, আণবিক হাইড্রোজেন (H_2) এবং মিথেনের প্রাচুর্য; বিপরীতে মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রাচুর্য ছিল। হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে জৈব কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ও মিথেন তৈরি করা তাপগতীয়ভাবে অত্যন্ত সুবিধাজনক:

$$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O \quad (\Delta G^\circ = -131\ \text{kJ/mol})$$

তবে এই বিপুল মুক্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও (\Delta G < 0) সাধারণ পরিবেশে এই বিক্রিয়াটি এক বিশাল অ্যাক্টিভেশন শক্তি বাধার সম্মুখীন হয়। বিশেষ অনুঘটক ছাড়া পানিতে দ্রবীভূত CO_2 এবং H_2 কখনোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্রিয়া করতে পারে না। প্রকৃতির এমন একটি অবিচ্ছিন্ন চুল্লি প্রয়োজন ছিল যা একই সাথে ট্রানজিশন ধাতব অনুঘটক সরবরাহ করবে এবং ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল শক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রাখবে।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১.১: প্রাক-জৈবিক প্রোটন-মোটিভ চুল্লির গঠন। ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল তরল (\text{pH } ৯\text{–}১১) এবং হেডিয়ান আম্লিক সমুদ্রের (\text{pH } ৫.৫\text{–}৬.০) সংযোগস্থলে ম্যাকিনাউইটের (FeS) পাতলা অজৈব প্রাচীর, যা প্রাকৃতিক কেমিওসমোটিক তড়িৎ-বিভব ($\Delta p \approx ২০০\ \mathrm{mV}$) তৈরি করে আদিম কার্বন বিজারণকে সচল করেছিল।

২. ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট: প্রাণের ভূ-রাসায়নিক ইঞ্জিন

১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে ভূ-রসায়নবিদ মাইকেল রাসেল এক যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রস্তাব করেন: অগভীর পুকুর কিংবা ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির ব্ল্যাক স্মোকারে নয়, বরং মাঝারি তাপমাত্রার ক্ষারীয় সাবমেরিন হাইড্রোথার্মাল ভেন্টেই প্রাণের জন্ম হয়েছিল, যা বর্তমানের ‘লস্ট সিটি’ হাইড্রোথার্মাল ফিল্ডের অনুরূপ।

সার্পেন্টিনাইজেশন নামক একটি তাপমোচী বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই ভেন্টগুলো সৃষ্টি হয়, যেখানে অলিভিন সমৃদ্ধ আল্ট্রাম্যাফিক ম্যান্টল শিলা মাঝারি তাপমাত্রায় (১০০\text{–}১৫০^\circ\text{C}) সমুদ্রের পানির সাথে বিক্রিয়া করে:

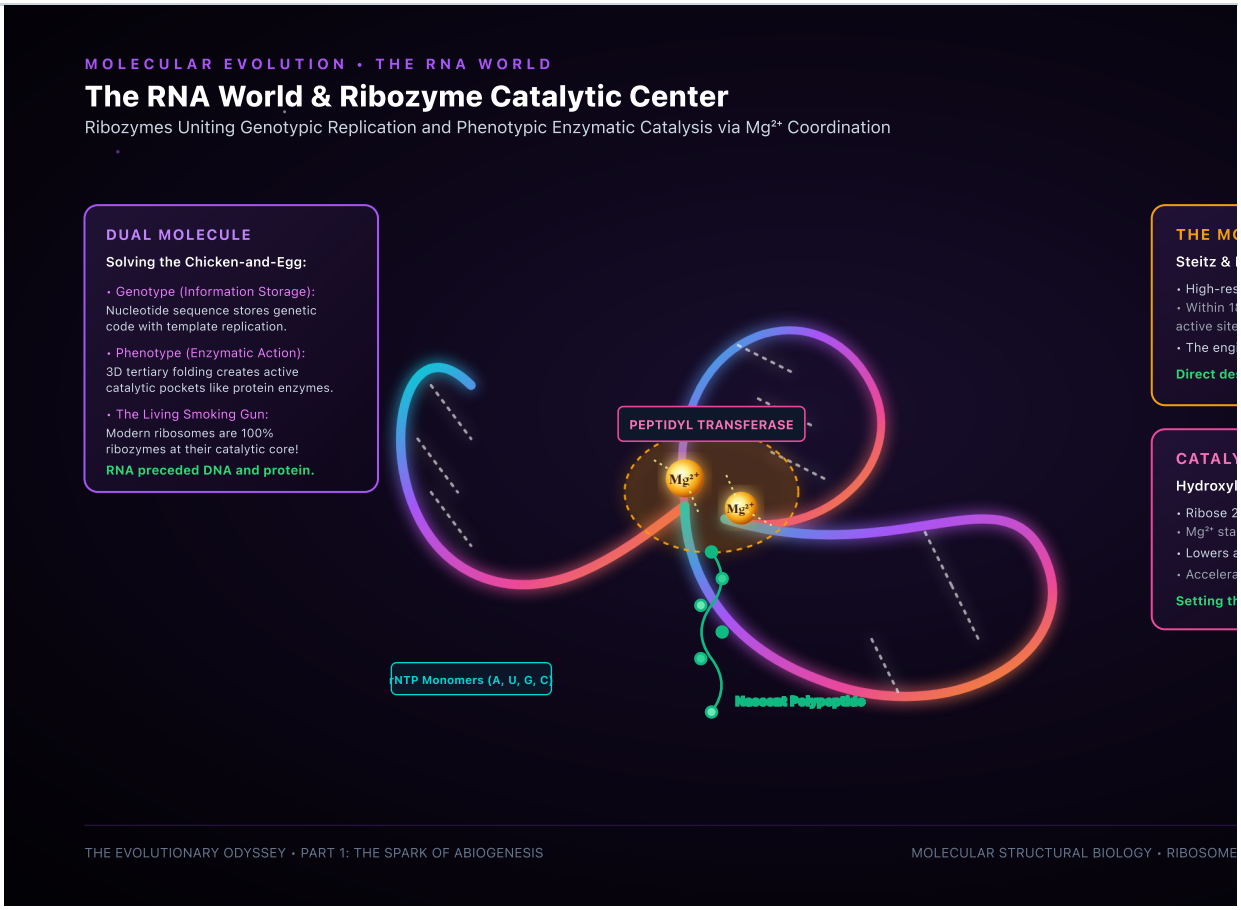
$$(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO_4} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2} \rightarrow \mathrm{Mg_3Si_2O_5(OH)_4} + \mathrm{Mg(OH)_2} + \mathrm{Fe_3O_4} + \mathrm{H_2}$$

এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পানি অত্যন্ত ক্ষারীয় (\text{pH } ৯\text{–}১১) এবং প্রচুর আণবিক হাইড্রোজেনে পরিপূর্ণ হয়ে সমুদ্রতলে উদগিরিত হয়। প্রাচীন হেডিয়ান সাগরের পানি আগ্নেয়গিরির গ্যাসে পরিপূর্ণ থাকার কারণে ছিল অম্লীয় (\text{pH } ৫.৫\text{–}৬.০)। ক্ষারীয় তরল এবং অম্লীয় সমুদ্রের সংযোগস্থলে লোহা ও সালফাইড যুক্ত হয়ে ম্যাকিনাউইট (FeS) ও গ্রেইগাইটের ($\mathrm{Fe_3S_4}$) অণুবীক্ষণিক ফাঁপা ছিদ্রযুক্ত অজৈব শিলার স্তম্ভ বা চিমনি তৈরি করে।

এই ন্যানোমিটার-পাতলা খনিজ প্রাচীরের অভ্যন্তরে ছিল ক্ষারীয় মাধ্যম এবং বাইরে ছিল অম্লীয় সামুদ্রিক পানি, যেখানে প্রোটনের ($\mathrm{H_3O^+}$) ঘনত্ব ভেতরের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। এর ফলে খনিজ প্রাচীরটির দুই পাশে প্রাকৃতিকভাবে প্রায় ৪ থেকে ৫ pH একক-এর প্রোটন ঘনত্বের নতিমাত্রা তৈরি হয়েছিল:

$$\Delta p = \Delta \Psi \text{–} \frac{2.303\ R\ T}{F} \Delta \mathrm{pH} \approx ১৮০\text{–}২২০\ \mathrm{mV}$$

আশ্চর্যজনক সত্য হলো, এই প্রাকৃতিক প্রোটন-মোটিভ ফোর্সটির মান আধুনিক পৃথিবীর প্রতিটি জীবকোষের মাইটোকন্ড্রিয়া বা ঝিল্লিতে এটিপি (ATP) তৈরির জন্য ব্যবহৃত কেমিওসমোটিক বিভবের প্রায় সমান! জীববৈজ্ঞানিক প্রোটিন বা জিনোম সৃষ্টির কোটি বছর আগেই হেডিয়ান পৃথিবী এক নিখুঁত জৈব-বৈদ্যুতিক শক্তির ইঞ্জিন প্রস্তুত করে রেখেছিল।



চিত্র ১.২: আরএনএ ওয়ার্ল্ড এবং রাইবোজাইমের অনুঘটকীয় আর্কিটেকচার। স্টেম-লুপ, সিউডোনট এবং ম্যাগনেসিয়াম আয়নের (Mg^{2+}) সমন্বয়ে গঠিত সেকেন্ডারি গঠন, যা এনজাইম ছাড়াই ফসফোডাইএস্টার বন্ধন তৈরি এবং পেপটাইড সংশ্লেষণে সক্ষম।

৩. আরএনএ বিশ্ব: জিনোটাইপ এবং ফিনোটাইপের মেলবন্ধন

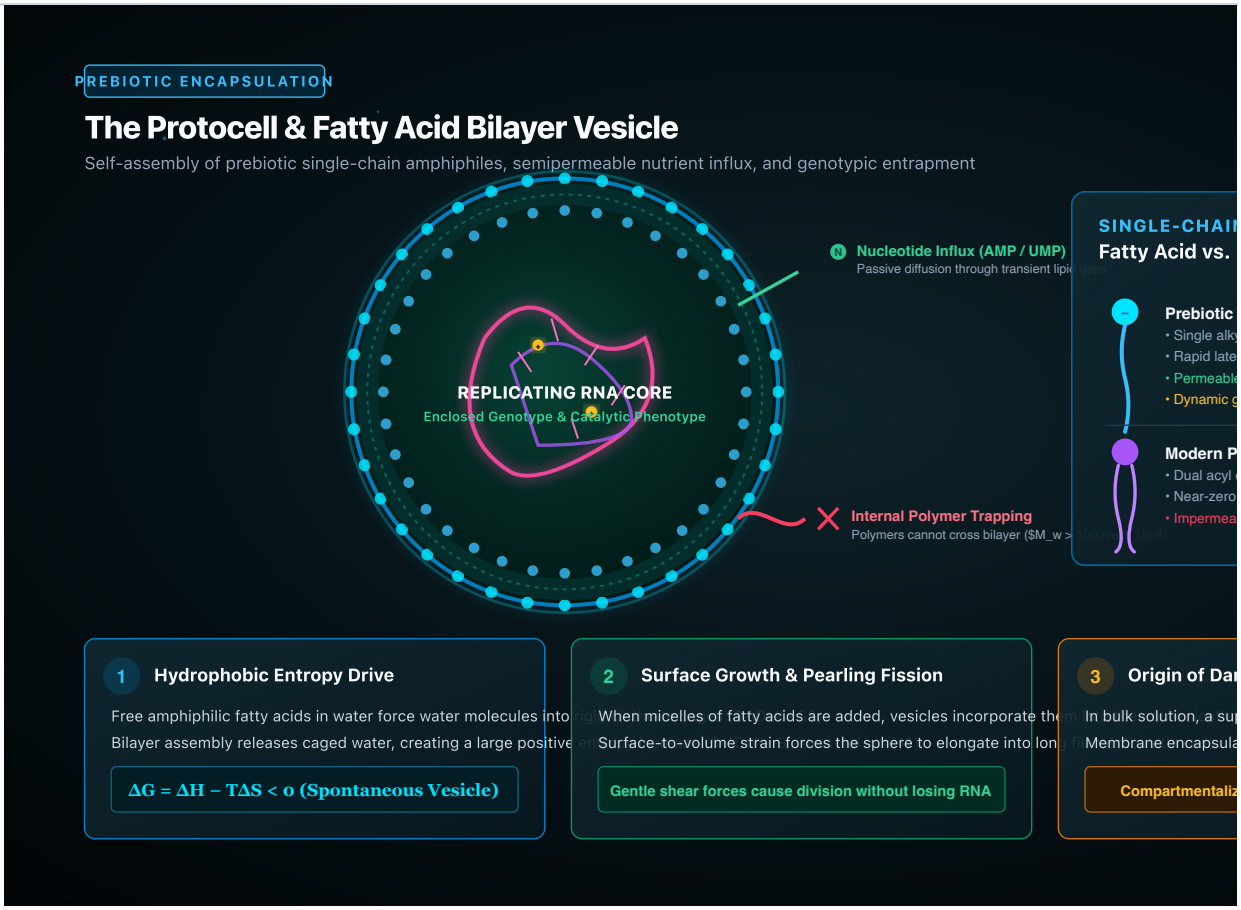
জীববিজ্ঞানে বহু দশক ধরে একটি অমীমাংসিত ধাঁধা ছিল: কোষের জেনেটিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিএনএ প্রয়োজন, অথচ সেই ডিএনএ প্রতিলিপিকরণের জন্য প্রোটিন এনজাইম অপরিহার্য। এনজাইম ছাড়া ডিএনএ অকেজো, আবার ডিএনএ ছাড়া প্রোটিন তৈরি অসম্ভব—তাহলে কোনটি আগে এসেছিল?

১৯৮০-এর দশকে টমাস চেক এবং সিডনি অল্টম্যান কর্তৃক **রাইবোজাইম** (অনুঘটক হিসেবে সক্রিয় আরএনএ অণু) আবিষ্কারের মাধ্যমে এই ধাঁধার সমাধান মেলে, যার জন্য তাঁরা ১৯৮৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। আরএনএ একই সাথে জিনের মতো তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে (জিনোটাইপ) এবং প্রোটিনের মতো ত্রিমাত্রিক গঠনে ভাঁজ হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালনা করতে পারে (ফিনোটাইপ)। এ থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'আরএনএ বিশ্ব' (RNA World) অনুকল্প।

আধুনিক জীববিজ্ঞানে এই আদিম যুগের সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো আমাদের কোষের রাইবোজোম। রাইবোজোমের পেপটাইডাইল ট্রান্সফারেজ সেন্টার—যেখানে অ্যামিনো অ্যাসিড জোড়া লেগে প্রোটিন তৈরি হয়—তার সক্রিয় কেন্দ্রের ১৮ অ্যাংস্ট্রমের মধ্যে কোনো প্রোটিন নেই; সেটি পুরোপুরি ক্যাটালাইটিক আরএনএ (rRNA) দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ রাইবোজোম প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন রাইবোজাইম।

ম্যাগনেসিয়াম (Mg^{2+}) আয়নের উপস্থিতিতে আরএনএ এমন এক চমৎকার ভাঁজ তৈরি করে যা নতুন নিউক্লিওটাইডের ফসফেটে নিউক্লিওফিলিক আক্রমণ ঘটিয়ে ফসফোডাইএস্টার বন্ধন তৈরি করে এবং প্রোটিন ছাড়াই নিজের পলিমার শৃঙ্খলকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১.৩: প্রাক-জৈবিক প্রোটোসেল এবং মেমব্রেনের স্বতঃস্ফূর্ত গঠন। হাইড্রোফোবিক এনট্রপির কারণে একক-শিকল ফ্যাটি অ্যাসিডের বাইলেয়ার ভেসিকল তৈরি হয় ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$)। মেমব্রেনের প্রাকৃতিক ছিদ্র দিয়ে পুষ্টি উপাদান প্রবেশ করতে পারলেও ভেতরে তৈরি হওয়া আরএনএ পলিমার আবদ্ধ থাকে, যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূচনা ঘটে।

৪. প্রাক-জৈবিক আবরণ: প্রোটোসেলের সূচনা ও প্রাকৃতিক নির্বাচন

পাথরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আরএনএ প্রতিলিপিত হতে পারলেও উন্মুক্ত পানিতে এটি মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়ে: প্রসারণ ও ক্ষয়। খোলা পানিতে তৈরি হওয়া নতুন আরএনএ অণুগুলো চারদিকে ছড়িয়ে হারিয়ে যায়। তদুপরি, কোনো কর্মক্ষম রাইবোজাইম তৈরি হলে তার সুফল অন্য অকেজো মিউট্যান্ট আরএনএ অণুগুলোও ভোগ করতে থাকে।

ডালউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন শুরু হওয়ার জন্য জিন এবং তার কর্মক্ষমতাকে একটি নির্দিষ্ট আবরণের মধ্যে আটকে রাখা অপরিহার্য ছিল। এই সংকট দূর করে **ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোটোসেল**-এর আত্মপ্রকাশ।

আধুনিক কোষের জটিল ফসফোলিপিডের তুলনায় আদিম পৃথিবীর ঝিল্লিগুলো ছিল অলিক, লরিক বা মিরিস্টিক অ্যাসিডের মতো সাধারণ একক-শিকল ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। পানিতে এদের ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্বি-স্তরী গোলক বা ভেসিকল গঠন করে। এটি ঘটে *হাইড্রোফোবিক ইফেক্ট*-এর কারণে: পানির অণুগুলো ফ্যাটি অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন লেজের চারপাশে আটকে না থেকে মুক্ত হয়, যার ফলে এনট্রপি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় ($+\Delta S_{\text{solvent}}$):

$$\Delta G_{\text{assembly}} = \Delta H - T\Delta S < 0$$

এই আদিম ফ্যাটি অ্যাসিড ঝিল্লির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল: এর দ্রুত ফ্লিপ-ফ্লপ গতির কারণে এতে সাময়িক ক্ষুদ্র ছিদ্র তৈরি হতো। এই ছিদ্র দিয়ে মনোমার অণু—যেমন রাইবোজ শর্করা ও নিউক্লিওটাইড—সহজেই কোষের ভেতরে ঢুকতে পারত। কিন্তু কোষের ভেতরের রাইবোজাইম যখন তাদের জুড়ে দীর্ঘ আরএনএ পলিমার তৈরি করত ($M_w > 1000\text{ Da}$), তখন আকারে বড় এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত হওয়ায় তারা আর বাইরে বের হতে পারত না।

অধিকন্তু, দ্রবণে নতুন ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত হলে প্রোটোসেলের পৃষ্ঠতল প্রসারিত হয়ে লম্বা নলের আকার ধারণ করত। সমুদ্রের ঢেউ বা স্রোতের মৃদু আলোড়নেই এই লম্বা নলের মতো কাঠামোটি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হতো, কোনো জটিল প্রোটিন ছাড়াই!

উপসংহার: প্রাণের মাহেন্দ্রক্ষণ

প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে প্রাক-জৈবিক পৃথিবীর সমস্ত উপাদানগুলো একত্রিত হয়েছিল। ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের গভীরে লোহা-সালফার খনিজ কার্বন বিজারণকে ত্বরান্বিত করেছিল, প্রোটন গ্র্যাডিয়েন্ট নিরবচ্ছিন্ন শক্তি যুগিয়েছিল, আরএনএ একই সাথে জিন ও এনজাইমের ভূমিকা নিয়েছিল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোটোসেল প্রথম স্বাধীন সত্তার জন্ম দিয়েছিল।

এভাবেই মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের আদিমতম সাধারণ পূর্বপুরুষ—লুকা (LUCA)-র জন্য। ২য় পর্বে আমরা আলোচনা করব কীভাবে আধুনিক ফাইলোজেনোমিক্স লুকার ৩৫৫টি জিনের সন্ধান পেয়েছে এবং কীভাবে আদিম কোষগুলো ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়া—এই দুই চিরন্তন ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- Russell, M. J., & Hall, A. J. (1997). The emergence of life from iron monosulphide bubbles at a submarine hydrothermal redox and pH front. *Journal of the Geological Society*, 154(3), 377–402.
- Martin, W., & Russell, M. J. (2003). On the origins of cells: a hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B*, 358(1429), 59–85.
- Cech, T. R. (1986). A model for the RNA-catalyzed replication of RNA. *PNAS*, 83(12), 4360–4363.
- Szostak, J. W., Bartel, D. P., & Luisi, P. L. (2001). Synthesizing life. *Nature*, 409(6818), 387–390.
- Lane, N. (2015). *The Vital Question: Why Is Life the Way It Is?* Profile Books / W. W. Norton.

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "অ্যাবায়োজেনেসিসের স্ফুলিঙ্গ — প্রাক-জৈবিক তাপগতিবিদ্যা, ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট এবং আরএনএ বিশ্ব"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১।
https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-1-the-spark-of-abiogenesis-bn/*

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বিতীয় খণ্ড

লুকা (LUCA) এবং জীবনের দ্বিমুখী বিস্তার — ব্যাকটেরিয়া বনাম আর্কিয়া

লুকা (LUCA) এবং জীবনের দ্বিমুখী বিস্তার — ব্যাকটেরিয়া বনাম আর্কিয়া

1,191 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



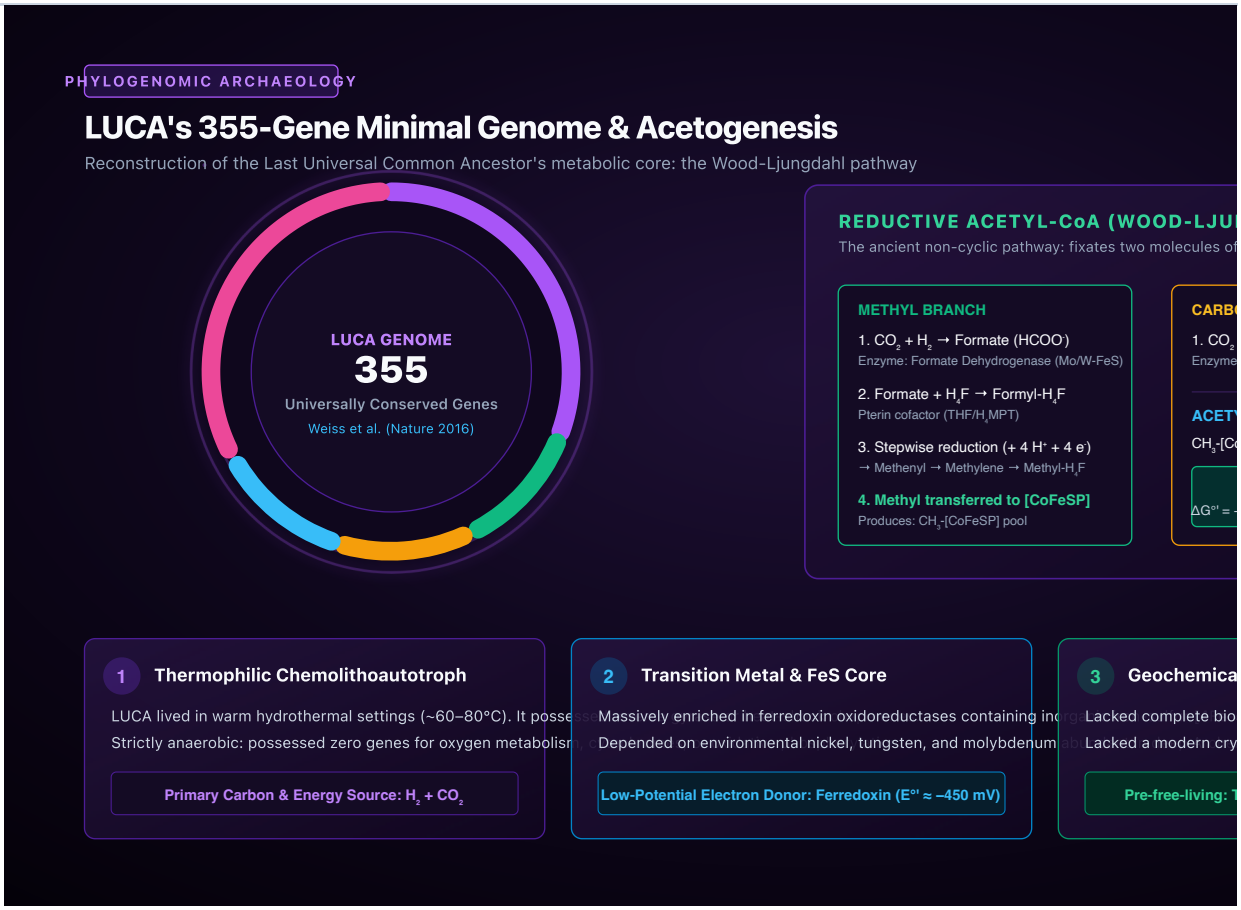
চিত্র ২: *চিত্র: লুকা (LUCA - সর্বশেষ সার্বজনীন সাধারণ পূর্বপুরুষ, ~৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে)-এর অণুবীক্ষণিক রূপায়ন; এতে আদিম লিপিড পর্দা, বৃত্তাকার ডিএনএ ক্রোমোজোম, সার্বজনীন রাইবোসোমাল অনুবাদ ব্যবস্থা এবং কেমিওসমোটিক এটিপি সিন্থেস প্রদর্শিত হয়েছে।*

প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে, প্যালিওআর্কিয়ান সমুদ্রতলের তপ্ত ও অক্সিজেনহীন আধো-অন্ধকারে এমন এক অণুবীক্ষণিক সত্তার বাস ছিল যার থেকে মাটির প্রতিটি ব্যাকটেরিয়া, ফুটন্ত ঝর্ণার প্রতিটি আর্কিয়া, বনের প্রতিটি সবুজ ঘাস এবং মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিটি চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হয়েছে: তিনি হলেন আমাদের সবার শেষ সাধারণ পূর্বপুরুষ—লুকা (LUCA: Last Universal Common Ancestor)। তিনি কোনো মুক্ত সাঁতারু একক জীব ছিলেন না; বরং সমুদ্রতলের ক্ষারীয় হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের খনিজ প্রকোষ্ঠে বাস করা একদল অর্ধ-বিকশিত কোষের সমষ্টি, যারা ভূ-রাসায়নিক শক্তি থেকে জৈব বংশগতির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছিল।

১. ফাইলোজেনোমিক প্রত্নতত্ত্ব: লুকার আণবিক দেহের পুনর্গঠন

চারশো কোটি বছর আগের কোমল-দেহের অণুজীবদের কোনো পাথুরে জীবাশ্ম অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব। তাই আধুনিক বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন *ফাইলোজেনোমিক প্রত্নতত্ত্ব* (Phylogenomic Archaeology)। হাজার হাজার আধুনিক ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়ার সম্পূর্ণ জিনোম বিশ্লেষণ করে শক্তিশালী কম্পিউটার অ্যালগরিদমের সাহায্যে তাদের সাধারণ মিলনবিন্দু বা আদিম পূর্বপুরুষের জিনগত বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৬ সালে বিখ্যাত *নেচার মাইক্রোবায়োলজি* সাময়িকীতে প্রকাশিত উইলিয়াম মার্টিন এবং ম্যাডেলিন ওয়েইসের এক যুগান্তকারী গবেষণায় ১,৮৪৭টি ব্যাকটেরিয়া এবং ১৩৪টি আর্কিয়া প্রজাতির মোট ৬১ লাখ প্রোটিন-কোডিং জিন বিশ্লেষণ করা হয়। অনুভূমিক জিন স্থানান্তর (Horizontal Gene Transfer) বাদ দিয়ে উভয় ধারায় টিকে থাকা আদিম জিনগুলোকে আলাদা করে তাঁরা লুকার মূল জিনোমে ঠিক **৩৫৫টি প্রোটিন-কোডিং জিনের** একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা পুনর্গঠন করেন।



চিত্র ২.১: লুকার সংরক্ষিত জিনোমিক কোর। ওয়েইস এট আল. (২০১৬) কর্তৃক চিহ্নিত ৩৫৫টি আদিম জিনের চক্রাকার বিন্যাস। এতে স্পষ্ট দেখা যায় অ-চক্রীয় উড-লাংডাহল কার্বন-সংবন্ধন পাথওয়ের প্রাধান্য, যা পরিচালিত হতো অজৈব $[4\text{Fe-}4\text{S}]$ ফেরেডক্সিন ($E^\circ \approx -৪৫০\ \text{mV}$) এবং নিকেল-লোহা কার্বন মনোক্সাইড ডিহাইড্রোজিনেজের শক্তিতে।

এই ৩৫৫টি জিনের কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে লুকার জীবনযাপনের এক নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে:

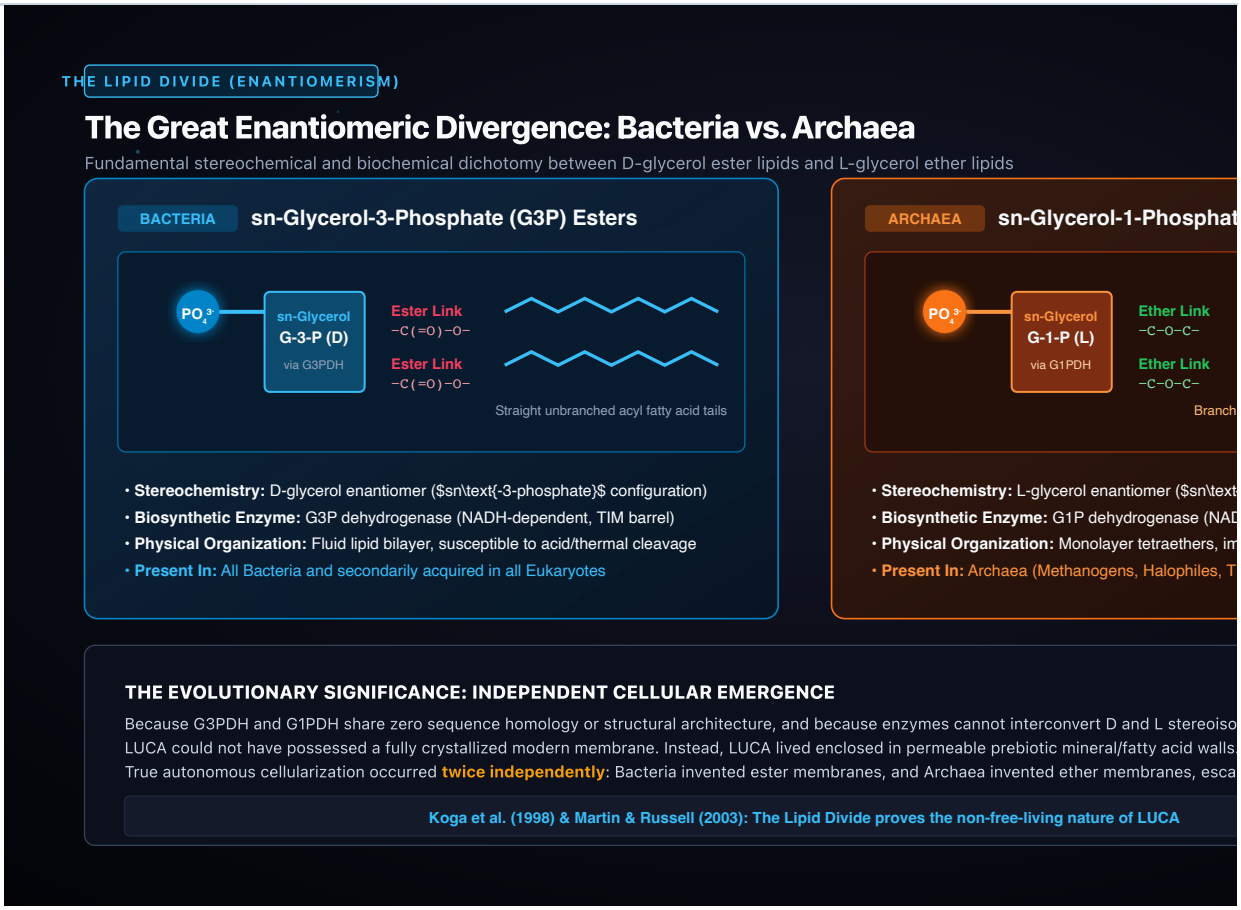
- **অক্সিজেনহীন রসায়ননির্ভর স্বভোজী:** লুকার জিনোমে আণবিক অক্সিজেনের (O_2) কোনো স্থান ছিল না। তার দেহে সাইটোক্রোম বা কুইনোন ছিল না এবং সে অ্যারোবিক শ্বসনে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল।
- **উচ্চ তাপমাত্রাপ্রেমী (থার্মোফাইল):** লুকার জিনোমে রিভার্স জাইরেজ এবং হিট-শক প্রোটিন ছিল, যা প্রমাণ করে সে ৬০° থেকে ৮০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ ভেন্ট পরিবেশে বাস করত।
- **উড-লাংডাহল পাথওয়ে (Wood-Ljungdahl Pathway):** লুকা অজৈব কার্বন ডাই-অক্সাইড আবদ্ধ করতে ব্যবহার করত উড-লাংডাহল বা রিডাক্টিভ অ্যাসিটাইল-কোএ চক্র। ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়া—উভয় ধারায় প্রাপ্ত এটিই একমাত্র কার্বন সংবন্ধন পথ যা এটিপি খরচ করার বদলে সরাসরি নেট শক্তি উৎপাদন করে।

উড-লাংডাহল প্রক্রিয়ার সার্বিক রাসায়নিক বিক্রিয়াটি তাপমোচী হওয়ায় তা লুকাকে কোষ গঠনের পাশাপাশি শক্তি যোগাত:

$$2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 + \text{HS-CoA} \rightarrow \text{CH}_3\text{CO-S-CoA} + 3\text{H}_2\text{O} \quad (\Delta G^{\circ\prime} = -৩৭.8\ \text{kJ/mol})$$

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, লুকার দেহে অনেক মৌলিক অ্যামিনো অ্যাসিড ও নিউক্লিওটাইড তৈরির সম্পূর্ণ এনজাইম ছিল না এবং আধুনিক এটিপি সিন্থেসের ঘূর্ণায়মান মোটর প্রোটিনেরও অভাব ছিল। এর অর্থ হলো, লুকা তখনো সমুদ্রে স্বাধীনভাবে সাঁতার কাটার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি; সে ছিল ক্ষারীয় ভেন্টের পাথুরে প্রকোষ্ঠে বন্দি এক আদিম সত্তা, যে বেঁচে থাকার জন্য ভেন্টের খনিজ প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট এবং রাসায়নিক গ্যাসের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিল।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ২.২: লিপিডের এন্যান্টিওমেরিক বিভাজন। ব্যাকটেরিয়ার G3P ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার (G3PDH দ্বারা তৈরি) এবং আর্কিয়ার G1P শাখান্বিত আইসোপ্রিনয়েড ইথারের (G1PDH দ্বারা তৈরি) মধ্যকার মৌলিক অমিল। এই এনজাইমগুলোর মধ্যে কোনো মিল না থাকায় প্রকৃত কোষঝিল্লি দুই ধারায় স্বাধীনভাবে দু'বার উদ্ভাবিত হয়েছিল।

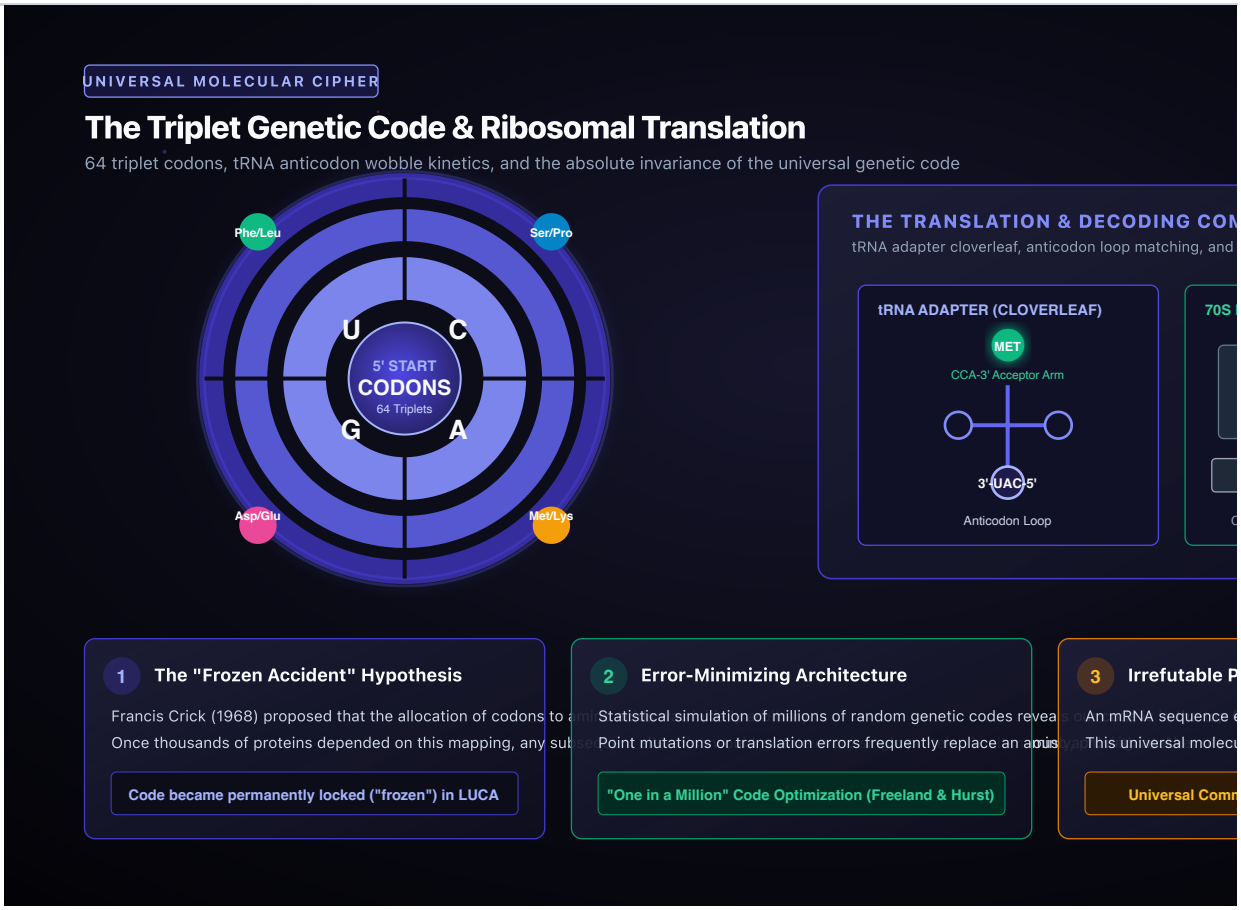
২. লিপিড বিভাজন: জীবনের দুই আদিম রাজ্যে বিভক্তি

লুকা যদি সবার একক পূর্বপুরুষ হয়, তবে ইউক্যারিওট সৃষ্টির কোটি কোটি বছর আগেই জীবনের বৃক্ষ কেন প্রধান দুটি ধারায়—**ব্যাকটেরিয়া** এবং **আর্কিয়া**—চিরতরে বিভক্ত হয়ে গেল?

এর সবচেয়ে চমকপ্রদ রাসায়নিক উত্তর হলো *লিপিড বিভাজন* (The Lipid Divide)। প্রতিটি জীবন্ত কোষের উপাদানগুলোকে ধরে রাখতে এবং জৈব-তড়িৎ বিভব বজায় রাখতে একটি হাইড্রোফোবিক ঝিল্লি বা মেমব্রেন অপরিহার্য। কিন্তু যখন ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়ার কোষঝিল্লি বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় রাসায়নিক ব্যবধান চোখে পড়ে:

1. **গ্লিসারলের স্টেরিওকেমিস্ট্রি:** ব্যাকটেরিয়ার ঝিল্লি তৈরি হয় *sn*-গ্লিসারল-৩-ফসফেট (G3P) দিয়ে, যা তৈরি করে G3PDH এনজাইম। অন্যদিকে আর্কিয়ার ঝিল্লি গঠিত হয় তার দর্পণ প্রতিবিম্ব *sn*-গ্লিসারল-১-ফসফেট (G1P) দিয়ে, যা তৈরি করে সম্পূর্ণ ভিন্ন G1PDH এনজাইম। এই দুটি এনজাইমের মধ্যে কোনো জিনগত মিল নেই।
2. **রাসায়নিক বন্ধন:** ব্যাকটেরিয়া তাদের হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলকে গ্লিসারলের সাথে যুক্ত করে *এস্টার বন্ধন* (-C(=O)-O-) দিয়ে। বিপরীতে, আর্কিয়া ব্যবহার করে *ইথার বন্ধন* (-C-O-C-), যা তাপ ও অ্যাসিডে সহজে ভেঙে যায় না।
3. **হাইড্রোকার্বন শিকল:** ব্যাকটেরিয়ার লেজগুলো তৈরি হয় সরল সোজা ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে। অন্যদিকে আর্কিয়ার লেজ তৈরি হয় আইসোপ্রিনয়েড নামক শাখান্বিত শৃঙ্খল দিয়ে। চরম পরিবেশে থাকা আর্কিয়াদের ঝিল্লি দুটি স্তরের বদলে একটি অভেদ্য মনোলেয়ারে পরিণত হয়, যা ফুটন্ত পানিতেও অক্ষত থাকে।

যেহেতু G1P এবং G3P একে অপরের এন্যান্টিওমার বা প্রতিবিম্ব, তাই একটি জীব কখনো অন্যটিতে ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হতে পারে না। কোগা এট আল. (১৯৯৮) এবং মার্টিন ও রাসেল (২০০৩) প্রমাণ করেন যে লুকার নিজের কোনো আধুনিক এনজাইমেটিক ফসফোলিপিড ঝিল্লি ছিল না। লুকা বাস করত ক্ষারীয় ভেন্টের ভঙ্গুর অজৈব ও ফ্যাটি অ্যাসিড প্রাচীরে। পরবর্তীতে একটি ধারা এস্টার ঝিল্লি তৈরি করে **ব্যাকটেরিয়া** হিসেবে এবং অপর ধারাটি ইথার ঝিল্লি তৈরি করে **আর্কিয়া** হিসেবে পাথর ছেড়ে মুক্ত সাগরে ছড়িয়ে পড়েছিল।



চিত্র ২.৩: সার্বজনীন জেনেটিক কোড এবং অনুবাদ প্রক্রিয়া। ৬৪টি ট্রিপলেট কোডনের সার্বজনীন ডিকশনারি, ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) অ্যাডাপ্টার, রাইবোজোমের তিনটি সক্রিয় কেন্দ্র (E, P, A সাইট) এবং ৩য় বেসের ক্রিক ওবল পেয়ারিং।

৩. সার্বজনীন জেনেটিক কোড: লুকার ‘হিমায়িত দুর্ঘটনা’

ঝিল্লির গঠনে জীবন দুটি রাজ্যে বিভক্ত হলেও কোষের ভেতরের জেনেটিক অপারেটিং সিস্টেমটি অবিকল এক রয়ে গেছে। ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে আর্কিয়া, আম গাছ কিংবা মানুষ—পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণকোষে ডিএনএ ও আরএনএ-র ৬৪টি ট্রিপলেট কোডন অবিকল একই ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে।

১৯৬৮ সালে বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক একে *দ্য ফ্রোজেন অ্যাকসিডেন্ট* (The Frozen Accident) বা হিমায়িত দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেন। যদিও শুরুর দিকে কোনো নির্দিষ্ট কোডনের সাথে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযুক্তি কিছুটা আকস্মিক ছিল, কিন্তু যখন কোষে শত শত প্রোটিন তৈরি শুরু হয়ে গেল, তখন কোনো একটি কোডনের অর্থ সামান্য বদলে গেলেই শত শত জরুরি প্রোটিন এক সাথে বিকল হয়ে যেত। ফলে লুকার যুগে একবার যে জেনেটিক ভাষা নির্ধারিত হয়েছিল, তা চিরকালের জন্য ‘হিমায়িত’ বা স্থায়ী হয়ে গেছে।

অধিকন্তু, ফ্রি-ল্যান্ড ও হার্স্টের গাণিতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের জেনেটিক কোডটি কোটি কোটি বিকল্প কোডের মধ্যে ত্রুটি দূর করার ক্ষেত্রে শীর্ষ ০.০০০১% নিখুঁত। একটি একক অক্ষরের মিউটেশন হলেও নতুন কোডনটি প্রায়শই আগের অ্যামিনো অ্যাসিডেরই সমধর্মী আরেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে, ফলে প্রোটিনের গঠন সহজে নষ্ট হয় না:

$$\omega = \frac{K_a}{K_s} \ll 1 \quad \text{(পিউরিফাইং সিলেকশন)}$$

এই সার্বজনীনতার কারণেই মানুষের ইনসুলিনের জিন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে ব্যাকটেরিয়া হুবহু মানুষের ইনসুলিন প্রোটিন তৈরি করতে পারে। বিশুদ্ধ পরিসংখ্যানের বিচারে দুটি স্বাধীন উৎপত্তির জীব অবিকল একই ৬৪টি কোডনের ভাষা গ্রহণ করার সম্ভাবনা $১০^{-২৮৬০}$-এ মাত্র একবার! এই জেনেটিক কোডই হলো পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের একই পরিবারভুক্ত হওয়ার সবচেয়ে অকাট্য গাণিতিক প্রমাণ।

উপসংহার: মুক্ত পৃথিবীর পথে

প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে ব্যাকটেরিয়ার দল এবং আর্কিয়ার দল সমুদ্রতলের ভেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ব্যাকটেরিয়া দখল করে নেয় অগভীর সমুদ্র ও পলিমাটি; আর আর্কিয়া তাদের অভেদ্য ইথার ঝিল্লি নিয়ে জয় করে নেয় ফুটন্ত খনিজ মোহনা ও চরম বৈরী পরিবেশ।

পরবর্তী ৫০ কোটি বছর ধরে পৃথিবী ছিল শুধুই এই আণুবীক্ষণিক জীবনের রাজ্য। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগে সূর্যের আলোয় ভেসে বেড়ানো সায়ানোব্যাকটেরিয়ার এক দল এমন এক বিধ্বংসী এবং সৃষ্টিশীল রসায়ন আবিষ্কার করতে যাচ্ছিল যা গোটা গ্রহের চেহারাই বদলে দেবে: পানি ভেঙে অক্সিজেন উৎপাদন। ৩য় পর্বে আমরা দেখব সেই সৌরশক্তির মহাবিপ্লব।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- Weiss, M. C., et al. (2016). The physiology and habitat of the last universal common ancestor. *Nature Microbiology*, 1(9), 16116.

Shakil Mahmud • Research Monograph

- Woese, C. R., & Fox, G. E. (1977). Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms. *PNAS*, 74(11), 5088–5090.
- Koga, Y., et al. (1998). Did the last common ancestor have a membrane of lipids with ether or ester linkages? *Journal of Molecular Evolution*, 46(2), 125–134.
- Crick, F. H. (1968). The origin of the genetic code. *Journal of Molecular Biology*, 38(3), 367–379.
- Freeland, S. J., & Hurst, L. D. (1998). The genetic code is one in a million. *Journal of Molecular Evolution*, 47(3), 238–248.

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "লুকা (LUCA) এবং জীবনের দ্বিমুখী বিস্তার — ব্যাকটেরিয়া বনাম আর্কিয়া"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ২। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-2-the-luca-and-domain-divergence-bn/

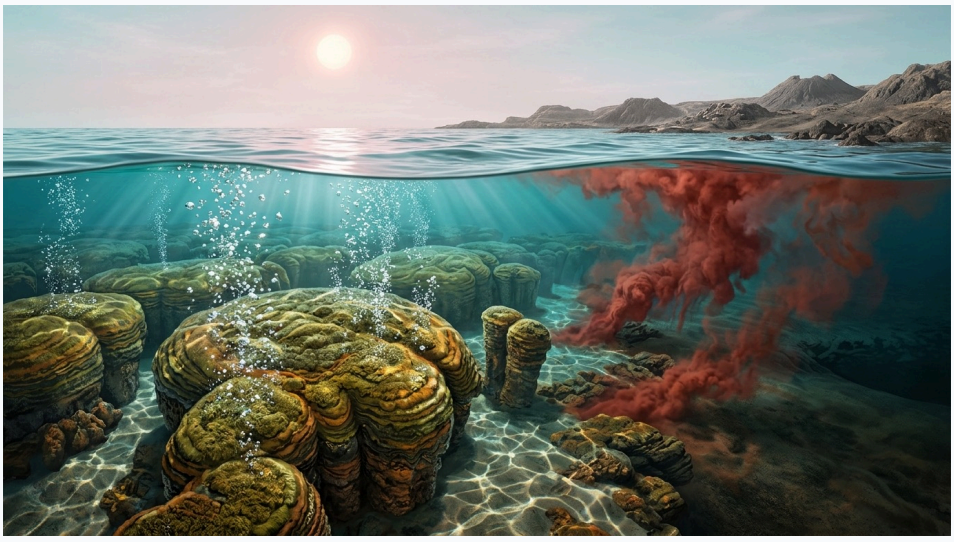
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • তৃতীয় খণ্ড

সৌরশক্তির বিপ্লব — সালোকসংশ্লেষণ, পানি বিভাজন এবং মহাজাগতিক অক্সিজেন বিপর্যয়

সৌরশক্তির বিপ্লব — সালোকসংশ্লেষণ, পানি বিভাজন এবং মহাজাগতিক অক্সিজেন বিপর্যয়

1,189 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৩: *চিত্র: আর্কিয়ান উপকূলের অগভীর জলাশয়ে সায়ানোব্যাকটেরিয়াল স্ট্রোমাটোলাইট স্তর, যা জল-বিভাজনকারী সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেনের বুদ্বুদ নির্গমন করছে এবং ২.৪ বিলিয়ন বছর আগের মহা-অক্সিজেনেশন বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।*

তিনশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত জীবন এক কঠিন শক্তি-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। সমুদ্রের অতল অন্ধকার ভেন্ট কিংবা আগ্নেয়গিরির খনিজ মোহনায় বন্দি আদিম অণুজীবেরা বেঁচে থাকত ক্ষারীয় পানি ও হাইড্রোজেন সালফাইডের সামান্য ভূ-রাসায়নিক জোগান দিয়ে। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগে সূর্যের আলোয় ভেসে থাকা সায়ানোব্যাকটেরিয়াদের এক দল এক অবিশ্বাস্য রাসায়নিক উদ্ভাবন সম্পন্ন করল। তারা একটি ক্ষুদ্র ম্যাঙ্গানিজ-ক্যালসিয়াম ক্লাস্টার ব্যবহার করে প্রকৃতির সবচেয়ে কঠিন রাসায়নিক কাজটি করে দেখাল: পানির অণুর বন্ধন ভেঙে ইলেকট্রন আহরণ এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন নিঃসরণ, যা চিরকালের জন্য এই গ্রহের ভবিষ্যৎ বদলে দিয়েছিল।

১. পানি বিভাজনের তাপগতিবিদ্যা: $\mathbf{Mn_4CaO_5}$ ক্লাস্টার

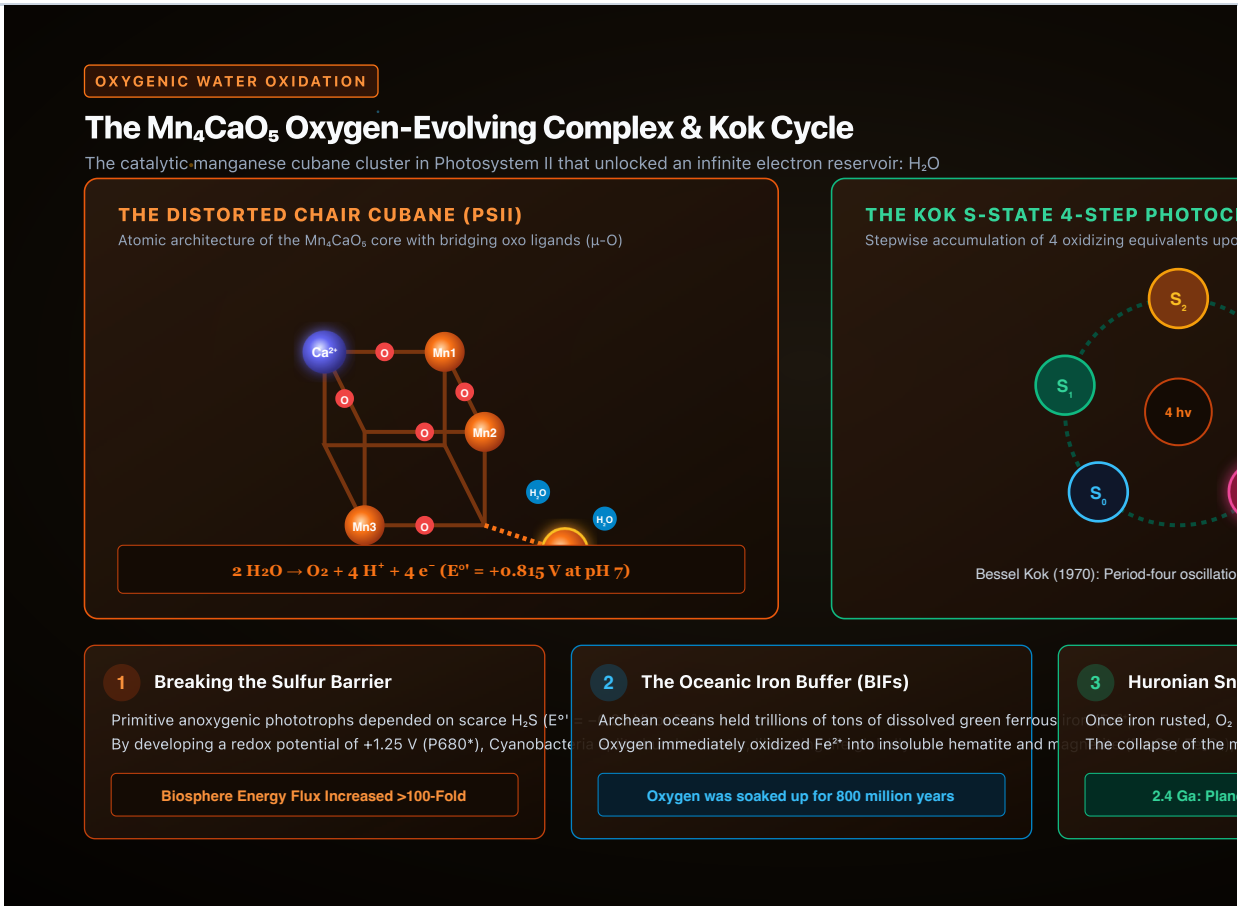
আদিম সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো অক্সিজেন তৈরি করত না। তারা হাইড্রোজেন সালফাইড ($\mathrm{H_2S}$) কিংবা ফেরাস আয়রন ($\mathrm{Fe^{2+}}$) থেকে ইলেকট্রন আহরণ করত। হাইড্রোজেন সালফাইডের বিজারণ বিভব কম থাকায় ($E^{\circ\prime} \approx -0.25\ \mathrm{V}$) তা থেকে ইলেকট্রন আলাদা করা সহজ ছিল; কিন্তু মহাসমুদ্রের বুকে হাইড্রোজেন সালফাইডের জোগান ছিল অত্যন্ত সীমিত।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার জন্য জীবনের প্রয়োজন ছিল এমন এক ইলেকট্রন দাতা যা পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। সেই অনন্ত উৎস ছিল পানি ($\mathrm{H_2O}$)। কিন্তু পানির শক্তিশালী রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে ইলেকট্রন বের করে আনা এক বিশাল তাপগতীয় চ্যালেঞ্জ। পানির বিজারণ বিভব অত্যন্ত উঁচু:

$$2\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{O_2} + 4\mathrm{H^+} + 4e^- \quad (E^{\circ\prime} = +0.815\ \mathrm{V})$$

পানি থেকে ইলেকট্রন ছিনিয়ে নিতে হলে এমন এক শক্তিশালী জারক তৈরি করতে হতো যার ক্ষমতা স্বয়ং অক্সিজেনের চেয়েও বেশি! ফটোসিস্টেম-২ (PSII)-এর রিঅ্যাকশন সেন্টার ক্লোরোফিল **P680** সূর্যালোকের ফোটন গ্রহণ করে ঠিক সেই কাজটিই করেছিল। এর উত্তেজিত রূপ P680*-এর জারণ বিভব দাঁড়ায় $+1.25\ \mathrm{V}$, যা প্রকৃতির জানা সবচেয়ে শক্তিশালী জৈবিক জারক।

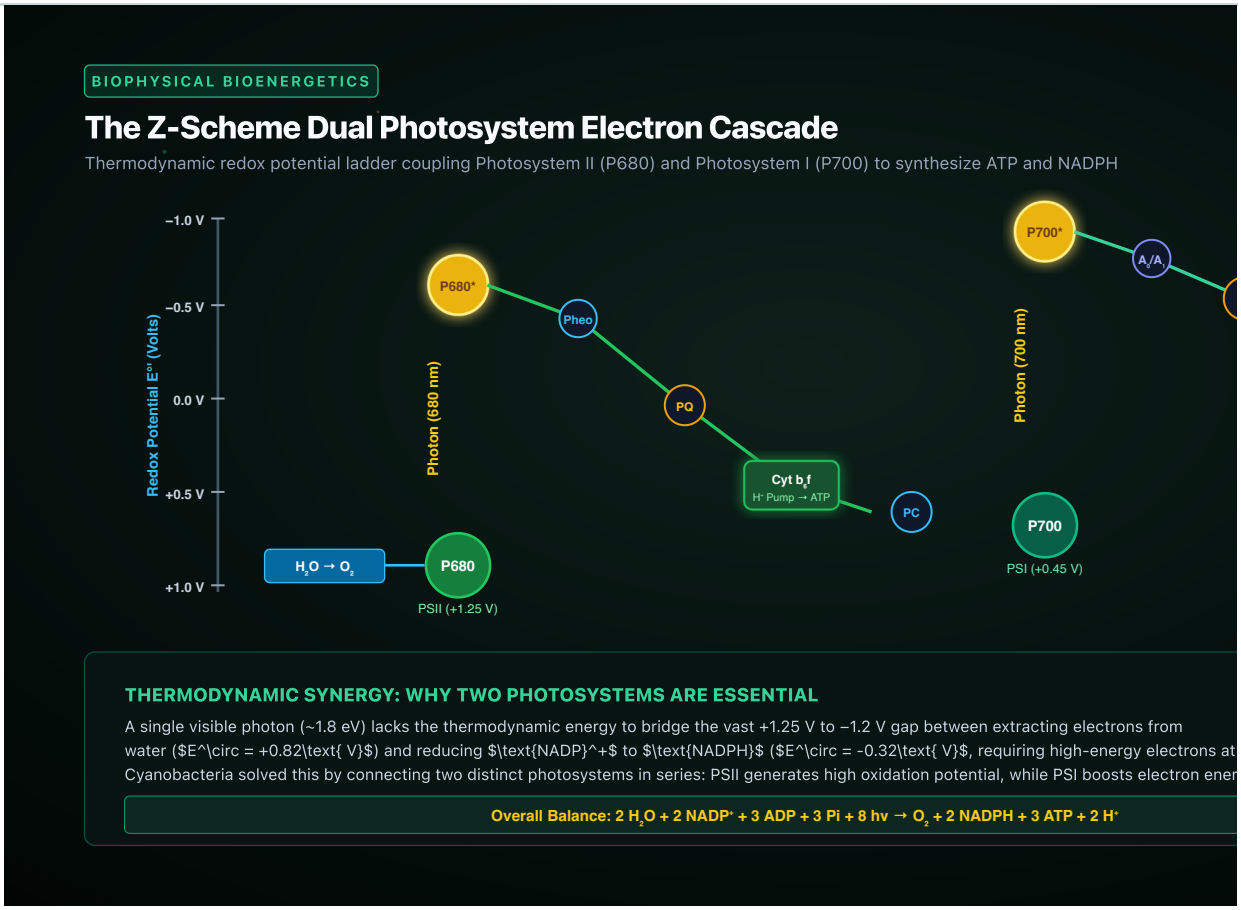
Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৩.১: অক্সিজেনিক সালোকসংশ্লেষণের অনুঘটকীয় কেন্দ্র। ফটোসিস্টেম-২-এ অবস্থিত $\mathrm{Mn_4CaO_5}$ ক্লাস্টারের পরমাণু বিন্যাস। বেসেল ককের ৪-ধাপের এস-স্টেট ক্লক চক্রের ($S_0 \to S_4$) মাধ্যমে ৪টি ফোটন ($h\nu$) শোষণ করে ধাপে ধাপে ৪টি ইলেকট্রন জমা করে এক অণু অক্সিজেন ($\mathrm{O_2}$) নিঃসরণ ঘটে।

এই চারটি ইলেকট্রন আহরণের কাজটি সুচারুভাবে পরিচালনা করে **অক্সিজেন-ইভলভিং কমপ্লেক্স (OEC)**, যা চারটি ম্যাঙ্গানিজ, একটি ক্যালসিয়াম এবং পাঁচটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত: $\mathrm{Mn_4CaO_5}$।

১৯৭০ সালে বেসেল কক আবিষ্কার করেন যে এই ম্যাঙ্গানিজ ক্লাস্টারটি একটি প্রাকৃতিক ক্যাপাসিটরের মতো কাজ করে, যাকে *ককের এস-স্টেট চক্র* বলা হয়। একক ইলেকট্রন সরালে কোষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হাইড্রক্সিল র‍্যাডিক্যাল তৈরি হতে পারত। তাই OEC একটি করে ফোটন গ্রহণ করে S_0 থেকে S_1, S_2, S_3 পেরিয়ে S_4 দশায় পৌঁছায়। চারটি ইলেকট্রনের ঘাটতি তৈরি হলেই সে পানির দুটি অণুকে সংযুক্ত করে তাদের জারিত করে এক অণু মুক্ত অক্সিজেন ($\mathrm{O_2}$) এবং চারটি প্রোটন ($\mathrm{H^+}$) ছেড়ে দিয়ে পুনরায় S_0 দশায় ফিরে আসে।



চিত্র ৩.২: জীব-পদার্থবিজ্ঞানিক Z-স্কিম। দুটি ফটোসিস্টেমকে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত করে পানি থেকে ইলেকট্রন ছিনিয়ে এনে ($+০.৮২$ V) তা কার্বন সংবন্ধনের উপযোগী NADPH স্তরে (-০.৩২ V) উন্নীত করা হয়। সাইটোক্রোম b_6f প্রোটন পাম্পের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে এটিপি সংশ্লেষণ নিশ্চিত করে।

২. Z-স্কিম: দুটি সৌর ইঞ্জিনের মেলবন্ধন

দৃশ্যমান আলোর একটিমাত্র ফোটনের শক্তিতে পানি থেকে ইলেকট্রন বের করে একই সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারণের জন্য অত্যন্ত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন NADPH অণু তৈরি করা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে অসম্ভব ছিল।

সায়ানোব্যাকটেরিয়া এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল তাদের অনন্য **Z-স্কিম** আর্কিটেকচারের মাধ্যমে। তারা ফটোসিস্টেম-২ (PSII) এবং ফটোসিস্টেম-১ (PSI)—এই দুটি স্বাধীন ফটোকেমিক্যাল ইঞ্জিনকে একটির পর একটি তারে যুক্ত করেছিল:

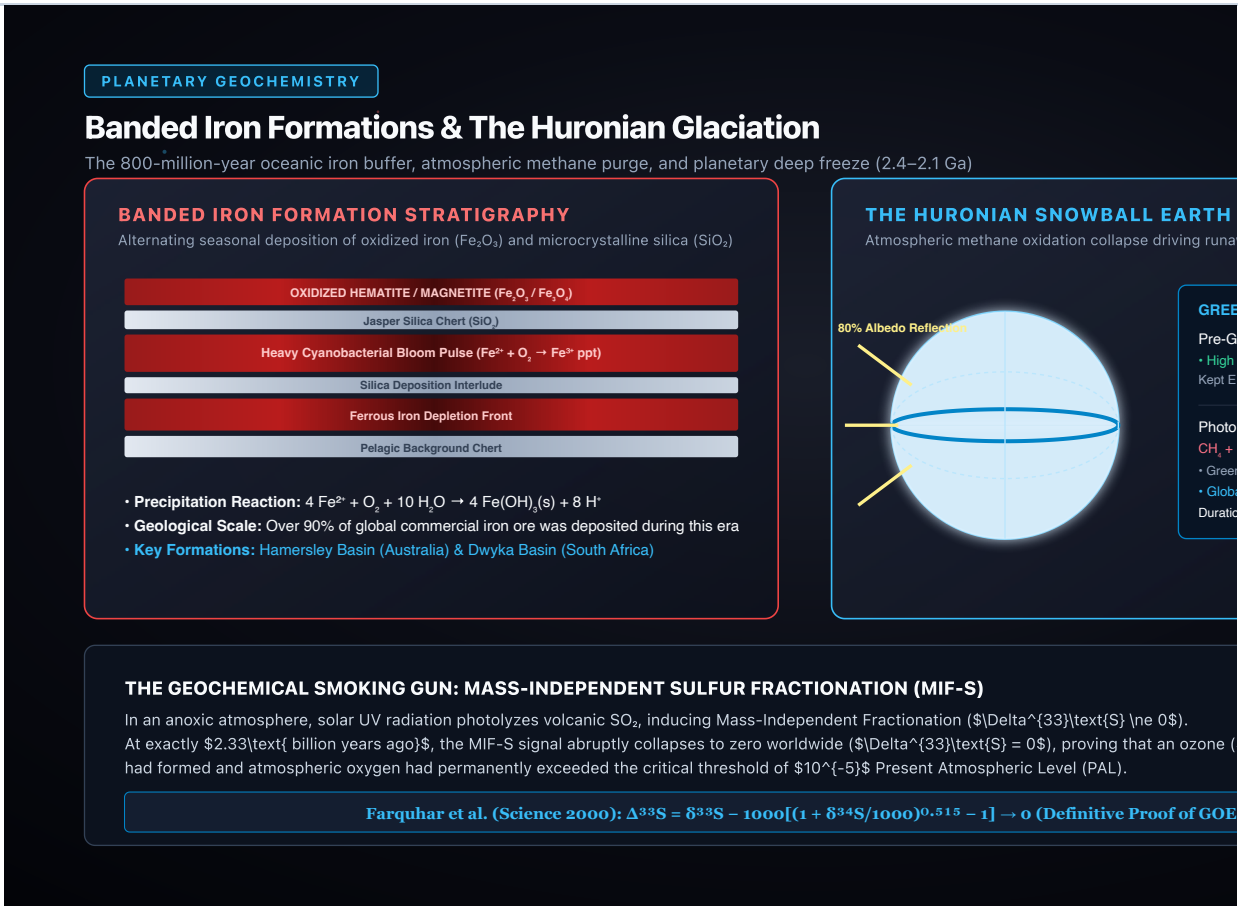
1. **প্রথম আলোক ধাক্কা (PSII):** P680 আলো শোষণ করে উত্তেজিত হয়ে ইলেকট্রনকে উঁচুতে তুলে দেয় (-০.৬ V)। সেখান থেকে ইলেকট্রন প্লাস্টোকুইনোন ও সাইটোক্রোম b_6f কমপ্লেক্সের মধ্য দিয়ে নিচের দিকে ধাবিত হয়। এই ঢালু পথে নামার সময় নির্গত শক্তিতে প্রোটন পাম্পিং ঘটে, যা এটিপি (ATP) সংশ্লেষণ করে।
2. **মধ্যবর্তী পরিবাহক:** তামাযুক্ত প্লাস্টোসায়ানিন (PC) প্রোটিন সেই ইলেকট্রনকে বহন করে নিয়ে যায় ফটোসিস্টেম-১ (P700)-এর দরবারে।
3. **দ্বিতীয় আলোক ধাক্কা (PSI):** P700 সূর্যালোক শোষণ করে সেই ইলেকট্রনকে দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিয়ে চরম শক্তিশালী -১.২ V বিভবে উন্নীত করে। এই অবিশ্বাস্য শক্তি নিয়ে ইলেকট্রন ফেরেডক্সিনের মাধ্যমে FNR এনজাইমে পৌঁছায় এবং তৈরি করে কার্বন সংবন্ধনের প্রধান চালিকাশক্তি: NADPH।

এর সার্বিক ফলাফল ছিল প্রকৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর বায়ো-এনার্জেটিক ইঞ্জিন:

$$2\mathrm{H_2O} + 2\mathrm{NADP^+} + 3\mathrm{ADP} + 3\mathrm{P}_i + 8h\nu \rightarrow \mathrm{O_2} + 2\mathrm{NADPH} + 3\mathrm{ATP} + 2\mathrm{H^+}$$

সূর্যালোক ও পানির অফুরন্ত জোগান পেয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে সায়ানোব্যাকটেরিয়ার জন্মহার ও জৈববস্তুর পরিমাণ শতগুণ বেড়ে গেল। অগভীর সমুদ্রে তাদের তৈরি পাথুরে কলোনিগুলো **স্ট্রমাটোলাইট** নামে আজও অস্ট্রেলিয়ার পিলবারায় জীবাশ্ম আকারে টিকে রয়েছে।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৩.৩: গ্রহজোড়া ভূ-রাসায়নিক বিপর্যয়। বামে: সমুদ্রের দ্রবীভূত লোহা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি হওয়া ব্যান্ডেড আয়রন ফরমেশনের লাল হেমাটাইট ও সিলিকা স্তর। ডানে: বায়ুমণ্ডলের মিথেন গ্রিনহাউস ধ্বংস হয়ে বিশ্বজুড়ে নেমে আসা হুরোনিয়ান স্নোবল আর্থ (২৪০–২১০ কোটি বছর পূর্বে)।

৩. মহাজাগতিক অক্সিজেন বিপর্যয় এবং স্নোবল আর্থ

ভবিষ্যতের জটিল জীবনের জন্য অক্সিজেন আশীর্বাদ হলেও আদিম আর্কিয়ান পৃথিবীর অ্যানেরোবিক অণুজীবদের জন্য এটি ছিল এক মহাপ্রলয়ঙ্কর বিষ! মুক্ত অক্সিজেন এবং তার বিক্রিয়াশীল ফ্রি-র‍্যাডিক্যালগুলো প্রাচীন ব্যাকটেরিয়ার দেহের এনজাইম ও ডিএনএ-কে সরাসরি পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলতে লাগল।

তবে প্রায় ৮০ কোটি বছর ধরে (৩২০\text{–}২৪০\text{ কোটি বছর আগে}) একটি বিশাল প্রাকৃতিক স্পঞ্জ পৃথিবীকে রক্ষা করেছিল: প্রাচীন সাগরে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টন দ্রবীভূত সবুজ ফেরাস লোহা (Fe^{2+}) ভাসমান অবস্থায় ছিল। সায়ানোব্যাকটেরিয়া যে অক্সিজেন তৈরি করত, তা সাথে সাথে এই লোহার সাথে বিক্রিয়া করে মরচে বা অদ্রবণীয় আয়রন অক্সাইড হয়ে সমুদ্রতলে জমা হতো:

$$4Fe^{2+} + O_2 + 10H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3(s) + 8H^+$$

এই বিক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের তলদেশে তৈরি হলো মাইলের পর মাইল বিস্তৃত **ব্যান্ডেড আয়রন ফরমেশন (BIF)**—লাল জ্যাসপার ও কালো হেমাটাইটের রূপালী স্তর, যা থেকে আজ বিশ্বের ৯০% লোহার আকরিক উত্তোলন করা হয়।

অবশেষে প্রায় ২৪০ কোটি বছর আগে সাগরের সমস্ত লোহা ফুরিয়ে গেল। তখন অতিরিক্ত অক্সিজেন বাতাস ও বায়ুমণ্ডলে উপচে পড়তে শুরু করল, যাকে ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন **গ্রেট অক্সিডেশন ইভেন্ট (GOE)**।

২০০০ সালে জেমস ফারকুহার সালফারের আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করে এর নিশ্চিত প্রমাণ পান: ২৪০ কোটি বছরের আগের শিলায় সালফারের অস্বাভাবিক ভর-নিরপেক্ষ ফ্র্যাকশনেশন ($\Delta^{33}S \neq 0$) পাওয়া যায়, যা বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন না থাকার প্রমাণ। কিন্তু ঠিক ২৩৩ কোটি বছর আগে এই সংকেতটি হঠাৎ করে শূন্যে নেমে আসে ($\Delta^{33}S = 0$), অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে স্থায়ী ওজোন স্তর গঠিত হয়েছিল।

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন প্রবেশের ফলে এক ভয়াবহ জলবায়ু বিপর্যয় ঘটে। তখন সূর্যের তেজ ছিল আজকের চেয়ে প্রায় ২০–২৫% কম। পৃথিবীকে উষ্ণ রাখত বায়ুমণ্ডলের মিথেন গ্যাস (CH_4)। বাতাসে আসা অক্সিজেন এই মিথেনকে জারিত করে দুর্বল কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তর করে ফেলল:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

মুহূর্তের মধ্যে গ্রহের গ্রিনহাউস কম্বল ছিঁড়ে গেল। বৈশ্বিক তাপমাত্রা মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এলো। মেরু অঞ্চলের বরফ অগ্রসর হতে হতে বিষুবরেখা পর্যন্ত পৌঁছাল। শুরু হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম বরফযুগ—**হুরোনিয়ান স্নোবল আর্থ** (২৪০\text{–}২১০\text{ কোটি বছর পূর্বে})। টানা ৩০ কোটি বছর ধরে গোটা পৃথিবী কিলোমিটার-পুরু বরফের চাদরে ঢেকে রইল।

উপসংহার: বায়বীয় জীবনের উন্মেষ

গ্রেট অক্সিডেশন ইভেন্ট ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম বৈশ্বিক পরিবেশগত বিপর্যয় এবং আদিম অক্সিজেনহীন জীবনের সবচেয়ে বড় গণবিলুপ্তি। তবে স্নোবল আর্থের বরফগলা সংকীর্ণ ফাটলে বেঁচে থাকা অণুজীবেরা এই ঘাতক অক্সিজেনকে বশ মানাতে শিখল। তারা উদ্ভাবন করল সুপারঅক্সাইড ডিসমিউটেজ এবং ক্যাটালেজ এনজাইম।

অক্সিজেনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রাণরসায়নে সৃষ্টি হলো এক অভূতপূর্ব শক্তির জোয়ার। এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে ফারমেন্টেশন যেখানে মাত্র ২টি এটিপি শক্তি দেয়, অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বসন সেখানে দেয় ৩৬ থেকে ৩৮টি এটিপি—১৮ গুণ বেশি শক্তি! এই বিপুল শক্তির ওপর ভর করেই সৃষ্টি হতে পেরেছিল জটিল ও উন্নত ইউক্যারিওটিক কোষ। ৪র্থ পর্বে আমরা দেখব সেই ইউক্যারিওটিক মহাবিস্ফোরণ।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- Kok, B., Forbush, B., & McGloin, M. (1970). Cooperation of charges in photosynthetic O₂ evolution–I. A linear four step mechanism. *Photochemistry and Photobiology*, 11(6), 457–475.
- Barber, J. (2006). Photosystem II: an enzyme of global significance. *Biochemical Society Transactions*, 34(5), 619–625.
- Farquhar, J., Bao, H., & Thiemens, M. (2000). Atmospheric influence of Earth's earliest sulfur cycle. *Science*, 289(5480), 756–758.
- Lyons, T. W., Reinhard, C. T., & Planavsky, N. J. (2014). The rise of oxygen in Earth's early ocean and atmosphere. *Nature*, 506(7488), 307–315.
- Fischer, W. W., Hemp, J., & Johnson, J. E. (2016). Evolution of oxygenic photosynthesis. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 44, 647–672.

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সৌরশক্তির বিপ্লব — সালোকসংশ্লেষণ, পানি বিভাজন এবং মহাজাগতিক অক্সিজেন বিপর্যয়"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ৩। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-3-the-solar-energy-revolution-bn/

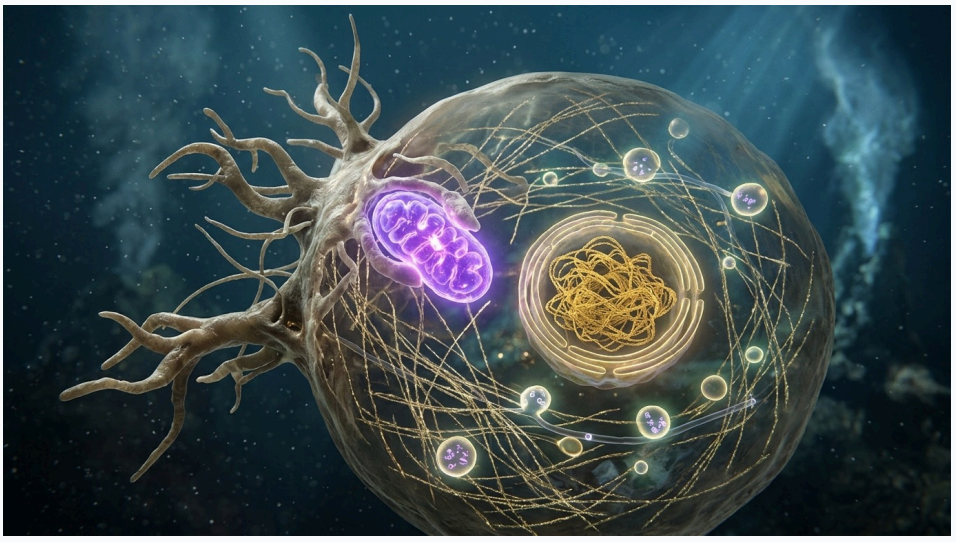
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্থ খণ্ড

ইউক্যারিওটিক মহাবিস্ফোরণ — অ্যাসগার্ড আর্কিয়া, এন্ডোসিম্বিওসিস এবং জটিল কোষের উদ্ভব

ইউক্যারিওটিক মহাবিস্ফোরণ — অ্যাসগার্ড আর্কিয়া, এন্ডোসিম্বিওসিস এবং জটিল কোষের উদ্ভব

1,236 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



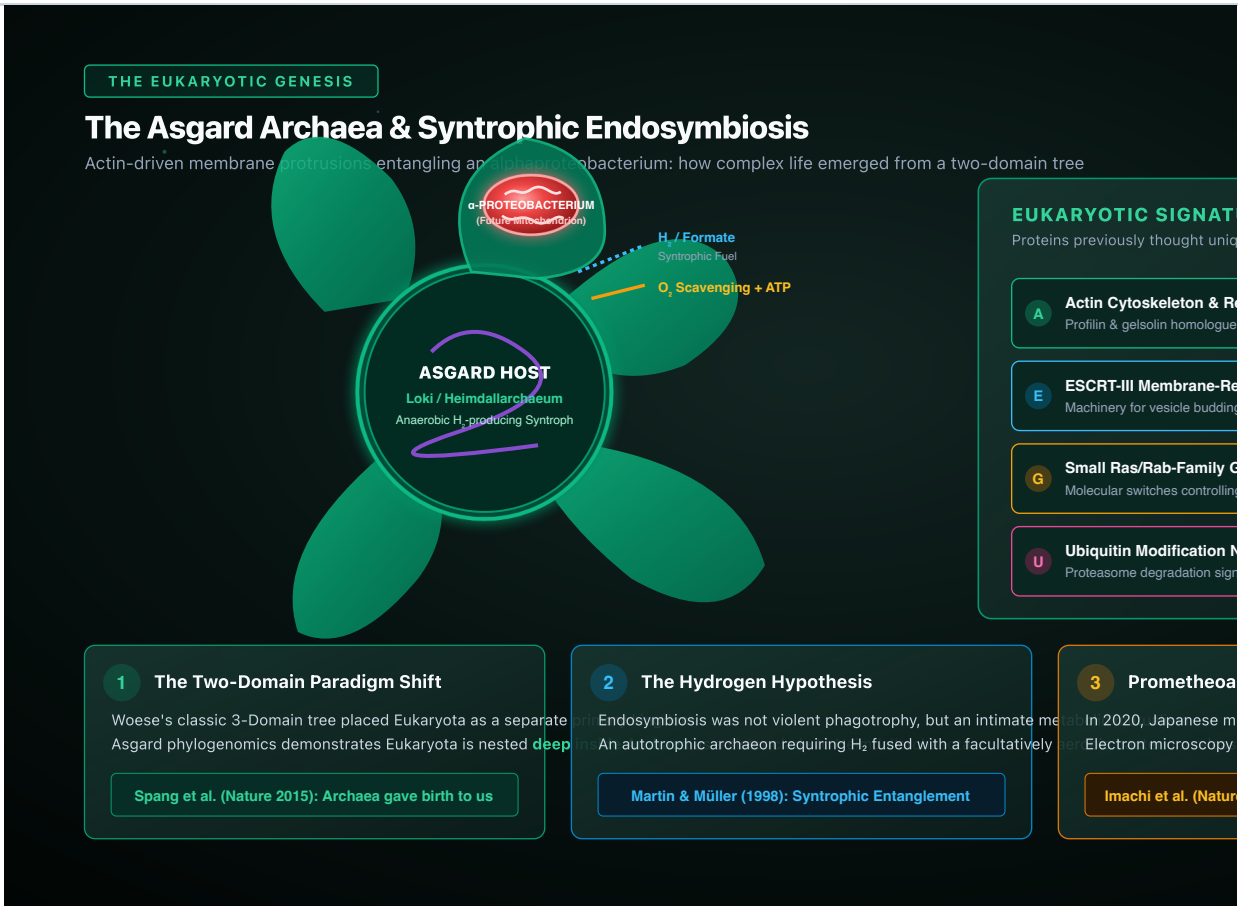
চিত্র ৪: *চিত্র: মেসোপ্রোটেরোজোয়িক যুগে (~১.৮ বিলিয়ন বছর আগে) কোষীয় এন্ডোসিমবায়োসিস: একটি আসগার্ড আর্কিয়ন পোষক কোষ অ্যালফাপ্রোটিওব্যাকটেরিয়া পূর্বপুরুষকে ধারণ করে মাইটোকনড্রিয়া, জটিল এন্ডোমেমব্রেন এবং প্রথম ইউক্যারিওটিক কোষের জন্ম দেয়।*

গ্রহের ইতিহাসের প্রথম দুইশো কোটি বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত জীবন ছিল অণুবীক্ষণিক। ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়ারা আলোকসংশ্লেষণ থেকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন পর্যন্ত সবরকম রাসায়নিক কৌশল আয়ত্ত করলেও কাঠামোগতভাবে তারা কখনোই সাধারণ আদিম কোষের গণ্ডি পেরোতে পারেনি: দেয়ালঘেরা ক্ষুদ্র রাসায়নিক থলি মাত্র। অবশেষে প্রায় ১৮০ কোটি বছর আগে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অণুজীবের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য মিলন ঘটেছিল—এমন এক জৈবিক ঘটনা যা চারশো কোটি বছরের ইতিহাসে মাত্র একবারই ঘটেছে, যা আদিম কোষের শক্তির দেয়াল ভেঙে দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি শৈবাল, বটগাছ, ছত্রাক এবং মানুষের জন্ম দিয়েছিল।

১. অ্যাসগার্ড আর্কিয়া: আমাদের সত্যিকারের পূর্বপুরুষের সন্ধান

১৯৭৭ সালে কার্ল ওজের যুগান্তকারী গবেষণার পর কয়েক দশক ধরে পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হতো জীবনের তিনটি মূল রাজ্য: ব্যাকটেরিয়া, আর্কিয়া এবং ইউক্যারিওটা। কিন্তু এই তত্ত্বে ইউক্যারিওটিক কোষের অবিশ্বাস্য জটিলতা—সাইটোস্কেলিটন, অন্তঃঝিল্লি এবং পুষ্টি বহনের ভেসিকল সিস্টেমের উৎপত্তি—এক চিরন্তন রহস্য হয়ে ছিল।

২০১৫ সালে নরওয়ের সভালবার্ডের কাছে গভীর সমুদ্রতলের ‘লকিজ ক্যাসেল’ থেকে সংগৃহীত পলিমাটির ডিএনএ বিশ্লেষণ করে থিজ এটেমার গবেষক দল এক নতুন আর্কিয়ার জিনোম আবিষ্কার করেন, যার নাম দেওয়া হয় **লোকিয়ার্কিয়া**। পরবর্তীতে ওডিন, থর এবং হাইমডাল সহ এই নতুন সুপারফাইলামের নাম রাখা হয় **অ্যাসগার্ড আর্কিয়া** (Asgard Archaea)।



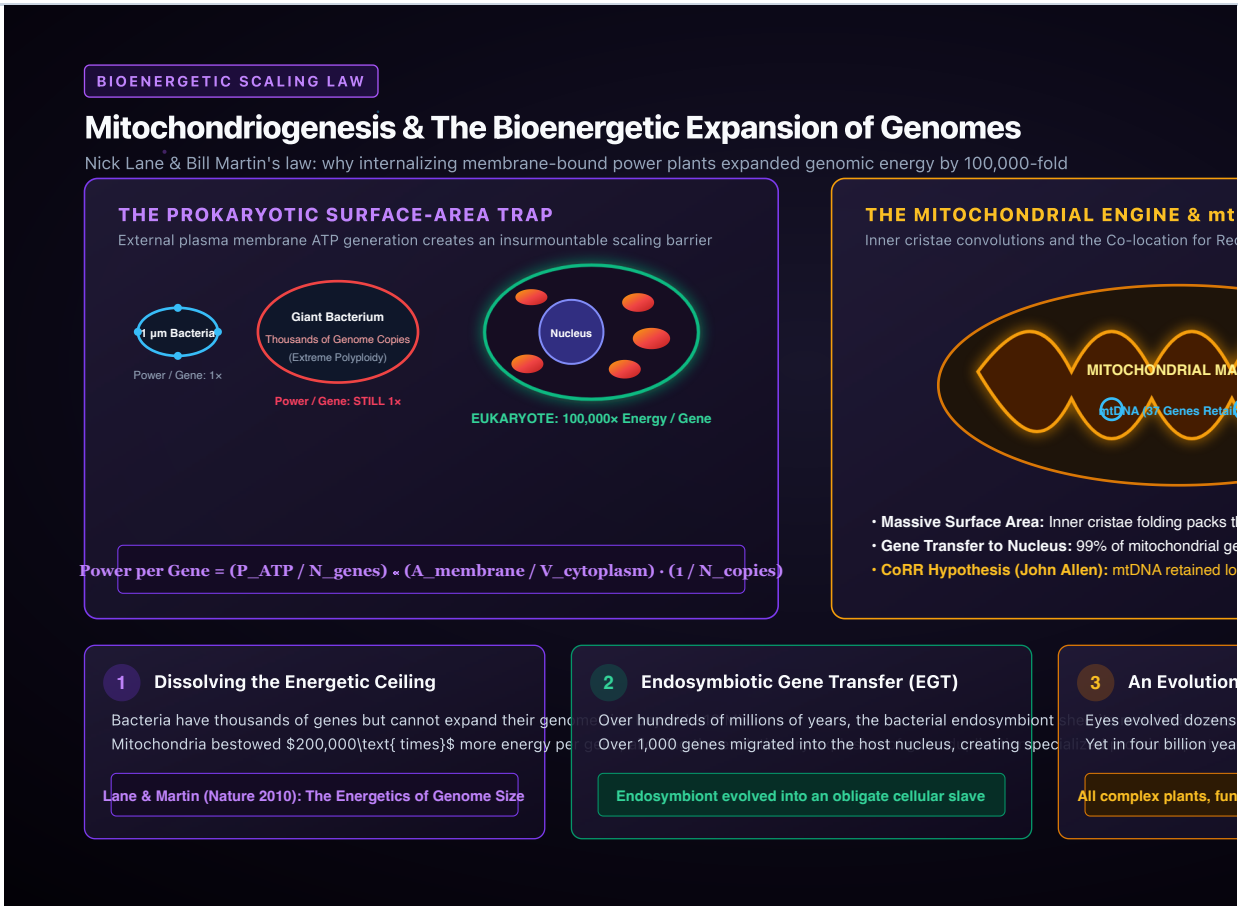
চিত্র ৪.১: ইউক্যারিওটের আর্কিয়াল আঁতুড়ঘর। অ্যাসগার্ড আর্কিয়া (যেমন *Prometheoarchaeum syntrophicum*) অ্যাক্টিন-সমৃদ্ধ দীর্ঘ বাহু বা প্রোট্রুশন বাড়িয়ে একটি আলফাপ্রোটিওব্যাকটেরিয়াকে আলিঙ্গন করছে। অ্যাসগার্ড জিনোমে প্রোটিন নিয়ন্ত্রণকারী প্রোফিলিন, জেলসোলিন, র‍্যাস-জিটিপিয়েজ এবং মেমব্রেন নিয়ন্ত্রণকারী ESCRT-III প্রোটিনের বিস্ময়কর উপস্থিতি মেলে।

অ্যাসগার্ড আর্কিয়ার জিনোম দেখে বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হয়ে যান। যেসব জিন এতদিন শুধু আমাদের মতো জটিল ইউক্যারিওটিক কোষে পাওয়া যেত (Eukaryotic Signature Proteins – ESPs), তার প্রায় সবই অ্যাসগার্ড আর্কিয়ার দেহে প্রস্তুত ছিল! এদের দেহে পাওয়া গেল সত্যিকারের অ্যাক্টিন সাইটোস্কেলিটন, কোষঝিল্লি সংকোচনকারী ESCRT-III প্রোটিন এবং কোষের ভেতরে জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার ছোট ছোট জিটিপিয়েজ (GTPase) সুইচ।

জিনগত বৃক্ষ পুনর্গঠন করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ইউক্যারিওট কোনো আলাদা রাজ্য নয়: *আমরা আর্কিয়ারই একটি শাখা*, যারা অ্যাসগার্ড আর্কিয়ার কোল থেকে জন্ম নিয়েছি।

২০২০ সালে জাপানি বিজ্ঞানী মাসারু নোবু দীর্ঘ ১২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে গবেষণাগারে বিশ্বের প্রথম জীবিত অ্যাসগার্ড আর্কিয়া *Prometheoarchaeum syntrophicum* চাষ করতে সক্ষম হন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়, এরা শিকার গিলে খাওয়ার বদলে অত্যন্ত চিকন চিকন শাখা-প্রশাখা বা বাহু তৈরি করে সহযোগী ব্যাকটেরিয়াকে জড়িয়ে ধরে রাখে। এর মাধ্যমে মার্টিন ও মুলারের **হাইড্রোজেন অনুকল্প** প্রমাণিত হয়: এই মিলন কোনো আক্রমণ ছিল না, বরং হাইড্রোজেন-প্রেমী আর্কিয়া এবং হাইড্রোজেন-নিঃসরণকারী ব্যাকটেরিয়ার এক নিবিড় পারস্পরিক মিথোজীবিতা ছিল।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৪.২: জৈব-শক্তির সীমারেখা ভাঙার সূত্র। নিক লেন ও বিল মার্টিনের বায়ো-এনার্জেটিক স্কেলিং সূত্র। বামে: ব্যাকটেরিয়া তাদের বহিঃঝিল্লিতে শক্তি তৈরি করায় আয়তন বাড়লে জিনপ্রতি শক্তি শূন্যে নেমে আসে। মাঝে: বৃহৎ ব্যাকটেরিয়া হাজার হাজার জিনোম কপি রাখায় জিনপ্রতি শক্তিতে কোনো লাভ হয় না। ডানে: শত শত মাইটোকন্ড্রিয়া ভেতরে ঢুকিয়ে ইউক্যারিওট কোষ জিনপ্রতি শক্তি ১ লাখ গুণ বাড়িয়ে নেয়।

২. মাইটোকন্ড্রিয়া এবং জৈব-শক্তির স্কেলিং সূত্র

চারশো কোটি বছরে ব্যাকটেরিয়া কেন কখনো বড় ও জটিল বহুকোষী প্রাণী হতে পারল না? কেন তাদের জিনোমের আকার একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আটকে রইল?

২০১০ সালে বিখ্যাত *নেচার* সাময়িকীতে নিক লেন এবং উইলিয়াম মার্টিন এর নিখুঁত পদার্থবৈজ্ঞানিক উত্তর দেন: **বায়ো-এনার্জেটিক স্কেলিং সীমাবদ্ধতা**।

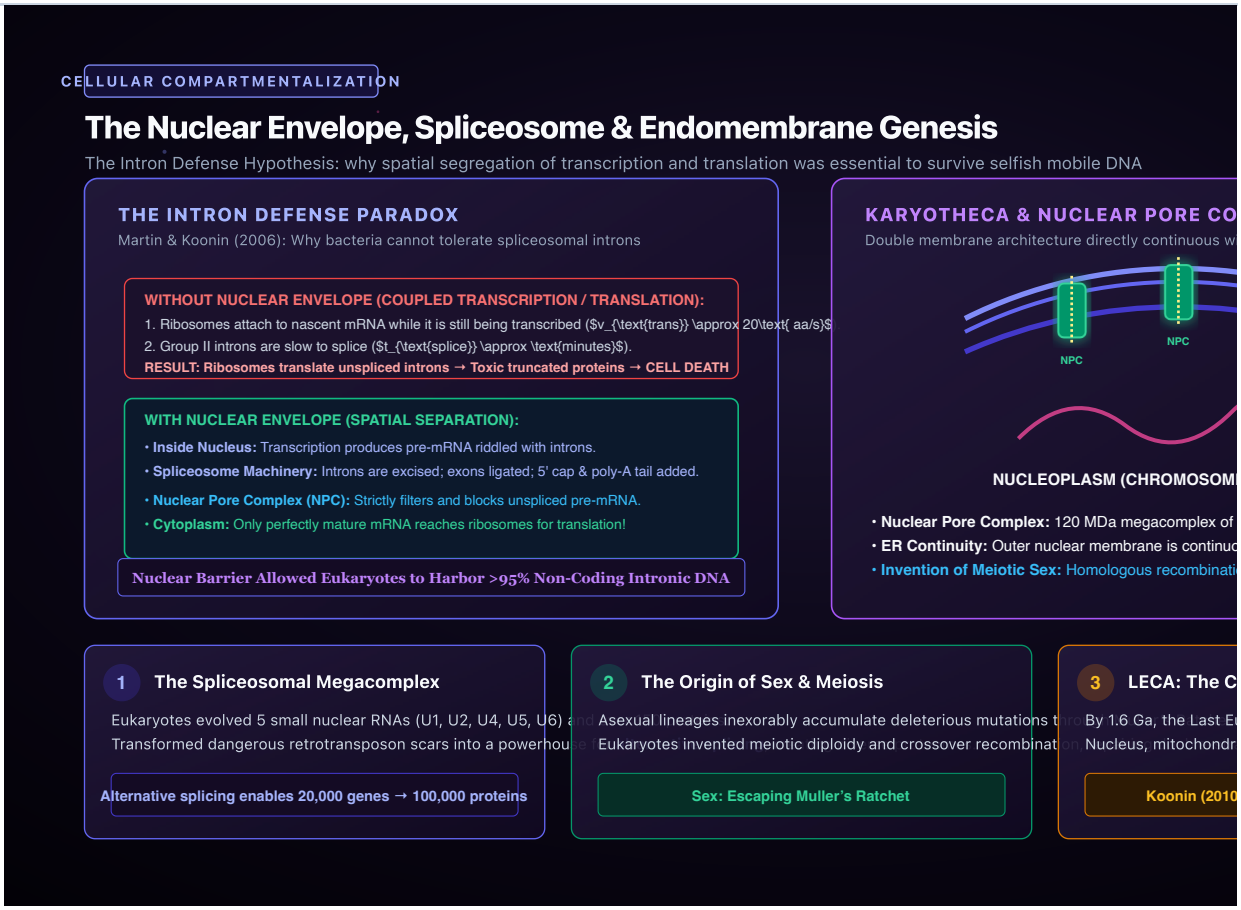
প্রতিটি ব্যাকটেরিয়া তার কোষের বাইরের ঝিল্লিটিতে এটিপি বা শক্তি উৎপাদন করে। গোলক বা নলের আকৃতির কোষ যখন আকারে বড় হয়, তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বাড়ে ব্যাসার্ধের বর্গের অনুপাতে ($A \propto r^2$), কিন্তু ভেতরের আয়তন বাড়ে ঘনকের অনুপাতে ($V \propto r^3$)। ফলে একটি ব্যাকটেরিয়া যখনই বড় হতে চায়, তার বাইরের ঝিল্লি ভেতরের বিপুল সাইটোপ্লাজমকে বাঁচিয়ে রাখার মতো শক্তি সরবরাহ করতে পারে না:

$$\text{Power per Gene} = \frac{P_{\text{ATP}}}{N_{\text{genes}}} \propto \frac{A_{\text{membrane}}}{V_{\text{cytoplasm}}} \cdot \frac{1}{N_{\text{জিনোম কপি}}}$$

প্রকৃতিতে যে বিরল বৃহৎ ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখা যায় (যেমন *Epulopiscium* বা *Thiomargarita*), তারা বেঁচে থাকে এক চরম মূল্যে: তাদের একটি কোষে সম্পূর্ণ জিনোমের **হাজার হাজার অভিন্ন কপি** রাখতে হয়। ফলে বৃহৎ ব্যাকটেরিয়ায় হাজার হাজার জিনোম থাকা সত্ত্বেও প্রতি জিনের পেছনে উপলব্ধ শক্তির পরিমাণ একটি সাধারণ অণুবীক্ষণিক *E. coli*-র সমানই থাকে!

মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তর্ভুক্তি এই শক্তির শৃঙ্খল চিরতরে ভেঙে দিয়েছিল। ব্যাকটেরিয়াল সঙ্গীকে নিজের দেহের ভেতরে নিয়ে এসে পোষক কোষ শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে দ্বি-মাত্রিক বাইরের তল থেকে ত্রি-মাত্রিক ভেতরের জগতে স্থানান্তরিত করল। প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরের মেমব্রেন ভাঁজ হয়ে হাজার হাজার **ক্রিস্টি** (cristae) তৈরি করল, যা কোষের বাইরের ক্ষেত্রফলের ওপর কোনো চাপ না ফেলেই কোটি কোটি এটিপি সিন্থেস মোটর বসানোর জায়গা করে দিল।

অধিকন্তু, কোটি কোটি বছর ধরে মাইটোকন্ড্রিয়া তার অপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিন পোষকের প্রধান নিউক্লিয়াসে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে একটি অতি-দক্ষ জৈব ব্যাটারিতে পরিণত করল। ফলে একটি ইউক্যারিওটিক কোষ প্রতিটি জিনের পেছনে সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে **১ লাখ থেকে ২ লাখ গুণ বেশি শক্তি** পেতে শুরু করল! এই বিপুল শক্তির জোরেই সম্ভব হয়েছিল নতুন নতুন জিন তৈরি, বিকল্প স্প্লাইসিং এবং চোখ, ডানা ও মস্তিষ্কের মতো কোটি কোটি কোষের বহুকোষী জটিল প্রাণী সৃষ্টি।



চিত্র ৪.৩: নিউক্লিয়াসের সূচনা এবং ইন্ট্রন প্রতিরক্ষা কবচ। মার্টিন ও কুনিনের (২০০৬) ইন্ট্রন প্রতিরক্ষা তত্ত্ব। ব্যাকটেরিয়ার এন্ডোসিম্বিয়ন ফেটে যাওয়ার পর হাজার হাজার পরজীবী মোবাইল ইন্ট্রন পোষকের জিনোমে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বি-স্তরী নিউক্লিয়ার এনভেলপ ও নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স (NPC) অনুবাদের গতি থেকে প্রতিলিপিকরণকে আলাদা করে কোষকে রক্ষা করেছিল।

৩. নিউক্লিয়াসের জন্ম: বিধ্বংসী ইন্ট্রন থেকে বাঁচার ঢাল

মাইটোকন্ড্রিয়া অফুরন্ত শক্তি আনলেও শুরুতে সে পোষক কোষের জন্য এক মহাবিপদ ডেকে এনেছিল: পরজীবী মোবাইল জিনের আক্রমণ।

আদিম আলফাপ্রোটিওব্যাকটেরিয়ার জিনোমে ছিল হাজার হাজার **গ্রুপ-২ সেলফ-স্প্লাইসিং ইন্ট্রন**—এক ধরনের স্বার্থপর জাম্পিং জিন। পোষকের ভেতরে যখনই কোনো ব্যাকটেরিয়াল সঙ্গী মারা যেত, তার ডিএনএ গিয়ে পোষকের মূল ক্রোমোজোমে ঢুকে জরুরি জিনগুলোর মাঝখানে ক্ষত তৈরি করত।

ব্যাকটেরিয়ার দেহে কোনো দেয়াল থাকে না; সেখানে আরএনএ তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই রাইবোজোম এসে প্রোটিন তৈরি শুরু করে (২০ অ্যামিনো অ্যাসিড/সেকেন্ড)। কিন্তু আরএনএ থেকে এই ক্ষতিকর ইন্ট্রন কেটে বাদ দিতে সময় লাগে কয়েক মিনিট। ফলে ইন্ট্রন কাটার আগেই রাইবোজোম অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ প্রোটিন তৈরি করে কোষকে বিষাক্ত করে মেরে ফেলত!

এই প্রাণঘাতী সংকট দূর করতেই সৃষ্টি হয়েছিল ইউক্যারিওট কোষের প্রধান প্রতীক: **নিউক্লিয়ার এনভেলপ (ক্যারিয়োথেকে) বা কোষকেন্দ্রের দেয়াল**।

কোষের ভেতরের ঝিল্লি ভাঁজ হয়ে ডিএনএ-র চারপাশে একটি দ্বি-স্তরী দেয়াল এবং তাতে আণবিক দারোয়ান হিসেবে **নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স (NPC)** বসিয়ে দিল। এর ফলে আরএনএ তৈরির কাজ এবং স্প্লাইসিং-এর ধীরগতির প্রক্রিয়াটি নিউক্লিয়াসের ভেতরে নিরাপদে সম্পন্ন হতে পারত। যতক্ষণ না আরএনএ থেকে ক্ষতিকর অংশ কেটে বাদ দিয়ে নিখুঁত ও পরিপক্ক মেসেঞ্জার আরএনএ (mRNA) তৈরি হতো, ততক্ষণ নিউক্লিয়াসের গেট দিয়ে কোনো আরএনএ বাইরে বের হতে পারত না।

পরবর্তীতে জীবন এই বিপদকেই এক মহাশক্তিতে রূপান্তর করেছিল। এই ইন্ট্রনগুলো কাটার জন্য তৈরি হলো **স্প্লাইসিওজোম** নামক দানবাকৃতির আণবিক যন্ত্র। এর ফলে একটি একক জিনকে ভিন্ন ভিন্নভাবে জোড়া লাগিয়ে (Alternative Splicing) ডজন ডজন ভিন্ন প্রোটিন তৈরি করা সম্ভব হলো—যা আমাদের ২০ হাজার জিন দিয়ে ১ লাখের বেশি বৈচিত্র্যময় প্রোটিন তৈরির ভিত্তি!

উপসংহার: লেকা (LECA)-র আত্মপ্রকাশ

প্রায় ১৬০ কোটি বছর আগে এই সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন একত্রিত হয়ে জন্ম দিয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত জটিল জীবনের সাধারণ পূর্বপুরুষ: **লেকা (LECA – Last Eukaryotic Common Ancestor)**। লেকা কোনো অপরিপক্ক অণুজীব ছিল না; সে ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক ইউক্যারিওটিক কোষ, যার দেহে ছিল:

- ক্রিস্টি-সমৃদ্ধ নিখুঁত মাইটোকন্ড্রিয়া;
- নিউক্লিয়ার পোরযুক্ত সুগঠিত নিউক্লিয়াস;
- এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও গলগি বডির অন্তঃঝিল্লি সিস্টেম;
- অ্যাক্টিন ও টিউবুলিনের সাইটোস্কেলিটন এবং কাইনেসিনের মতো মোটর প্রোটিন;
- ৯+২ মাইক্রোটিউবিউলের সুগঠিত ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়া;
- এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—**মিয়োসিস ও যৌন প্রজনন**, যা ক্ষতিকর মিউটেশন দূর করে জিনের সুস্থ বৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখত।

Shakil Mahmud • Research Monograph

এই লেকার থেকেই পরবর্তীতে শাখা বিস্তার করেছে সমস্ত প্রাণী ও ছত্রাক (Opisthokonta), গাছপালা ও শৈবাল (Archaeplastida) এবং অ্যামিবা সহ সমস্ত ইউক্যারিওটিক পরিবার। ৫ম পর্বে আমরা পদার্পণ করব দ্বিতীয় পর্বে (Phase II)—যেখানে একক কোষের নিভৃত জীবন পেরিয়ে আমরা দেখব বহুকোষী জীবনের সূচনা এবং ইডিয়াকারান সাগরের রহস্যময় প্রাণীদের উত্থান।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- Spang, A., et al. (2015). Complex archaea that bridge the gap between prokaryotes and eukaryotes. *Nature*, 521(7551), 173–179.
- Imachi, H., et al. (2020). Isolation of an archaeon at the interface of the prokaryote–eukaryote divide. *Nature*, 577(7791), 519–525.
- Lane, N., & Martin, W. (2010). The energetics of genome complexity. *Nature*, 467(7318), 929–934.
- Martin, W., & Müller, M. (1998). The hydrogen hypothesis for the first eukaryote. *Nature*, 392(6671), 37–41.
- Martin, W., & Koonin, E. V. (2006). Introns and the origin of nucleus-cytosol compartmentalization. *Nature*, 440(7080), 41–45.
- Allen, J. F. (2003). Why chloroplasts and mitochondria contain genomes. *Comparative and Functional Genomics*, 4(1), 31–36.

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ইউক্যারিওটিক মহাবিস্ফোরণ — অ্যাসগার্ড আর্কিয়া, এন্ডোসিম্বিওসিস এবং জটিল কোষের উদ্ভব"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ৪। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-4-the-eukaryotic-leap-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চম খণ্ড

বহুকোষী জীবনের সূচনা — কোষীয় সংলগ্নতা, মরফোজেনেসিস এবং ইডিয়াকারান উদ্যান

বহুকোষী জীবনের সূচনা — কোষীয় সংলগ্নতা, মরফোজেনেসিস এবং ইডিয়াকারান উদ্যান

1,266 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৫: *চিত্র: লেট নিওপ্রোটেরোজোয়িক এডিয়াকারান সমুদ্রতলদেশ (~৫৭৫-৫৪১ মিলিয়ন বছর আগে), যেখানে মাইক্রোবিয়াল ম্যাটের উপর নোঙর করা নরম দেহের বহুকোষী প্রাণী যেমন ডিস্ক-আকৃতির ডিকিনসোনিয়া এবং চার্নিয়া দৃশ্যমান।*

তিনশো কোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীর বুকে জীবনের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল এককোষী স্তরে। প্রতিটি কোষ খাদ্যের জন্য একে অপরের সাথে নির্মম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, যত দ্রুত সম্ভব নিজের প্রতিলিপি তৈরি করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ভয়াবহ ক্রায়োজেনিয়ান স্নোবল আর্থ বরফযুগের শেষে, প্রায় ৬০ কোটি বছর আগে, জীববিজ্ঞানে এক অবিশ্বাস্য সমবায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো: স্বাধীন কোষেরা তাদের একক প্রজনন ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে একত্রিত হয়ে তৈরি করল এক একটি জটিল, বিশেষায়িত ও বহুকোষী প্রাণিদেহ। অগভীর ও অক্সিজেনসমৃদ্ধ সাগরে জন্ম নিল শান্ত, অদ্ভুত ও পরাবাস্তব এক ম্যাক্রোস্কোপিক জগৎ—ইডিয়াকারান উদ্যান।

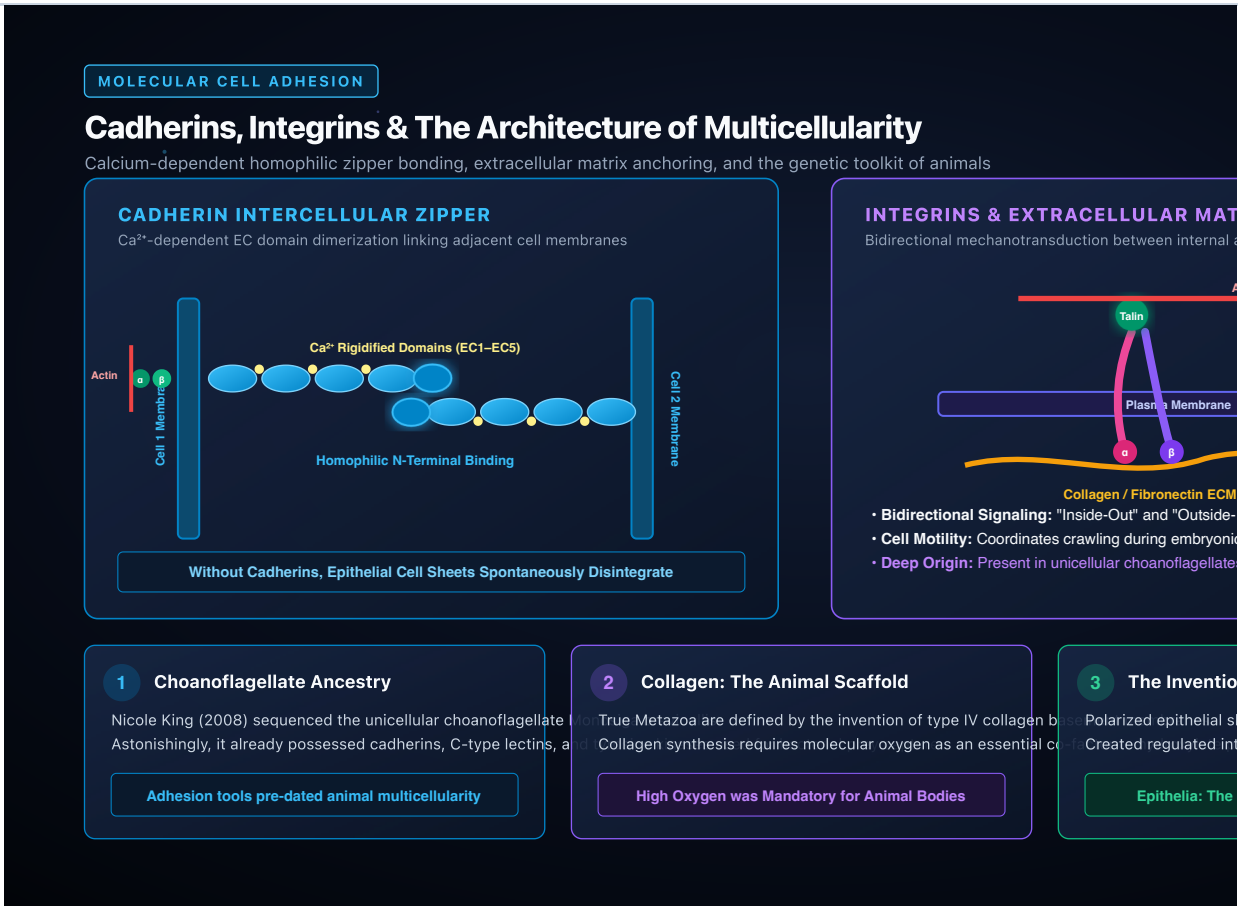
১. বহুকোষী জীবনের জিনগত হাতিয়ার: সংলগ্নতা ও সংকেত ব্যবস্থা

বহুকোষী জীবনের উদ্ভাবন জীববিজ্ঞানে কোনো একক ঘটনা নয়; ছত্রাক, স্লাইম মোল্ড, লোহিত শৈবাল এবং সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে এটি স্বাধীনভাবে অন্তত ২৫ বার উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে জটিল **প্রাণী বা মেটাজোয়া (Metazoa)**-র জন্ম সাধারণ কোষের স্তূপ তৈরির চেয়ে অনেক বেশি জটিল ছিল।

একটি কার্যকর প্রাণিদেহ তৈরি করার জন্য প্রকৃতির তিনটি মৌলিক আণবিক টুলের প্রয়োজন ছিল:

1. **কোষীয় সংলগ্নতা (Cell Adhesion):** দুটি কোষকে আঠার মতো শক্ত করে জোড়া লাগিয়ে রাখা যেন টিস্যু বা কলা ছিঁড়ে না যায়।
2. **বহিঃকোষীয় মাতৃকা (Extracellular Matrix):** কোলাজেনের মতো নমনীয় সুতোর জাল যা গোটা প্রাণিদেহকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতি ও যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করবে।
3. **স্থানিক সংকেত ও মরফোজেনেসিস:** এমন রাসায়নিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যার ফলে অভিন্ন ডিএনএ থাকা সত্ত্বেও অবস্থানের ওপর নির্ভর করে কোষেরা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে (পেশি, স্নায়ু, ত্বক) রূপান্তরিত হতে পারে।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৫.১: মেটাজোয়ার আণবিক বন্ধন ব্যবস্থা। বামে: ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) সাহায্যে ক্যাডারিন প্রোটিনের জিপার-সদৃশ সংযোগ, যা বিটা ও আলফা ক্যাটেনিনের মাধ্যমে কোষের অভ্যন্তরীণ অ্যাক্টিন সাইটোস্কেলিটনের সাথে যুক্ত থাকে। ডানে: ইন্টিগ্রিন হেটেরোডাইমার যা প্লাজমা মেমব্রেন ভেদ করে কোলাজেন ফাইবারের সাথে যুক্ত হয়ে টিস্যুকে টানটান ও দৃঢ় রাখে।

২০০৮ সালে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী নিকোল কিং প্রাণীদের নিকটতম এককোষী আত্মীয় *Monosiga brevicollis* নামক চোয়ানোফ্ল্যাজেলেটের সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্স করে এক চমকপ্রদ সত্য উন্মোচন করেন: প্রাণীদের বহুকোষী দেহ গঠনের মৌলিক উপাদানগুলো প্রথম প্রাণীর জন্মের কোটি কোটি বছর আগেই এককোষী জীবের দেহে উপস্থিত ছিল!

এককোষী চোয়ানোফ্ল্যাজেলেটের দেহে আগে থেকেই **ক্যাডারিন**, লেকটিন এবং টাইরোসিন কাইনেজ সংকেত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। তবে এককোষী অবস্থায় তারা এই আঠালো প্রোটিনগুলো টিস্যু বানাতে নয়, বরং সমুদ্রের পানিতে ভেসে বেড়ানো ব্যাকটেরিয়া শিকার করে আটকে রাখার জন্য ব্যবহার করত। বহুকোষী প্রাণীর বিবর্তন ছিল একটি অপূর্ব রূপান্তর: ব্যাকটেরিয়া শিকারের সেই আঠালো প্রোটিনগুলোকেই পরবর্তীতে নিজের অপত্য কোষকে জোড়া লাগিয়ে প্রথম এপিথেলিয়াল স্তর বা ত্বক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হলো।

অধিকন্তু, প্রাণীদের টিস্যুর ভিত্তি হলো **টাইপ-৪ কোলাজেন**। কোলাজেনের ট্রিপল হেলিক্স ফাইবার তৈরি করতে গেলে প্রোলিন ও লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিডে হাইড্রক্সিল গ্রুপ যুক্ত করার জন্য আণবিক অক্সিজেন অপরিহার্য। পর্যাপ্ত অক্সিজেন ছাড়া কোলাজেন তৈরি অসম্ভব; আর কোলাজেন ছাড়া প্রাণীর শরীর গঠিত হতে পারে না। ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা না বাড়া পর্যন্ত বহুকোষী প্রাণী সৃষ্টি হওয়া রসায়নের নিয়মেই অসম্ভব ছিল।



চিত্র ৫.২: ইডিয়াকারান প্যারাডাইম। বামে: *ডিকিনসোনিয়া কস্টাটা* (Dickinsonia costata) যার দেহে গ্লাইড প্রতিসাম্য এবং স্তরযুক্ত বাতাস-ভরা গদির মতো বৃদ্ধি দেখা যায়। ২০১৮ সালে এতে ৯৩% প্রাণিজ কোলেস্টেরল আবিষ্কারের মাধ্যমে এর প্রাণী পরিচয় নিশ্চিত হয়। ডানে: *চার্নিয়া ম্যাসোনি* (Charnia masoni) যার দেহে ৪র্থ-মাত্রার ফ্র্যাক্টাল শাখা দেখা যায়, যা পরিপাকতন্ত্র ছাড়াই ত্বক দিয়ে দ্রবীভূত পুষ্টি শুষে নিত।

২. ইডিয়াকারান উদ্যান: ফ্র্যাক্টাল ফার্ন ও বাতাস-ভরা গদি

প্রায় ৫৭.৫ থেকে ৫৪.১ কোটি বছর আগে শান্ত ও আলোড়িতহীন নিওপ্রোটেরোজয়িক সাগরে এক অপূর্ব ও পরাবাস্তব ম্যাক্রোস্কোপিক জীবজগৎ গড়ে উঠেছিল: **ইডিয়াকারান বায়োটা** (Ediacaran Biota)।

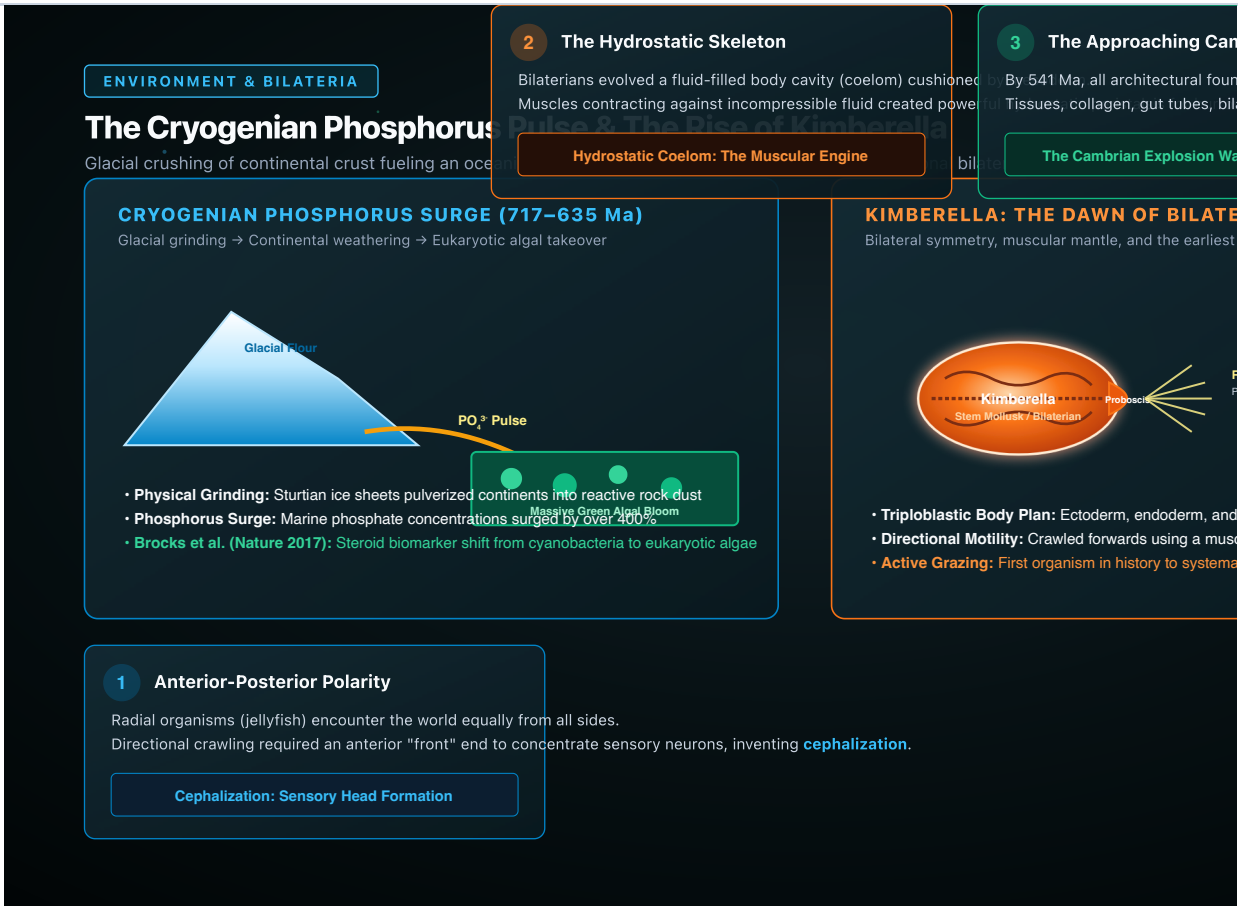
১৯৪৬ সালে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ইডিয়াকারা পাহাড়ে রেজিনাল্ড স্প্রিগ কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত এই অদ্ভুত জীবাশ্মগুলো বিজ্ঞানীদের দশকের পর দশক বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। এদের শরীরে কোনো শক্ত খোলস, চোয়াল, দাঁত, চোখ বা ডানা ছিল না। দেখতে এগুলো ছিল বাতাস-ভরা কুশনযুক্ত গদি, পাতার মতো ডালপালা বা বৃত্তাকার ডিস্কের মতো।

আদি ইডিয়াকারান যুগের প্রধান অধিবাসী ছিল **রেঞ্জিওমর্ফ** (যেমন *চার্নিয়া ম্যাসোনি*)। রেঞ্জিওমর্ফদের দেহের গঠন ছিল এক নিখুঁত গাণিতিক বিস্ময়: **সেলফ-সিমিলার ফ্র্যাক্টাল শাখা**। একটি প্রধান পাতা বিভক্ত হতো কয়েকটি উপ-পাতায়, সেগুলো আবার ক্ষুদ্রতর উপ-শাখায় এবং সেগুলো আরও ক্ষুদ্রতর সূক্ষ্মতম শাখায়—৪র্থ মাত্রা পর্যন্ত এই ফ্র্যাক্টাল পুনরাবৃত্তি ঘটত। এর ফলে তাদের দেহের ক্ষেত্রফল হতো সুবিশাল। মুখ বা পরিপাকতন্ত্র না থাকায় তারা *অসমোট্রফি* প্রক্রিয়ায় তাদের চামড়া দিয়ে সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত জৈব কার্বন ও পুষ্টি সরাসরি শুষে নিত।

এই যুগের সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী হলো **ডিকিনসোনিয়া**—একটি সমতল, ডিম্বাকৃতি জীব যা লম্বায় এক মিটারেরও বেশি হতো। জার্মান বিজ্ঞানী অ্যাডলফ সেইলাখার মনে করতেন এরা বর্তমানের কোনো প্রাণীর পূর্বপুরুষ নয়, বরং বহুকোষী জীবনের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এক স্বাধীন পরীক্ষা, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন ‘ভেন্ডোবায়োন্টা’ (Vendobionta)।

২০১৮ সালে রাশিয়ার শ্বেত সাগরের খাড়া পাহাড় থেকে সংগৃহীত ডিকিনসোনিয়া জীবাশ্মের আণবিক বিশ্লেষণ করে অস্ট্রেলীয় গবেষক ইলিয়া বোব্রোভস্কি এই বিতর্কের চির অবসান ঘটান। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে দেখা গেল, জীবাশ্মের পাথরে **৯৩% প্রাণিজ কোলেস্টেরয়েড** (কোলেস্টেরল) অক্ষত রয়েছে, যেখানে আশেপাশের শ্যাওলাতে তা ছিল মাত্র ১০%। অর্থাৎ ডিকিনসোনিয়া কোনো ছত্রাক বা শৈবাল ছিল না; সে ছিল পৃথিবীর আদিমতম সত্যিকারের প্রাণী!

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৫.৩: পরিবেশগত অনুঘটক ও বাইলেটারিয়ান চলন। বামে: স্নোবল আর্থের হিমবাহ মহাদেশীয় শিলা গুঁড়িয়ে বিপুল ফসফরাস (PO_4^{3-}) সাগরে মিশিয়ে সবুজ শৈবালের মহাবিস্ফোরণ ঘটায়। ডানে: *কিম্বেরোলা কোয়াড্রাটা*—পেশিবহুল পা ও চামড়ার খোলসযুক্ত আদিম দ্বিপার্শ্বীয় প্রাণী, যা দাঁতের সাহায্যে জীবাণুস্তর চেঁছে খাওয়ার পাখাসদৃশ দাগ (Radulichnus) রেখে গেছে।

৩. পরিবেশের ধাক্কা এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রাণীদের উত্থান

শত কোটি বছর ধরে অণুজীবের রাজত্ব চলার পর হঠাৎ কেন এই ম্যাক্রোস্কোপিক বহুকোষী প্রাণের বিস্ফোরণ ঘটল?

এর উত্তর লুকিয়ে আছে ঠিক পূর্ববর্তী **ক্রায়োজেনিয়ান তুষারযুগের** (Snowball Earth) নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্যে। স্টারশিয়ান ও মারিনোয়ান হিমবাহে কিলোমিটার-পুরু বরফের চাদর কোটি কোটি বছর ধরে মহাদেশীয় গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট শিলাকে দানবাকৃতির জাঁতাকলের মতো পিষে মিহি পাথুরে ধূলিকণায় পরিণত করেছিল। বরফ যখন গলল, সেই বরফগলা পানির ঢল ট্রিলিয়ন টন খনিজ উপাদান সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে নিয়ে এলো।

২০১৭ সালে জোচেন ব্রকস দেখান যে এই ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার মাধ্যমে সাগরে এক বিশাল **ফসফরাস পালস** বা ফসফেটের বন্যা ঘটেছিল। ফসফেট হলো সামুদ্রিক জীবনের প্রধান পুষ্টি। ফসফেটের প্রাচুর্য পেয়ে আদিম সায়ানোব্যাকটেরিয়াকে হটিয়ে সমুদ্রের দখল নিল বড় বড় লিপিডসমৃদ্ধ সবুজ ইউক্যারিওটিক শৈবাল। এর ফলে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে আধুনিক মাত্রার ১০–২০ শতাংশে পৌঁছাল, যা প্রাণীদের শরীর ও কোলাজেন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ছিল।

এই সমৃদ্ধ সাগরেই প্রায় ৫৫.৫ কোটি বছর আগে আত্মপ্রকাশ করল এক অসাধারণ জীব: **কিম্বেরোলা** (Kimberella quadrata)।

স্থবির রেঞ্জিওমর্ফদের বিপরীতে কিম্বেরোলা ছিল একটি গতিশীল **দ্বিপার্শ্বীয় প্রাণী (Bilaterian)**—যার একটি নির্দিষ্ট অগ্রভাগ, পশ্চাৎভাগ, পিঠ ও পেট ছিল। তার পিঠে ছিল চামড়ার তৈরি শক্ত ঢাকনা, নিচে ছিল শামুকের মতো পেশিবহুল পা এবং সামনে ছিল দাঁতের মতো খাঁজযুক্ত একটি শুঁড়। পাথুরে জীবাশ্মে কিম্বেরোলার সামনে পাখার মতো চেঁছে খাওয়ার দাগ দেখা যায়, যাকে ভূতাত্ত্বিকরা বলেন *Radulichnus*। এটি প্রমাণ করে কিম্বেরোলাই ছিল ইতিহাসের প্রথম প্রাণী যে সচেতনভাবে সমুদ্রতলের জীবাণুস্তর চেঁছে খেত।

কিম্বেরোলাই হলো আধুনিক অধিকাংশ প্রাণীর আদি রূপ: তিনটি ভ্রূণস্তর (Triploblastic: এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম), একটি পেশিবহুল শরীর এবং সামনে একটি সুগঠিত মাথার সূচনা (Cephalization)। শান্ত ‘ইডিয়াকারান উদ্যান’ যেখানে সবাই কোনো সংঘর্ষ ছাড়া শুয়ে থাকত, তার দিন ফুরিয়ে আসছিল।

উপসংহার: মাটির বিপ্লব ও উদ্যানের পতন

প্রায় ৫৪.১ কোটি বছর আগে শান্ত ইডিয়াকারান জগৎ হঠাৎ করেই বিলীন হয়ে গেল ভূতাত্ত্বিকদের কথিত *কৃষি বিপ্লব* (Agronomic Revolution)-এর আঘাতে। দ্বিপার্শ্বীয় কৃমিজাতীয় প্রাণীরা সমুদ্রতলের পলির গভীরে লম্বালম্বি গর্ত খুঁড়তে শুরু করল (Bioturbation)।

মাটি খুঁড়ে খাওয়ার এই নতুন অভ্যাসের ফলে শত কোটি বছর ধরে সমুদ্রের তলদেশকে চাদরের মতো ঢেকে রাখা শক্ত মাইক্রোবিয়াল স্তরগুলো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এর ফলে যেসব শান্ত ইডিয়াকারান জীব মাটির ওপর স্থির হয়ে পুষ্টি শুষে বাঁচত, তারা বাসস্থান হারিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

তাদের স্থান দখল করল চোখ, চোয়াল ও সাঁতারের পাখনাযুক্ত আগ্রাসী দ্বিপার্শ্বীয় শিকারীরা। হক্স (Hox) জিনের জাদুকরী নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারা এমন এক বিবর্তনীয় বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছিল যা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীগোষ্ঠীর জন্ম দেবে। ৬ষ্ঠ পর্বে আমরা প্রবেশ করব সেই রুদ্ধশ্বাস ক্যামব্রিয়ান মহাবিস্ফোরণে।

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- King, N., et al. (2008). The genome of the choanoflagellate *Monosiga brevicollis* and the origin of metazoans. *Nature*, 451(7180), 783–788.
- Bobrovskiy, I., et al. (2018). Ancient steroids establish the Ediacaran fossil *Dickinsonia* as one of the earliest animals. *Science*, 361(6408), 1246–1249.
- Narbonne, G. M. (2005). The Ediacara biota: Neoproterozoic origin of animals and their ecosystems. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 33, 421–442.
- Brocks, J. J., et al. (2017). The rise of algae in Cryogenian oceans and the emergence of animals. *Nature*, 548(7669), 578–581.
- Fedonkin, M. A., & Waggoner, B. M. (1997). The Late Precambrian fossil *Kimberella* is a mollusc-like bilaterian organism. *Nature*, 388(6645), 868–871.

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বহুকোষী জীবনের সূচনা — কোষীয় সংলগ্নতা, মরফোজেনেসিস এবং ইডিয়াকারান উদ্যান"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ৫। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-5-the-dawn-of-multicellularity-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষষ্ঠ খণ্ড

ক্যামব্রিয়ান মহাবিস্ফোরণ — হক্স জিন, খোলসের জন্ম এবং শিকারী-শিকারের অস্ত্র প্রতিযোগিতা

ক্যামব্রিয়ান মহাবিস্ফোরণ — হক্স জিন, খোলসের জন্ম এবং শিকারী-শিকারের অস্ত্র প্রতিযোগিতা

1,255 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



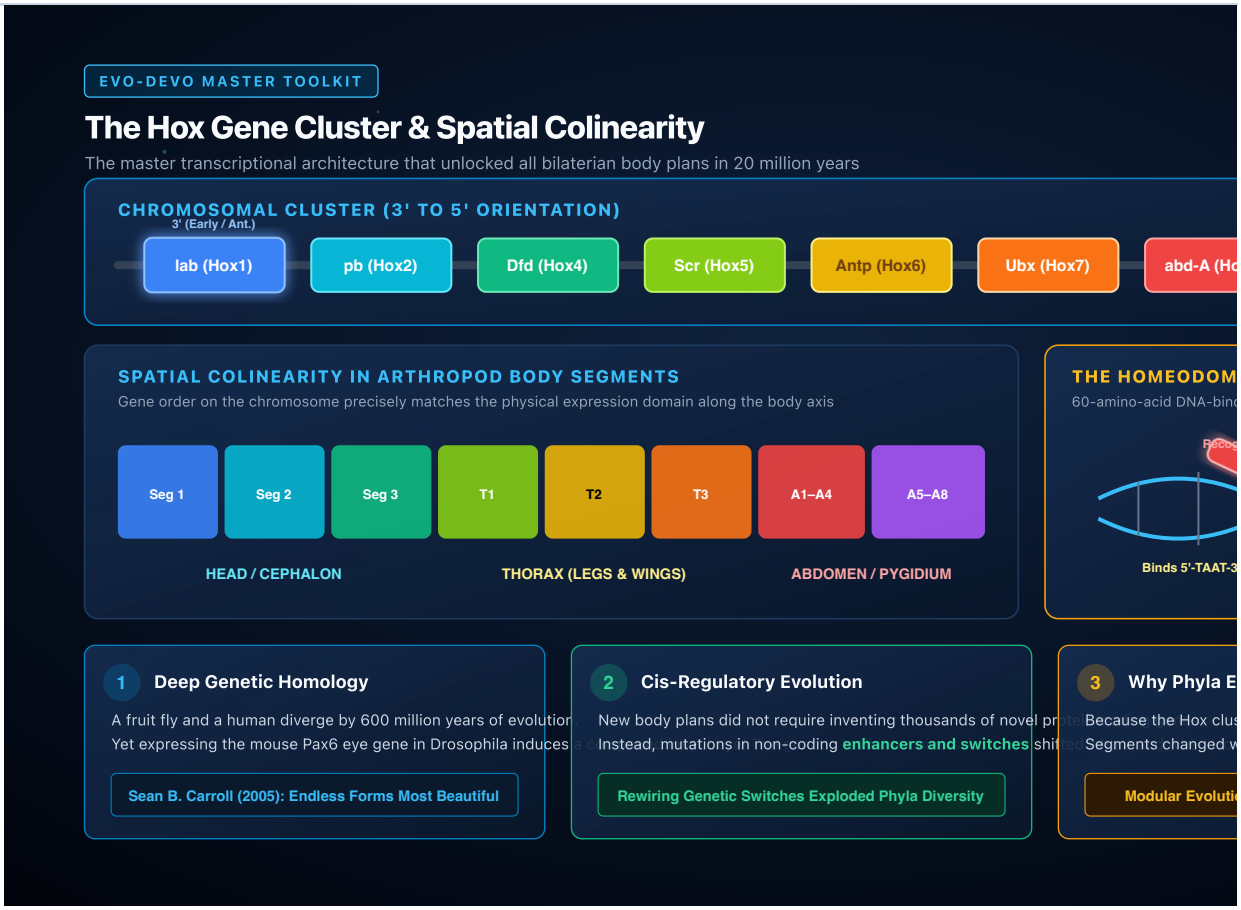
চিত্র ৬: *চিত্র: ৫০৮ মিলিয়ন বছর আগের ক্যামব্রিয়ান বার্গেস শেল সাগরে শীর্ষ শিকারী অ্যানোম্যালোকারিস (Anomalocaris canadensis), যা তরঙ্গায়িত ফ্ল্যাপের সাহায্যে সাঁতার কেটে স্পাইনি শিকারী উপাঙ্গ দিয়ে ট্রাইলোবাইট শিকার করছে।*

আজ থেকে প্রায় ৫৪.১ থেকে ৪৮.৫ কোটি বছর আগে, ফ্যানেরোজয়িক মহাযুগের সূচনায় পৃথিবীর জীবাশ্ম রেকর্ড এমন এক নাটকীয় ও তীব্র রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল যা চার্লস ডারউইনকেও সারাজীবন গভীর চিন্তায় ফেলে রেখেছিল। ভূতাত্ত্বিক সময়ের হিসাবে মাত্র দুই কোটি বছরের ব্যবধানে—যা পৃথিবীর ইতিহাসের এক পলক মাত্র—আজকের পরিচিত প্রায় প্রতিটি প্রধান প্রাণীগোষ্ঠী (পর্ব বা Phylum) দৃশ্যপটে হাজির হলো। সমুদ্রের পলিমাটি থেকে উঠে এলো পাথুরে চোখের বর্মধারী ট্রাইলোবাইট, দাঁতালো নখযুক্ত সন্ধিপদী, নটোকর্ডযুক্ত প্রাচীন কর্ডাটা এবং ইতিহাসের প্রথম পরাক্রমশালী মাংসাশী শিকারী—আনোমালোকারিস।

১. ইভো-ডেভোর মূল ইঞ্জিন: হক্স জিন এবং স্থানিক কোলিনিয়ারিটি

ডারউইনের পর বহু দশক ধরে বিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন: ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ কি আসলেই নতুন প্রাণের বিস্ফোরণ, নাকি কেবল প্রাণীদের শক্ত খোলস তৈরি হওয়ার ফলে সহজে জীবাশ্মে পরিণত হওয়ার ঘটনা? বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিবর্তনীয় ভ্রূণতত্ত্ব (Evo-Devo) এর আসল রহস্য উন্মোচন করে: ক্যামব্রিয়ান প্রাণীরা হাজার হাজার নতুন জিন আবিষ্কার করেনি; তারা ব্যবহার করেছিল অনেক আগে থেকেই তাদের দেহে ঘুমিয়ে থাকা এক অসাধারণ মাস্টার সুইচ—**হক্স (Hox) জিন ক্লাস্টার**।

হক্স জিনগুলো এমন কিছু মাস্টার প্রোটিন তৈরি করে যাদের মধ্যে ৬০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি অতি-সংরক্ষিত ডিএনএ-বাইন্ডিং অঞ্চল থাকে, যাকে বলা হয় *হোমিওডোমেন*। এই হোমিওডোমেনের একটি বিশেষ আলফা-হেলিক্স সরাসরি ডিএনএ-র খাঁজে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট কোড (\text{5′-TAAT-3′}) চিনে নেয় এবং শত শত অনুবর্তী জিনকে একসাথে অন বা অফ করতে পারে।



চিত্র ৬.১: জিনোমিক মাস্টার সুইচবোর্ড। হক্স জিন ক্লাস্টারের স্থানিক ও কালিক কোলিনিয়ারিটি। ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান (3′ \to 5’) হুবহু নির্দেশ করে ভ্রূণের কোন অংশে কোন অঙ্গ গঠিত হবে (মাথা → বুক → পেট)। চিত্রে: ডিএনএ-র খাঁজে ৬০-অ্যামিনো অ্যাসিডের হোমিওডোমেন আলফা-হেলিক্সের সংযুক্তি।

হক্স ক্লাস্টারের সবচেয়ে জাদুকরী নীতি হলো **স্থানিক ও কালিক কোলিনিয়ারিটি (Colinearity)**, যার জন্য এডওয়ার্ড বি. লুইস ১৯৯৫ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ক্রোমোজোমের ফিতায় হক্স জিনগুলো ঠিক যে ক্রমানুসারে সাজানো থাকে, ভ্রূণের শরীরেও তারা ঠিক সেই ক্রমানুসারে কাজ করে:

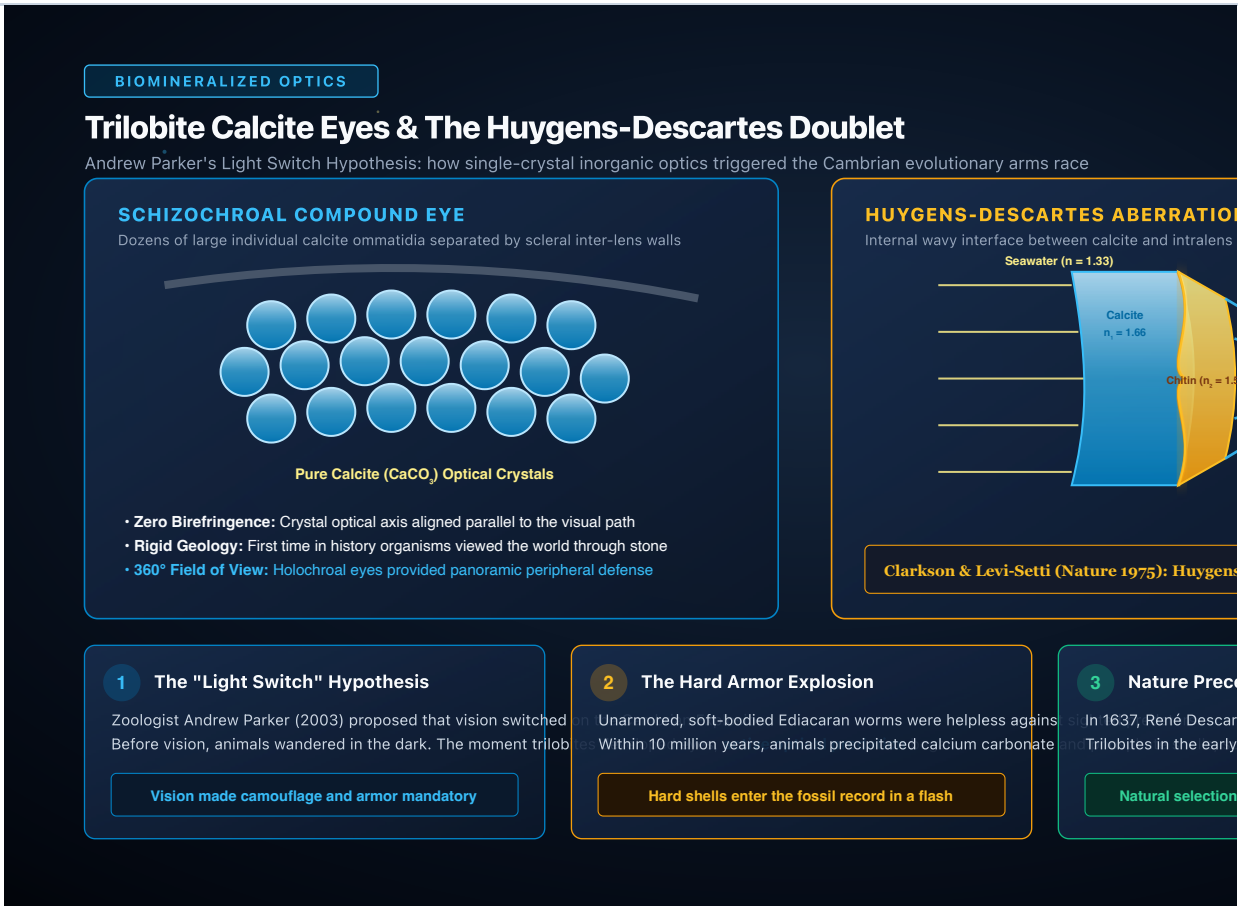
- ফিতার 3’\text{-প্রান্তে} থাকা জিনগুলো (যেমন *labial*) সবার আগে সক্রিয় হয় এবং প্রাণীর অগ্রভাগ বা মাথার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করে।
- মাঝের জিনগুলো (*Antennapedia, Ultrabithorax*) নির্দেশ করে বুকের খণ্ডগুলোকে, যেখান থেকে ডানা, পা বা সাঁতারের অঙ্গ বের হয়।
- আর 5’\text{-প্রান্তের} জিনগুলো (*Abdominal-B*) সবার শেষে চালু হয়ে লেজ ও পেটের শেষ প্রান্ত গঠন করে।

হক্স জিন প্রাণীর শরীরকে আলাদা আলাদা স্বাধীন বগিতে ভাগ করে দেওয়ায় এক যুগান্তকারী সুবিধা তৈরি হলো। কোনো একটি বগির অঙ্গ পরিবর্তনের মিউটেশন (যেমন সাধারণ হাঁটার পা চিমটি কাটার নখে রূপান্তর) ঘটলে পাশের মাথা বা পরিপাকতন্ত্রের কোনো ক্ষতি হতো না। এই মডুলারিটি প্রাণীদের দৈহিক আকারের বিপুল বৈচিত্র্য এনে দিল:

$$Y = aX^{b} \quad \Longrightarrow \quad \log Y = \log a + b \log X \quad \text{(অ্যালোমেট্রিক শারীরিক বিকাশ)}$$

প্রকৃতিকে কাঁকড়া, চিংড়ি বা প্রজাপতি বানানোর জন্য হাজার হাজার নতুন জিন আবিষ্কার করতে হয়নি; কেবল নন-কোডিং সুইচগুলোতে সামান্য রদবদল ঘটিয়ে প্রাচীন হক্স জিনের কাজের সময় ও স্থান পরিবর্তন করাই ছিল যথেষ্ট।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৬.২: খনিজ আলোকবিজ্ঞানের বিস্ময়। বামে: ফাকোপিড ট্রাইলোবাইটের যৌগিক চোখ যা শক্ত ক্যালসাইট ($CaCO_3$) স্ফটিক লেন্স দিয়ে গঠিত। ডানে: হয়গেনস-দেকার্ত ডাবলেট লেন্সের আলোকরশ্মি রেখাচিত্র। ওপরের ক্যালসাইট ($n_1 = ১.৬৬$) ও নিচের কাইটিনের ($n_2 = ১.৫৩$) তরঙ্গায়িত মিলনস্থল গোলীয় ত্রুটি দূর করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিশ্চিত করত।

২. লাইট সুইচ অনুকল্প: ট্রাইলোবাইটের পাথুরে লেন্স ও দৃষ্টির সূচনা

হক্স জিন যদি প্রাণীর শরীর তৈরির ইঞ্জিন হয়, তবে সেই ইঞ্জিনকে চালু করার পরিবেশগত চাবিকাঠি কোনটি ছিল? ২০০৩ সালে অক্সফোর্ডের প্রাণিবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু পার্কার প্রস্তাব করেন **লাইট সুইচ অনুকল্প** (The Light Switch Hypothesis): তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিশক্তির উদ্ভাবনই ক্যামব্রিয়ান মহাবিস্ফোরণের মূল আগুন জ্বালিয়েছিল।

ক্যামব্রিয়ানের আগে পৃথিবী ছিল দৃষ্টিহীন। প্রাণীদের কেবল আলোর উপস্থিতি বোঝার মতো কিছু পিগমেন্ট স্পট ছিল। কিন্তু প্রায় ৫৩ কোটি বছর আগে **ট্রাইলোবাইট** উদ্ভাবন করল ইতিহাসের প্রথম যৌগিক চোখ।

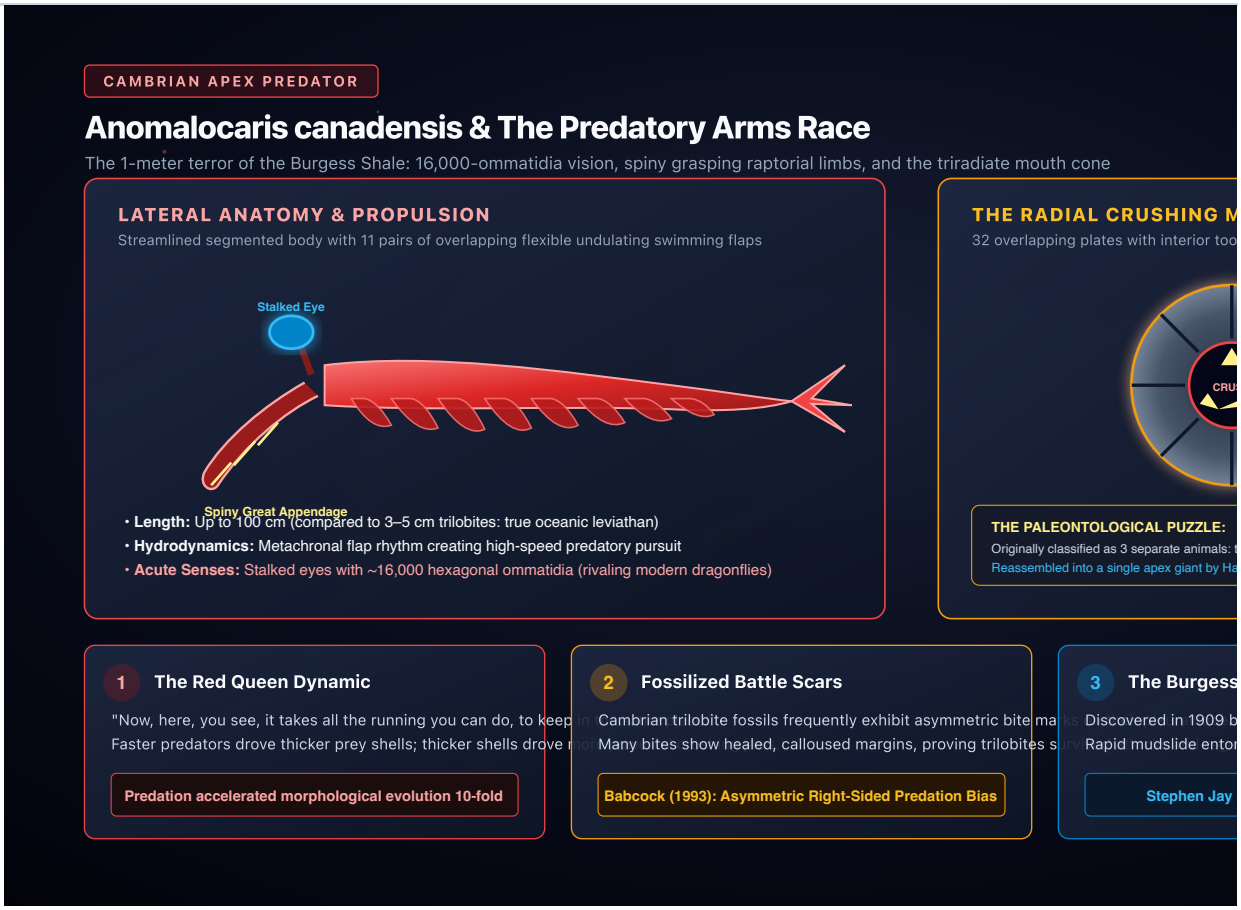
প্রোটিনের লেন্স পানির নিচে সহজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকায় ট্রাইলোবাইট এক অবিশ্বাস্য কাজ করল: তাদের চোখের প্রতিটি ক্ষুদ্র লেন্স তৈরি হলো খাঁটি অজৈব খনিজ **ক্যালসাইট স্ফটিক ($CaCO_3$)** দিয়ে। ক্যালসাইট পাথরের একটি মারাত্মক অপটিক্যাল ত্রুটি আছে: এর ভেতর দিয়ে আলো ঢুকলে রশ্মি দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব (Birefringence) তৈরি করে। ট্রাইলোবাইট এই ত্রুটি দূর করল নিখুঁত ক্রিস্টালোগ্রাফির সাহায্যে: প্রতিটি লেন্সের অপটিক্যাল অক্ষ এমনভাবে সাজানো হলো যা আলোর সমান্তরালে অবস্থান করে, ফলে কোনো ডাবল ইমেজ তৈরি হতো না!

অধিকন্তু, বাঁকা লেন্সের প্রান্ত দিয়ে আসা আলোকরশ্মি মাঝের রশ্মির চেয়ে আগে ফোকাস হওয়ায় ছবি ঝাপসা হয়ে যেত (Spherical Aberration)। ১৯৭৫ সালে ক্লার্কসন ও লেভি-সেটি *নেচার* সাময়িকীতে প্রমাণ করেন যে ট্রাইলোবাইট এই সমস্যা সমাধান করেছিল একটি **কার্টেসিয়ান ডাবলেট লেন্স** দিয়ে।

ওপরের লেন্সটি ছিল ক্যালসাইটের ($n_1 = ১.৬৬$) এবং ঠিক তার নিচেই ছিল ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত কাইটিনের একটি স্তর ($n_2 = ১.৫৩$)। এই দুই স্তরের মিলনরেখাটি ছিল একটি বিশেষ তরঙ্গায়িত বক্ররেখা, যা সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী রেনে দেকার্ত ও ক্রিস্টিয়ান হয়গেনসের গণিতের সূত্রের সাথে হুবহু মিলে যায়:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad \text{(প্রতিসরণ সূত্র)}$$

মানুষ ক্যালকুলাস আবিষ্কারের ৫০ কোটি বছর আগেই ট্রাইলোবাইট সেই গাণিতিক লেন্স দিয়ে সমুদ্রের তলদেশে ৩৬০ ডিগ্রি প্যানোরামিক ভিশনে শিকার ও শত্রু পর্যবেক্ষণ করছিল! দৃষ্টিশক্তি চালু হওয়ার সাথে সাথেই শান্ত সমুদ্র একটি নির্মম শিকার ক্ষেত্রে পরিণত হলো।



চিত্র ৬.৩: বার্জেস শেলের দানবীয় শিকারী। *আনোমালোকারিস ক্যানাডেনসিস*—১ মিটার দীর্ঘ এক আদিম সন্ধিপদী। বৃন্তযুক্ত চোখ (১৬,০০০ ওমাটিডিয়া), ঢেউ খেলানো সাঁতারের ডানা এবং সামনে দুটি কাঁটাযুক্ত শক্ত আঁকশি যা শিকারকে টেনে নিয়ে যেত তার বৃত্তাকার ৩২-প্লেটের চূর্ণকারী মুখের ভেতর।

৩. শীর্ষ শিকারী এবং বর্মের মহাযুদ্ধ

চোখের আবির্ভাবের সাথে সাথেই শুরু হলো বিবর্তনের প্রথম **রেড কুইন অস্ত্র প্রতিযোগিতা**। ক্যামব্রিয়ান সাগরের সবচেয়ে ভয়ংকর ত্রাস ছিল **আনোমালোকারিস** (Anomalocaris canadensis), যার সম্পূর্ণ জীবাশ্ম কানাডার রকি পর্বতমালার বার্জেস শেলে নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

যে যুগে অধিকাংশ প্রাণীর আকার ছিল মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার, সে যুগে আনোমালোকারিস ছিল প্রায় **এক মিটার দীর্ঘ** এক সুবিশাল দানব। তার চ্যাপ্টা শরীরের দুপাশে ছিল ১১ জোড়া নমনীয় ডানা, যার ছন্দময় তরঙ্গে সে তীব্র গতিতে পানিতে সাঁতার কাটতে পারত। তার মাথায় ছিল ১৬,০০০ লেন্সযুক্ত দুটি বড় যৌগিক চোখ, যা আজকের ক্ষিপ্র ফড়িংয়ের দৃষ্টির সমকক্ষ।

শিকার ধরার জন্য তার মুখের সামনে ছিল কাঁটাযুক্ত দুটি বাঁকানো নখ বা আঁকশি। এই আঁকশি দিয়ে সে ট্রাইলোবাইটকে ধরে নিজের বৃত্তাকার মুখের ভেতর পুরে দিত। তার মুখটি ছিল **৩২টি খাঁজকাটা প্লেট** দিয়ে তৈরি এক ভয়াবহ পেষণযন্ত্র, যার ভেতরের দাঁতগুলো ট্রাইলোবাইটের ক্যালসাইট খোলস ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো প্রবল যান্ত্রিক চাপ তৈরি করতে পারত।

এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও পাথরে টিকে আছে। জীবাশ্মবিদ লরেন ব্যাবকক (১৯৯৩) দেখান যে ক্যামব্রিয়ান ট্রাইলোবাইটের খোলসে প্রায়শই আনোমালোকারিসের কামড়ের স্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন মেলে। অনেক ট্রাইলোবাইটের খোলসে দেখা যায় কামড় খাওয়ার পরও ক্ষত নিরাময় করে তারা নতুন বর্ম তৈরি করে বেঁচে গিয়েছিল।

এই প্রাণঘাতী শিকারী চাপের মুখেই বিস্ফোরিত হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন:

1. **ক্যালসিফাইড বর্ম:** নরম শরীরের প্রাণীরা বর্ম ছাড়া ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল। ফলে মলাস্ক তৈরি করল শক্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেট শেল, ব্র্যাকিওপড বানাল কপাটিকা এবং সন্ধিপদীরা তৈরি করল কাইটিনের শক্ত বহিরাবরণ।
2. **দ্রুত গতি:** ধীরগতির প্রাণীদের হটিয়ে দখল নিল দ্রুত সাঁতারু ও মাটির গভীরে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকা প্রাণীরা।
3. **সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়:** শত্রু আসার মৃদু পানির কম্পন বুঝতে উদ্ভাবিত হলো অ্যান্টেনা ও ভারসাম্য রক্ষাকারী স্ট্যাটোসিস্ট।

উপসংহার: আধুনিক জীবজগতের ভিত্তিপ্রস্তর

প্রায় ৪৮.৫ কোটি বছর আগে ক্যামব্রিয়ান যুগ যখন শেষ হলো, তখন আজকের প্রাণীজগতের প্রায় প্রতিটি মূল পর্ব—আর্থ্রোপোডা, মলাস্কা, অ্যানেলিডা, একাইনোডার্মাটা এবং কর্ডাটা—নিজের নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছে।

তবে আনোমালোকারিসের সুবিশাল ডানার ছায়ায় সমুদ্রের তলদেশে নিঃশব্দে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল মাত্র পাঁচ সেন্টিমিটারের একটি নরম, স্বচ্ছ ও খোলসহীন প্রাণী: *পিকাইয়া* (Pikaia gracilens)। এই নিরীহ প্রাণীটির পিঠের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল একটি শক্ত নমনীয় রড—নটোকর্ড। ৭ম পর্বে আমরা অনুসরণ করব এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে এবং দেখব কর্ডাটার সূর্যোদয়: খুলি, মস্তিষ্ক এবং মানব মেরুদণ্ডের প্রথম সূচনা।

Shakil Mahmud • Research Monograph

প্রধান একাডেমিক তথ্যসূত্র

- Gould, S. J. (1989). *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton & Company.
- Parker, A. (2003). *In the Blink of an Eye: How Vision Sparked the Big Bang of Evolution*. Basic Books.
- Clarkson, E. N. K., & Levi-Setti, R. (1975). Trilobite eyes and the optics of Descartes and Huygens. *Nature*, 254(5502), 663–667.
- Whittington, H. B., & Briggs, D. E. (1985). The largest Cambrian animal, *Anomalocaris*, Burgess Shale, British Columbia. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 309(1141), 569–609.
- Lewis, E. B. (1978). A gene complex controlling segmentation in Drosophila. *Nature*, 276(5688), 565–570.
- Carroll, S. B. (2005). *Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo*. W. W. Norton & Company.

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ক্যামব্রিয়ান মহাবিস্ফোরণ — হক্স জিন, খোলসের জন্ম এবং শিকারী-শিকারের অস্ত্র প্রতিযোগিতা"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ৬। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-6-the-cambrian-explosion-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তম খণ্ড

কর্ডাটার সূর্যোদয় — মেরুদণ্ড, নটোকর্ড এবং মস্তিষ্কের ক্র্যানিয়াল বিবর্তন

কর্ডাটার সূর্যোদয় — মেরুদণ্ড, নটোকর্ড এবং মস্তিষ্কের ক্র্যানিয়াল বিবর্তন

1,102 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৭: *চিত্র: মেরুদণ্ডীদের আদিম সূচনা: ক্যামব্রিয়ান কর্ডেট হাইকোইকথিস (Haikouichthys ercaicunensis) এবং পিকাইয়া, যা নমনীয় ডরসাল নটোকর্ড, ভি-আকৃতির মায়োমিয়ার এবং আদিম চোখ নিয়ে সমুদ্রতলে সাঁতার কাটছে।*

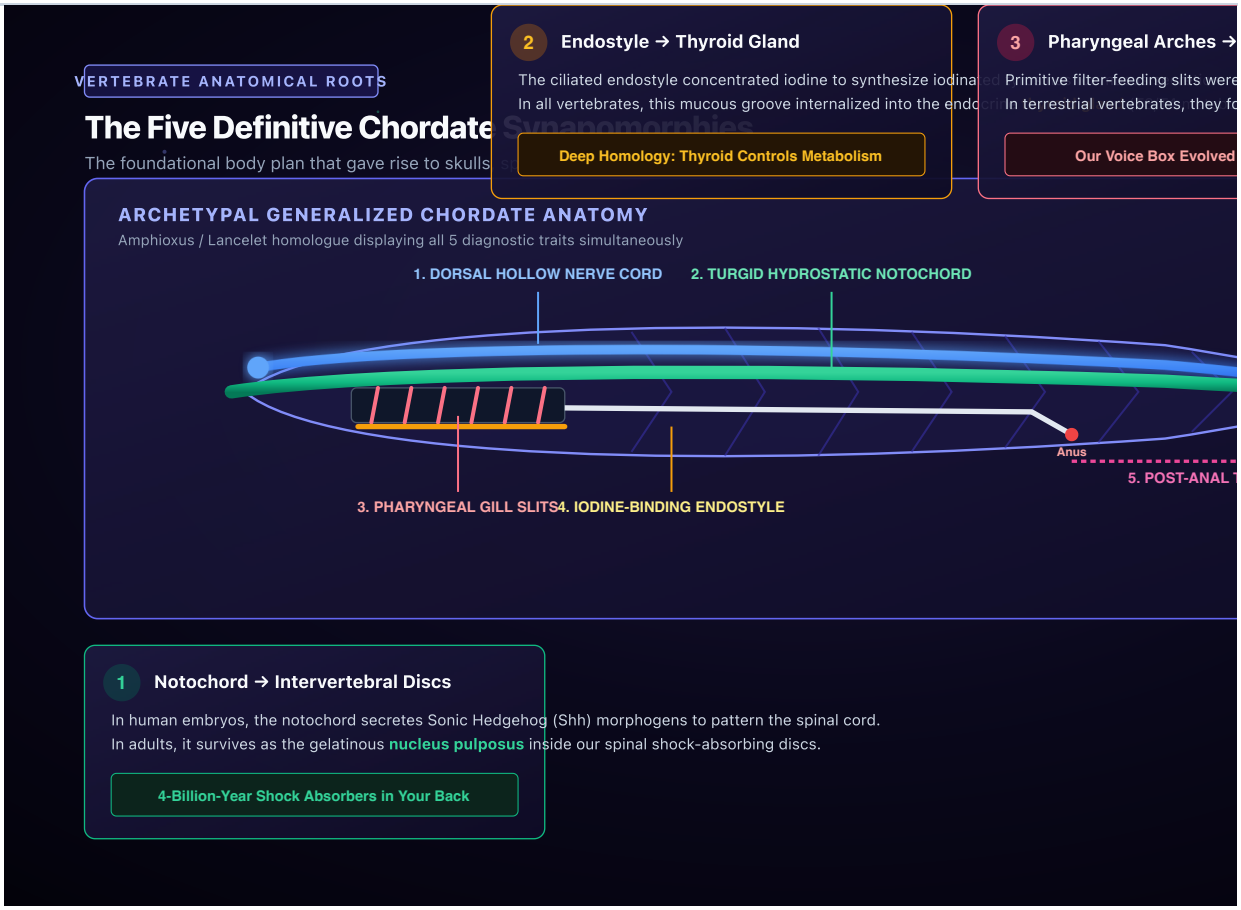
আজ থেকে ৫২৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে, ক্যামব্রিয়ান সমুদ্রের গভীর তলদেশে একটি ক্ষুদ্র, কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা জলজ জীব জীবন ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক শারীরিক অভিযানের সূচনা করেছিল। এমন এক সমুদ্রে যেখানে শক্ত খোলসযুক্ত ট্রাইলোবাইট এবং বিশাল শিকারী প্রিআপুলিড কৃমিদের একচ্ছত্র আধিপত্য, সেখানে এই নিরীহ জীবটির কোনো বহিঃকঙ্কাল বা চিবানোর মতো চোয়াল কিছুই ছিল না। কিন্তু তার দেহের ভেতরে সুসংগঠিত ছিল এক স্থিতিস্থাপক, তরলপূর্ণ কোষের চাপযুক্ত নমনীয় দণ্ড—নটোকর্ড। পরবর্তীতে এই নটোকর্ডই রূপান্তরিত হয়েছে মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মেরুদণ্ডে। এটি ফাইলাম কর্ডাটা এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক ও মাথার খুলির জন্মরহস্যের এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান।

১. কর্ডাটার পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য (Synapomorphies)

মানবজাতির আদি উৎস বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীদের ডিউটেরোস্টোম (Deuterostome) শাখায় ফিরে যেতে হবে। প্রোটোস্টোমদের (যেমন আর্থ্রোপড, অ্যানিলিডা এবং মোলাস্কা) ভ্রূণীয় বিকাশের প্রাথমিক ছিদ্র বা ব্লাস্টোপোর থেকে মুখের উৎপত্তি হয় এবং তাদের প্রধান স্নায়ুরজ্জু পেটের দিক দিয়ে (ভেন্ট্রাল) বিস্তৃত থাকে। বিপরীতে, ডিউটেরোস্টোমদের (কর্ডাটা, হেমিকর্ডাটা এবং একাইনোডার্মাটা) ক্ষেত্রে ব্লাস্টোপোরটি পায়ুছিদ্রে রূপান্তরিত হয়, মুখ তৈরি হয় দ্বিতীয় ধাপে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র পিঠের দিক দিয়ে (ডরসাল) প্রসারিত হয়।

সমুদ্রের ক্ষুদ্র অ্যাম্ফিঅক্সাস থেকে শুরু করে আধুনিক *Homo sapiens*—কর্ডাটা পর্বের প্রতিটি সদস্য তাদের ভ্রূণীয় বিকাশের কোনো না কোনো পর্যায়ে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়:

Shakil Mahmud • Research Monograph



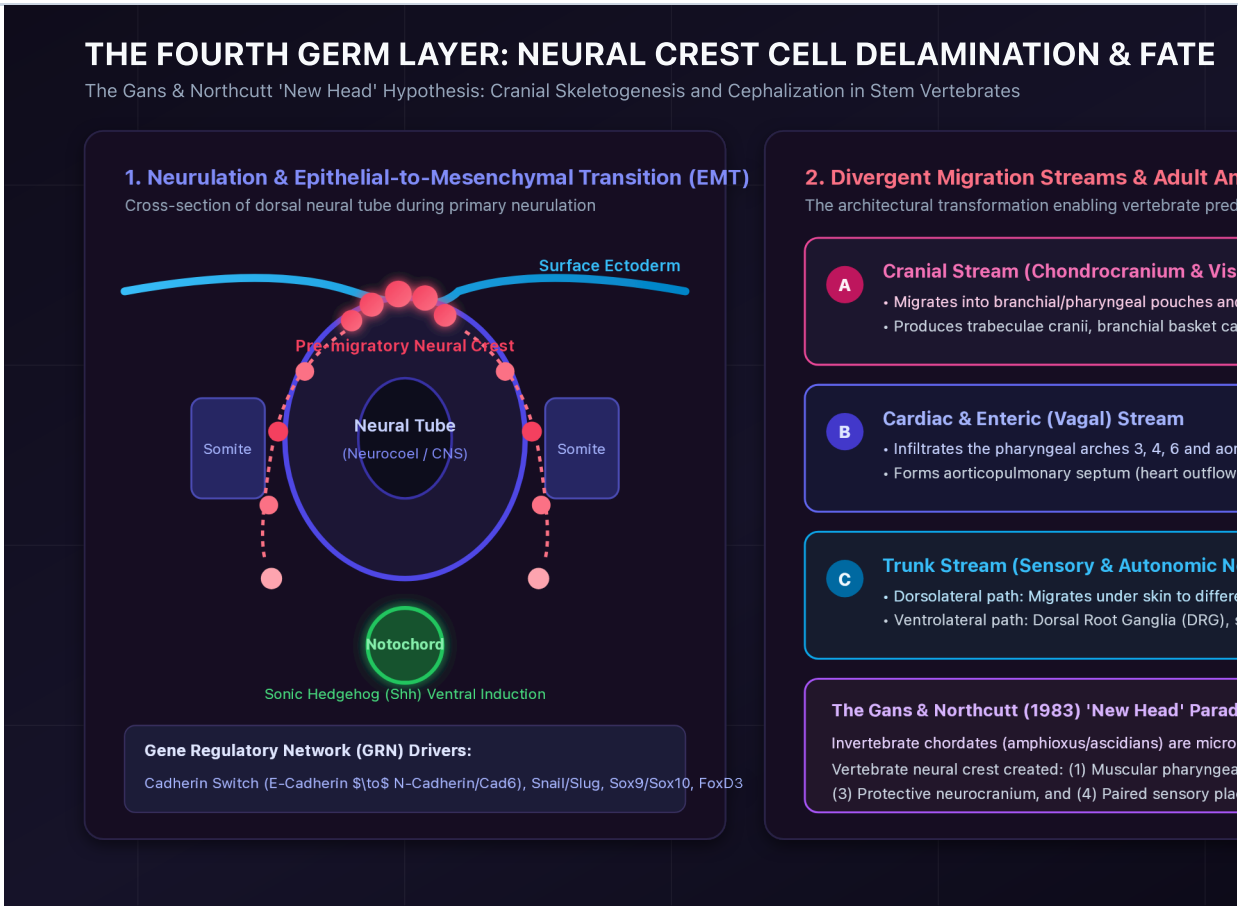
চিত্র ৭.১: কর্ডাটার আদি শারীরিক মানচিত্র। অনুদৈর্ঘ্য ব্যবচ্ছেদে প্রদর্শিত পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য: (১) ফাঁপা পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু, (২) হাইড্রোস্ট্যাটিক নটোকর্ড, (৩) গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র, (৪) আয়োডিন সঞ্চয়কারী এন্ডোস্টাইল (থাইরয়েডের পূর্বসূরি), এবং (৫) সুগঠিত ভি-আকৃতির পেশীযুক্ত পায়ু-পরবর্তী লেজ।

- **নটোকর্ড (Notochord):** শক্ত কোলাজেনাস আবরণে মোড়ানো তরলপূর্ণ গ্লাইকোপ্রোটিন কোষের নমনীয় অক্ষীয় দণ্ড। এটি পেশীর সংকোচনে শরীরকে বেঁকে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং তরঙ্গের মতো আন্দোলনকে সম্মুখ গতির ধাক্কায় রূপান্তরিত করে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মেরুদণ্ডের কশেরুকার মাঝের কুশন বা *nucleus pulposus* হলো এই আদিম নটোকর্ডেরই সংরক্ষিত অবশিষ্টাংশ।
- **ফাঁপা পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু (Dorsal Hollow Nerve Cord):** ভ্রূণের একটোডার্মের ভাঁজ হয়ে নলাকার রূপ নেওয়ার মাধ্যমে এটি গঠিত হয়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্নায়ুরজ্জু নিরেট এবং পেটের দিকে অবস্থান করলেও কর্ডাটার স্নায়ুরজ্জু ফাঁপা ও পিঠের দিকে অবস্থিত। এর অগ্রভাগ স্ফীত হয়ে পরবর্তীতে তিন খণ্ডের মস্তিষ্ক তৈরি করে।
- **গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র (Pharyngeal Slits):** গলবিলের দুই পাশের ছিদ্র বা খাঁজ। আদিতে জল ছেঁকে আণুবীক্ষণিক খাদ্য গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হলেও, মাছের ক্ষেত্রে এটি ফুলকায় এবং ডাঙ্গার মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে ইউস্টেশিয়ান টিউব, মধ্যকর্ণের গহ্বর এবং প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিতে বিবর্তিত হয়েছে।
- **এন্ডোস্টাইল (Endostyle):** গলবিলের নিচের তলের সিলিয়াযুক্ত খাঁজ, যা শ্লেষ্মা নিঃসরণ করে খাদ্য কণা আটকে রাখতে সাহায্য করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এর কোষগুলো পরিবেশ থেকে আয়োডিন শোষণ করে হরমোন সংশ্লেষ করতে পারে—যা সরাসরি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের থাইরয়েড গ্রন্থির সমগোত্রীয় রূপ।
- **পায়ু-পরবর্তী লেজ (Post-Anal Tail):** পাচনতন্ত্রের শেষ প্রান্ত (পায়ু)-এর পেছনে প্রসারিত পেশীবহুল লেজ। ভি-আকৃতির পেশীখণ্ডের (মায়োমের) সমন্বয়ে এটি সাঁতার কাটার শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

২. নিউরাল ক্রেস্ট কোষ: চতুর্থ ভ্রূণস্তর এবং ‘নতুন মাথার’ বিপ্লব

যদিও আদিম অ্যাম্ফিঅক্সাসের মতো জীবে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত ছিল, তবুও তারা ছিল অন্ধ, খুলিহীন এবং অলস খাদ্য-ছেঁকে-খাওয়া প্রাণী। কীভাবে এই ক্ষুদ্র কাদায় বাস করা জীব থেকে জন্ম নিল শিকারী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী?

১৯৮৩ সালে কার্ল গ্যানস এবং আর. গ্লেন নর্থকাট তাদের বিখ্যাত **“New Head” Hypothesis** উপস্থাপন করেন। তারা প্রমাণ করেন যে, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই রূপান্তরের পেছনে কাজ করেছে ভ্রূণের এক বিশেষ কোষপুঞ্জ, যাকে আজ জীববিজ্ঞানে *চতুর্থ ভ্রূণস্তর* (The Fourth Germ Layer) হিসেবে গণ্য করা হয়: **নিউরাল ক্রেস্ট কোষ (Neural Crest Cells)**।



চিত্র ৭.২: চতুর্থ ভ্রূণস্তর। বামে: নিউরুলেশন এবং কোষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে (EMT) নিউরাল টিউব থেকে নিউরাল ক্রেস্ট কোষের যাত্রা। ডানে: তিনটি প্রধান অভিবাসন শাখা (ক্র্যানিয়াল, কার্ডিয়াক এবং ট্রাঙ্ক) যা মাথার খুলি, সংবেদী চোখ-কানের আবরণী, সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্র এবং ত্বকের মেলানোসাইট গঠন করে।

ভ্রূণবিকাশের সময় যখন একটোডার্ম ভাঁজ হয়ে নিউরাল টিউব তৈরি করে, তখন সেই সংযোগস্থলের কোষগুলো এক জাদুকরী রূপান্তর ঘটায় যাকে বলা হয় **Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT)**। বিভিন্ন জিন নেটওয়ার্কের নির্দেশে (যেমন *Snail*, *Sox9*, *FoxD3*) এই কোষগুলো নিজেদের বাঁধন আলগা করে সারা ভ্রূণজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে:

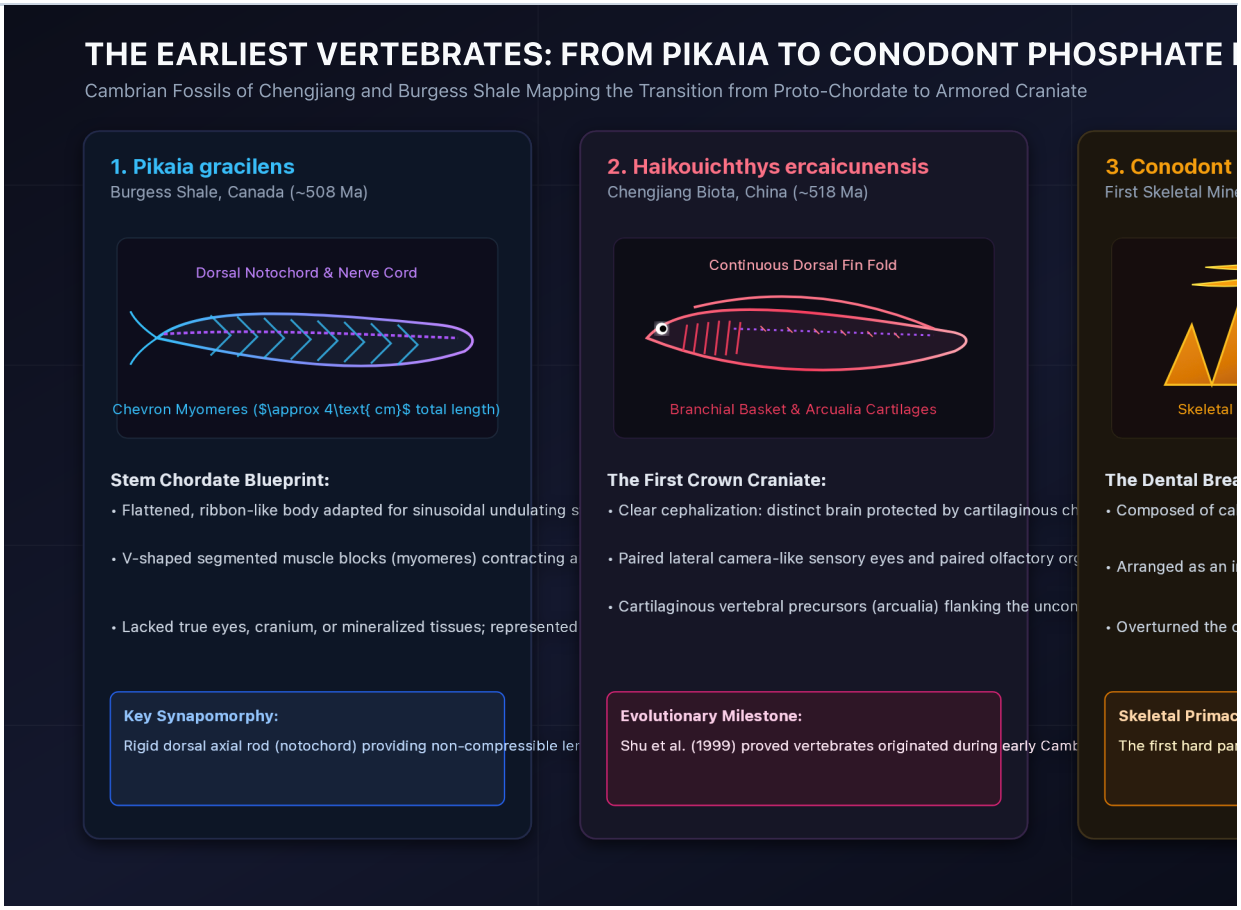
1. **ক্র্যানিয়াল নিউরাল ক্রেস্ট (Cranial Stream):** মাথার অগ্রভাগে এবং ফুলকার খিলানে চলে যায়। সাধারণ একটোডার্মের বাইরে গিয়ে এরা কঙ্কাল তৈরির ক্ষমতা অর্জন করে—যা মাথার খুলি (Chondrocranium), চোয়ালের আদি তরুণাস্থি এবং দাঁতের ডেন্টিন প্রস্তুতকারী ওডন্টোব্লাস্টে পরিণত হয়।
2. **কার্ডিয়াক ও ভেগাল নিউরাল ক্রেস্ট (Cardiac Stream):** হৃদপিণ্ডের বহির্গমন নালী গঠন করে মহাধমনী এবং ফুসফুসীয় ধমনীকে পৃথক করে। এছাড়া অন্ত্রের ভেতরের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Enteric Nervous System) তৈরি করে।
3. **ট্রাঙ্ক নিউরাল ক্রেস্ট (Trunk Stream):** দেহের মূল কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে মেরুদণ্ডের সংবেদী গ্যাংলিয়া (DRG), অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্র, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি এবং ত্বকের রঞ্জক কোষ (মেলানোসাইট) সৃষ্টি করে।

নিউরাল ক্রেস্ট কোষ না থাকলে মেরুদণ্ডী প্রাণীরা কখনো প্রতিরক্ষামূলক মাথার খুলি পেত না, উন্নত ত্রিমাত্রিক দৃষ্টির চোখ এবং পেশীবহুল গলবিলীয় শ্বাসযন্ত্র তৈরি হতো না।

৩. জীবাশ্মের প্রমাণ: পাইকাইয়া, হাইকোইকথিস এবং অ্যাগনাথা

অমেরুদণ্ডী কর্ডাটা থেকে আদি মেরুদণ্ডীতে উত্তরণের এই অবিশ্বাস্য ইতিহাস খোদাই করা আছে দুটি বিশ্ববিখ্যাত ক্যামব্রিয়ান জীবাশ্মের ভাণ্ডারে: কানাডার ৫০৮ মিলিয়ন বছরের পুরনো বার্জেস শেল এবং চীনের ৫১৮ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন চেংজিয়াং স্তর।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৭.৩: মেরুদণ্ডী বংশলতিকার গভীরে। (১) পাইকাইয়া গ্র্যাসিলেন্স: আদিম জিগজ্যাগ মায়োমের ও অক্ষীয় নটোকর্ডযুক্ত জীব; (২) হাইকোইকথিস: সুস্পষ্ট চোখ, তরুণাস্থির মাথার খুলি এবং প্রোটো-কশেরুকা (আর্কুয়ালিয়া) সমৃদ্ধ প্রথম ক্র্যানিয়েট; (৩) কনডন্ট উপাদান: হাইড্রোক্সিঅ্যাপাটাইট সমৃদ্ধ প্রথম খনিজীয় দাঁতের অস্ত্র।

পাইকাইয়া গ্র্যাসিলেন্স (Pikaia gracilens)

কানাডার বার্জেস শেলে আবিষ্কৃত ৪ সেন্টিমিটার লম্বা ফিতার মতো এই প্রাণীটির ছিল একটি দৃশ্যমান নটোকর্ড এবং প্রায় ১০০ জোড়া ভি-আকৃতির মায়োমের পেশীখণ্ড। এদের স্পষ্ট চোখ বা চোয়াল ছিল না, যা নির্দেশ করে এরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সবচেয়ে আদিম স্টেম-কর্ডাটা স্তরের প্রতিনিধিত্ব করছিল।

হাইকোইকথিস এরকাইকুয়েনসিস (Haikouichthys ercaicunensis)

চীনের চেংজিয়াং বায়োটায় ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক শু ডেগান কর্তৃক আবিষ্কৃত *Haikouichthys* আমাদের বংশলতিকার ইতিহাসকে এক ধাক্কায় ৫১৮ মিলিয়ন বছর অতীতে নিয়ে যায়। এটি নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রাচীনতম প্রকৃত ক্র্যানিয়েট বা মেরুদণ্ডী পূর্বসূরি:

- এর স্পষ্ট তরুণাস্থিময় মাথার খুলি এবং অগ্রমস্তিষ্ক ছিল।
- উভয় পাশে একজোড়া জটিল চোখ এবং সংবেদী কান-নাকের ক্যাপসুল দৃশ্যমান ছিল।
- গলবিলে ৬ থেকে ৯ জোড়া ফুলকা ছিদ্র ছিল।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এর নটোকর্ডের পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুণাস্থির খণ্ড ছিল—যাকে বলা হয় **আর্কুয়ালিয়া (arcualia)**, যা আমাদের মেরুদণ্ডের কশেরুকার আদি পূর্বসূরি।

৪. কনডন্ট রহস্য: কঙ্কালের পূর্বে দাঁতের বিবর্তন

বহু দশক ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মেরুদণ্ডীদের শক্ত কঙ্কাল হয়তো প্রথমে বাইরের বর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল—বিশাল জলজ বিছার (Eurypterids) আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আদি চোয়ালহীন মাছদের (Ostracoderms) শরীরে শক্ত হাড়ের প্লেট তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাশ্ম **কনডন্ট (Conodonts)** এই তত্ত্বকে চিরতরে বদলে দেয়। ১৮৫৬ সাল থেকে সারা বিশ্বের চুনাপাথরে কয়েক মিলিমিটার আকারের এই চিরুনির মতো খাঁজকাটা জীবাশ্ম পাওয়া যেত, কিন্তু প্রাণীটি দেখতে কেমন ছিল তা ১৩০ বছর ধরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

১৯৮৩ সালে স্কটল্যান্ডে সম্পূর্ণ কনডন্ট প্রাণীর নরম দেহের ছাপ আবিষ্কৃত হয়। দেখা যায় এটি ছিল একটি ক্ষুদ্র ইল মাছের মতো কর্ডাটা, যার গলার ভেতরে ছিল জটিল এক দাঁতের অস্ত্রাগার—শিকার ধরার জন্য ধারালো কাঁটা (S এবং M উপাদান) এবং মাংস চিবানোর জন্য চিরুনির মতো প্লেট (P উপাদান)।

রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায়, কনডন্ট দাঁতগুলো নিখুঁত **ক্যালসিয়াম ফসফেট বা হাইড্রোক্সিঅ্যাপাটাইট** দিয়ে তৈরি:

$$Ca_5(PO_4)_3(OH)$$

যা মানুষের দাঁতের এনামেলের উপাদানের সাথে হুবহু এক!

এর অর্থ জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে গভীর এক সত্যকে উন্মোচন করে: **মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রথম শক্ত কঙ্কাল আত্মরক্ষার বর্ম হিসেবে আসেনি, বরং এসেছিল শিকারকে কামড়ে ধরার ধারালো দাঁত হিসেবে!** নটোকর্ডের দৃঢ়তা, নিউরাল ক্রেস্ট কোষের মস্তিষ্ক এবং ফসফেটের ধারালো দাঁত নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রস্তুত হয়েছিল সমুদ্র বিজয়ের পরবর্তী রোমাঞ্চকর ধাপ—চোয়ালের আবিষ্কারের জন্য।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কর্ডাটার সূর্যোদয় — মেরুদণ্ড, নটোকর্ড এবং মস্তিষ্কের ক্র্যানিয়াল বিবর্তন"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ৭। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-7-the-chordate-dawn-bn/

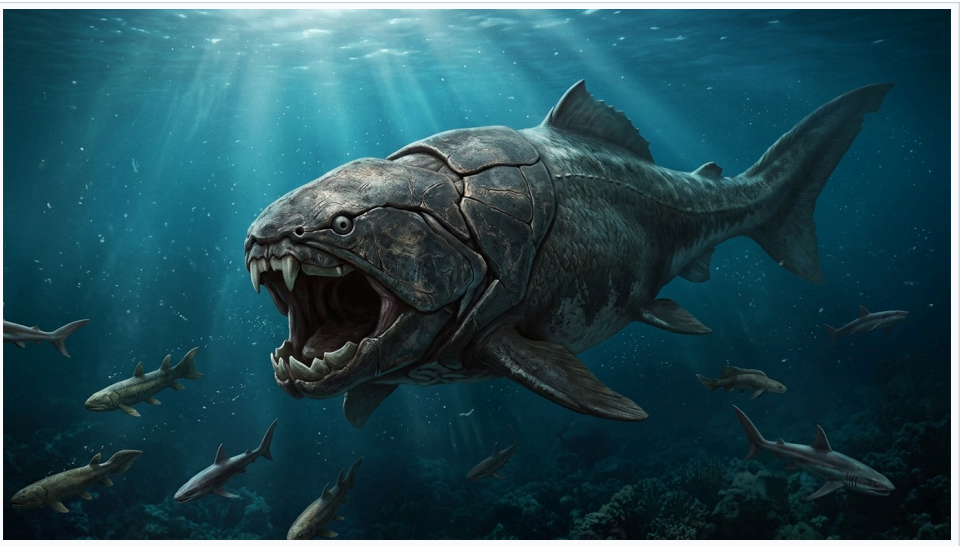
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টম খণ্ড

গভীর জলের জয়যাত্রা — চোয়ালের উদ্ভাবন এবং আর্মার্ড প্লাকোডার্মের যুগ

গভীর জলের জয়যাত্রা — চোয়ালের উদ্ভাবন এবং আর্মার্ড প্লাকোডার্মের যুগ

1,317 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



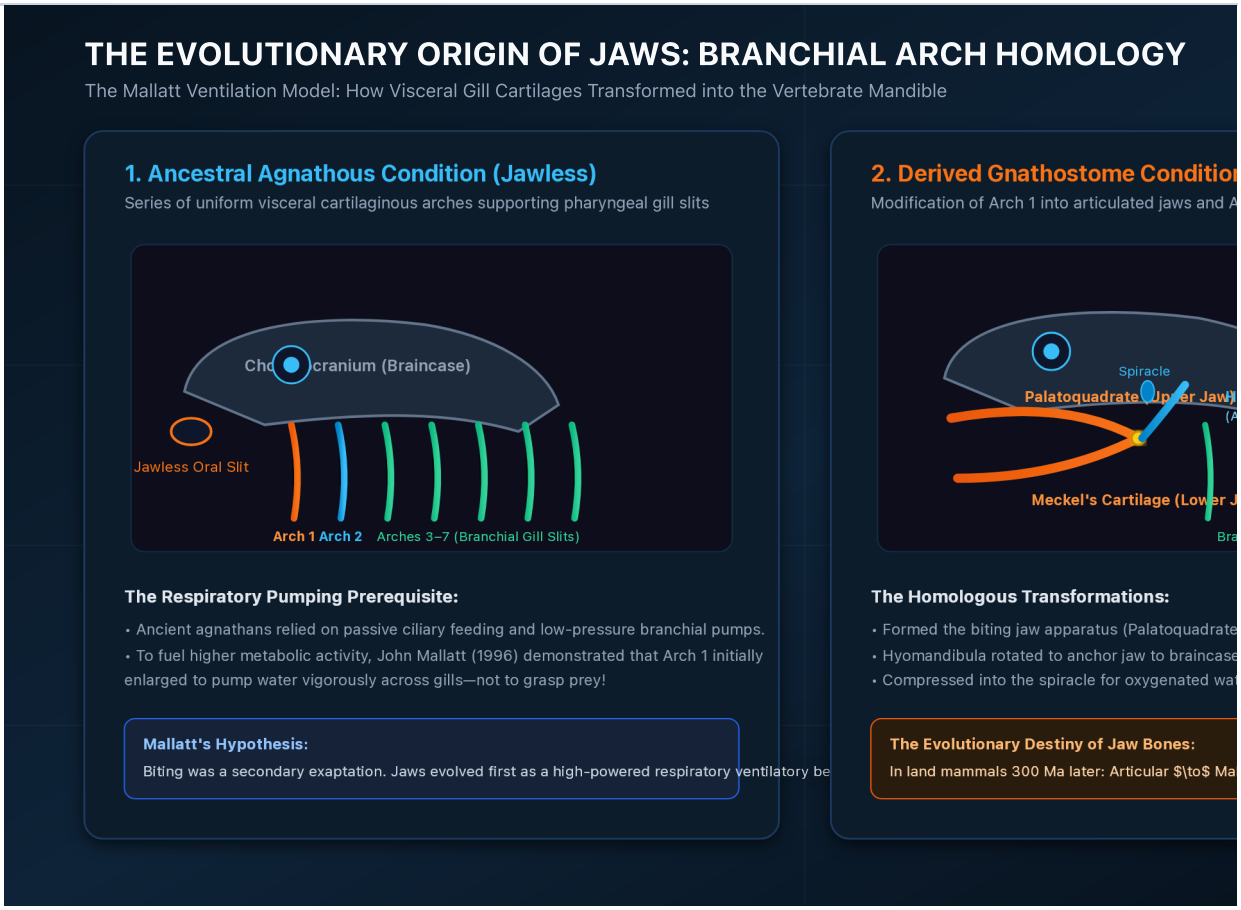
চিত্র ৮: *চিত্র: ডেভোনিয়ান যুগের শীর্ষ শিকারী প্লাকোডার্ম ডাঙ্কলিওস্টিয়াস (Dunkleosteus terrelli, ~৩৮০ মিলিয়ন বছর আগে), ভারী আর্মারযুক্ত মাথা এবং ধারালো কাটার মতো চোয়াল নিয়ে সাগরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।*

প্রথম কর্ডাটা প্রাণীর উদ্ভবের পর প্রায় একশত মিলিয়ন বছর ধরে মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সমুদ্রের তলদেশে এক তুচ্ছ, কাদা-ছেঁকে-খাওয়া দল হিসেবে টিকে ছিল। সিলুরিয়ান সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল বিশালকায় জলজ বিছা (ইউরিপ্টেরিডস) এবং শক্ত খোলসযুক্ত নটিলাস প্রজাতির শিকারী প্রাণীরা। কিন্তু ৪৪০ থেকে ৩৮০ মিলিয়ন বছর পূর্বে এক অভূতপূর্ব শারীরিক রূপান্তর মেরুদণ্ডীদের গলবিলীয় শ্বাসযন্ত্রকে রূপান্তর করল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক জৈব অস্ত্রে: গ্রন্থিবদ্ধ চোয়াল (Articulated Jaw)। এই একক আবিষ্কার ডেভোনিয়ান যুগকে পরিণত করল "মাছের স্বর্ণযুগ"-এ, জন্ম দিল ৯ মিটার লম্বা বর্মাবৃত দানব *ডাঙ্কলিওস্টিয়াস* এবং আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের বিভক্ত করল আধুনিক রশ্মি-পাখনার মাছ ও ডাঙ্গায় পা রাখার মতো মাংসল-পাখনার মাছের শাখায়।

১. শ্বাসযন্ত্র থেকে চোয়ালের জন্ম: ফুলকা খিলানের হোমোলজি

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, মেরুদণ্ডীদের চোয়াল হয়তো শিকার ধরা বা কামড়ানোর সুবিধার জন্য সরাসরি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব এবং অঙ্গসংস্থানবিদ্যা প্রকাশ করেছে এক চমকপ্রদ সত্য: আমাদের চোয়াল আদতে খাবার চিবানোর জন্য আসেনি—এসেছিল শ্বাস নেওয়ার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য!

আদিম চোয়ালহীন মাছদের (Agnatha) গলবিল অঞ্চলটি সারিবদ্ধ তরুণাস্থিময় **ফুলকা খিলান (Branchial Arches)** দ্বারা সমর্থিত ছিল (১ থেকে ৭ নম্বর খিলান), যা ফুলকা ছিদ্রগুলোকে খোলা রাখতে সাহায্য করত। বিপাকীয় শক্তি বাড়ার সাথে সাথে কেবল সিলিয়া বা নিষ্ক্রিয় জলপ্রবাহের মাধ্যমে ফুলকায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালে বিজ্ঞানী জন ম্যালাট (John Mallatt) প্রমাণ করেন যে, সবচেয়ে সামনের প্রথম ফুলকা খিলানটি (Arch 1) অতিরিক্ত পেশীবহুল হয়ে এক শক্তিশালী **বায়বীয় পাম্পে** পরিণত হয়—যা দ্রুত প্রসারিত ও সংকুচিত হয়ে ফুলকার মধ্য দিয়ে অধিক চাপে জল প্রবাহিত করতে পারত।



চিত্র ৮.১: গলবিলীয় কঙ্কালের সমগোত্রীয় রূপান্তর। বামে: চোয়ালহীন পূর্বপুরুষের রূপ যেখানে ৭টি সমরূপ ফুলকা খিলান বিদ্যমান। ডানে: চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডীর রূপ, যেখানে প্রথম খিলানটি ভাঁজ হয়ে তৈরি করেছে পালাটোকোয়াড্রেট (উর্ধ্ব চোয়াল) ও মেকেলের তরুণাস্থি (নিম্ন চোয়াল), দ্বিতীয় খিলানটি তৈরি করেছে হায়োম্যান্ডিবুলা সংযোগ এবং প্রথম ফুলকা খাঁজটি সংকুচিত হয়ে স্পাইরাকলে পরিণত হয়েছে।

একবার শ্বাস নেওয়ার জন্য এই কব্জাযুক্ত পেশীবহুল কাঠামো তৈরি হয়ে যাওয়ার পর, প্রাকৃতিক নির্বাচন অত্যন্ত দ্রুত একে শিকারকে কামড়ে ধরার কাজে রূপান্তর (Exaptation) করে। এই রূপান্তরের মূল ধাপগুলো হলো:

1. **ম্যান্ডিবুলার খিলান (প্রথম খিলান):** সামনে ঝুঁকে এসে আকারে বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। এর উপরের অংশ তৈরি করে **পালাটোকোয়াড্রেট তরুণাস্থি (Palatoquadrate)**—যা মাথার খুলির নিচে বসে উর্ধ্ব চোয়াল গঠন করে; আর নিচের অংশ তৈরি করে **মেকেলের তরুণাস্থি (Meckel's cartilage)**—যা নিম্ন চোয়ালের মূল ভিত্তি।
2. **হায়য়েড খিলান (দ্বিতীয় খিলান):** চোয়ালের পেছনে সরে গিয়ে মাথার খুলি ও চোয়ালের সংযোগস্থলে এক শক্ত বন্ধনী তৈরি করে, যার নাম **হায়োম্যান্ডিবুলা (Hyomandibula)**। এটি চোয়ালকে মাথার খুলির সাথে নিখুঁতভাবে আটকে রাখে।
3. **স্পাইরাকলের সৃষ্টি (Spiracle):** প্রথম ও দ্বিতীয় খিলানের মধ্যবর্তী ফুলকা ছিদ্রটি সংকুচিত হয়ে মাথার উপরের একটি ক্ষুদ্র শ্বাসছিদ্র বা স্পাইরাকলে রূপ নেয়—যা তলদেশে থাকা অবস্থায় বালু না ঢুকিয়ে বিশুদ্ধ জল ফুলকায় পাঠাতে সাহায্য করে (যা আজও হাঙ্গর ও রে মাছে দেখা যায়)।

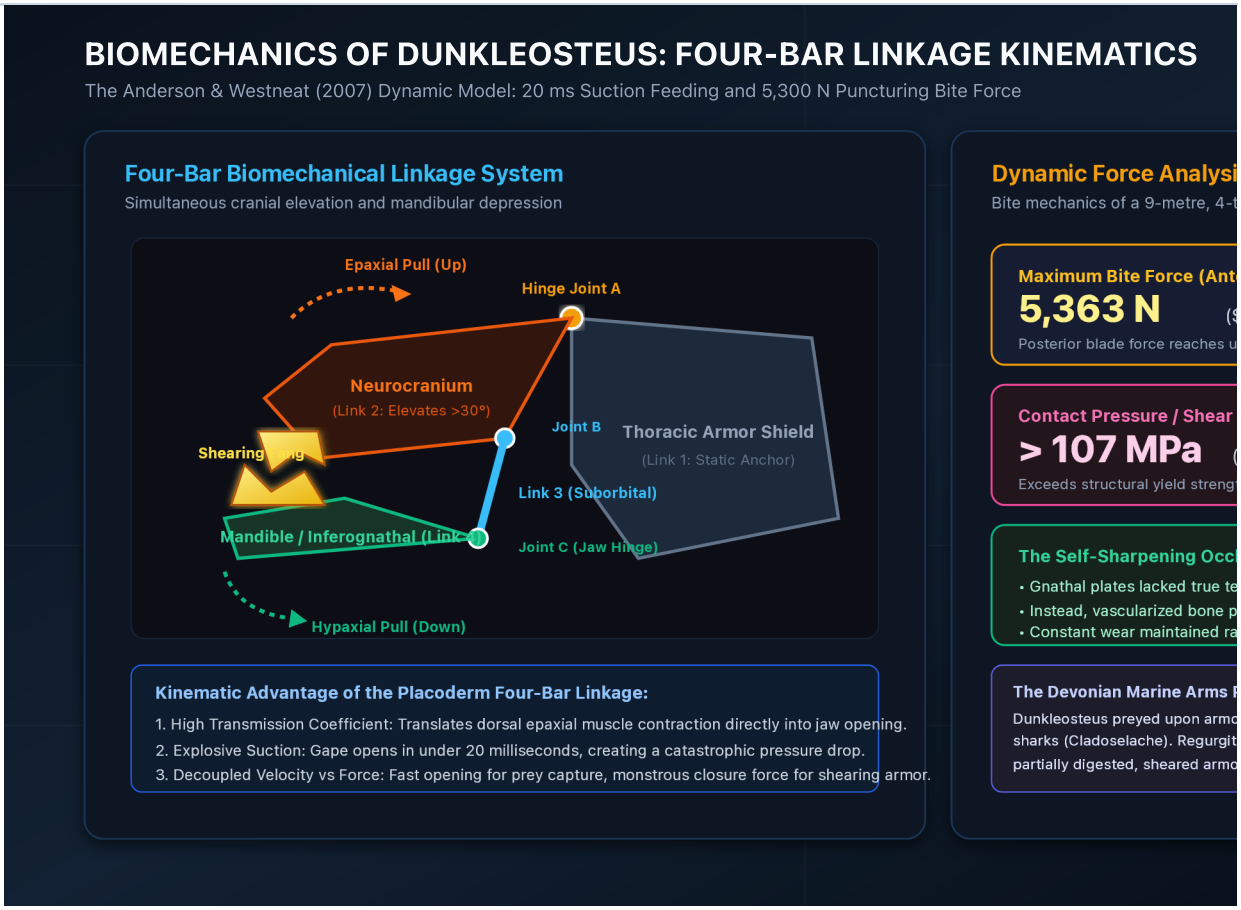
> ***বিবর্তনের অসাধারণ প্রতিধ্বনি:*** *আজ থেকে ৩০০ মিলিয়ন বছর পর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিবর্তনে মেকেলের তরুণাস্থির পিছনের হাড় রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস (Malleus/হাতুড়ি)-এ, পালাটোকোয়াড্রেটের অংশ হয়েছে ইনকাস (Incus/নেহাই)-এ এবং হায়োম্যান্ডিবুলা হয়েছে স্টেপিস (Stapes/রেকাব)-এ! অর্থাৎ আজ আমরা যে শব্দ শুনি, তা মূলত ডেভোনিয়ান মাছের পরিবর্তিত ফুলকা খিলানের হাড়ের মাধ্যমেই পরিবাহিত হয়!*

২. ডাঙ্কলিওস্টিয়াসের বায়োমেকানিক্স: ৪-বার লিংকেজের দানব

চোয়ালের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ডেভোনিয়ান যুগে আবির্ভূত হলো শক্ত বর্মধারী মাছের দল—**প্লাকোডার্ম (Placoderms)**। আর এই যুগের অবিসংবাদিত সম্রাট ছিল *ডাঙ্কলিওস্টিয়াস টেরেলি (Dunkleosteus terrelli)*—একটি ৯ মিটার দীর্ঘ এবং ৪ টন ওজনের দানবাকৃতির জলজ শিকারী।

আধুনিক হাঙ্গরের মতো এদের কোনো আলাদা দাঁত ছিল না। তার পরিবর্তে চোয়ালের শক্ত হাড়ের পাত দুটি খাপের মতো পরস্পর ঘষে গিয়ে কাচির মতো ধারালো ব্লেডে (Gnathal plates) রূপান্তরিত হতো। চিবানোর প্রতিটি ধাক্কায় এরা নিজেদের চোয়ালকে নিজেরাই পাথরের শানের মতো ধারালো করে তুলত!

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ৮.২: ডাঙ্কলিওস্টিয়াসের কঙ্কাল ও বলবিদ্যার নকশা। বামে: অ্যান্ডারসন ও ওয়েস্টনিটের (২০০৭) ৪-বার লিংকেজ মডেল, যা দেখায় পিঠের পেশীর টানে মাথার খুলি ৩০° উপরে উঠে যেত এবং একই সাথে নিম্ন চোয়াল নিচে নেমে আসত। ডানে: ৫,৩৬৩ নিউটন কামড়ের বল এবং ১০৭ মেগাপ্যাসকেলের বেশি বিধ্বংসী চাপ।

২০০৭ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ অ্যান্ডারসন এবং মার্ক ওয়েস্টনিট ডাঙ্কলিওস্টিয়াসের মাথার খুলির কম্পিউটার মডেল তৈরি করে এক অবিশ্বাস্য প্রকৌশল উন্মোচন করেন—এদের চোয়াল চালিত হতো একটি **প্ল্যানার ফোর-বার লিংকেজ মেকানিজম (Planar Four-Bar Linkage)** দ্বারা:

- **লিঙ্ক ১ (স্থির ভিত্তি):** কাঁধ ও বুকের বিশালাকার হাড়ের বর্ম (Thoracic Shield)।
- **লিঙ্ক ২ (চালক):** মাথার খুলি (Cranium), যা কব্জার মতো বুকের বর্মের সাথে যুক্ত ছিল। পিঠের শক্তিশালী পেশী সংকুচিত হলে পুরো মাথাটি প্রায় ৩০ ডিগ্রি উপরে উঠে যেত!
- **লিঙ্ক ৩ (পরিবাহী):** চোখের নিচের সাব-অরবিটাল প্লেট, যা মাথার খুলির সাথে নিচের চোয়ালকে যুক্ত রাখত।
- **লিঙ্ক ৪ (আউটপুট):** নিচের চোয়াল (Inferognathal), যা মাথা উপরে ওঠার সাথে সাথে প্রচণ্ড বেগে নিচে নেমে আসত।

এই লিংকেজ সিস্টেম ডাঙ্কলিওস্টিয়াসকে দুটি মারাত্মক সুবিধা দিত। প্রথমত, মাত্র **২০ মিলিসেকেন্ডে** (০.০২ সেকেন্ড) এদের প্রকাণ্ড মুখ হাঁ হয়ে যেত, যা এক শক্তিশালী শূন্যস্থান বা সাকশন ভ্যাকুয়াম তৈরি করত—ফলে যেকোনো শিকার সরাসরি জলের স্রোতের সাথে এর গলার ভেতর ঢুকে যেত।

দ্বিতীয়ত, মুখ বন্ধের সময় এর লিভার মেকানিজম চোয়ালের শেষ প্রান্তে প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করত:

$$F_{\text{bite}} \approx ৫,৩৬৩ \text{ নিউটন} \quad (\approx ১,২০০ \text{ পাউন্ড বল})$$

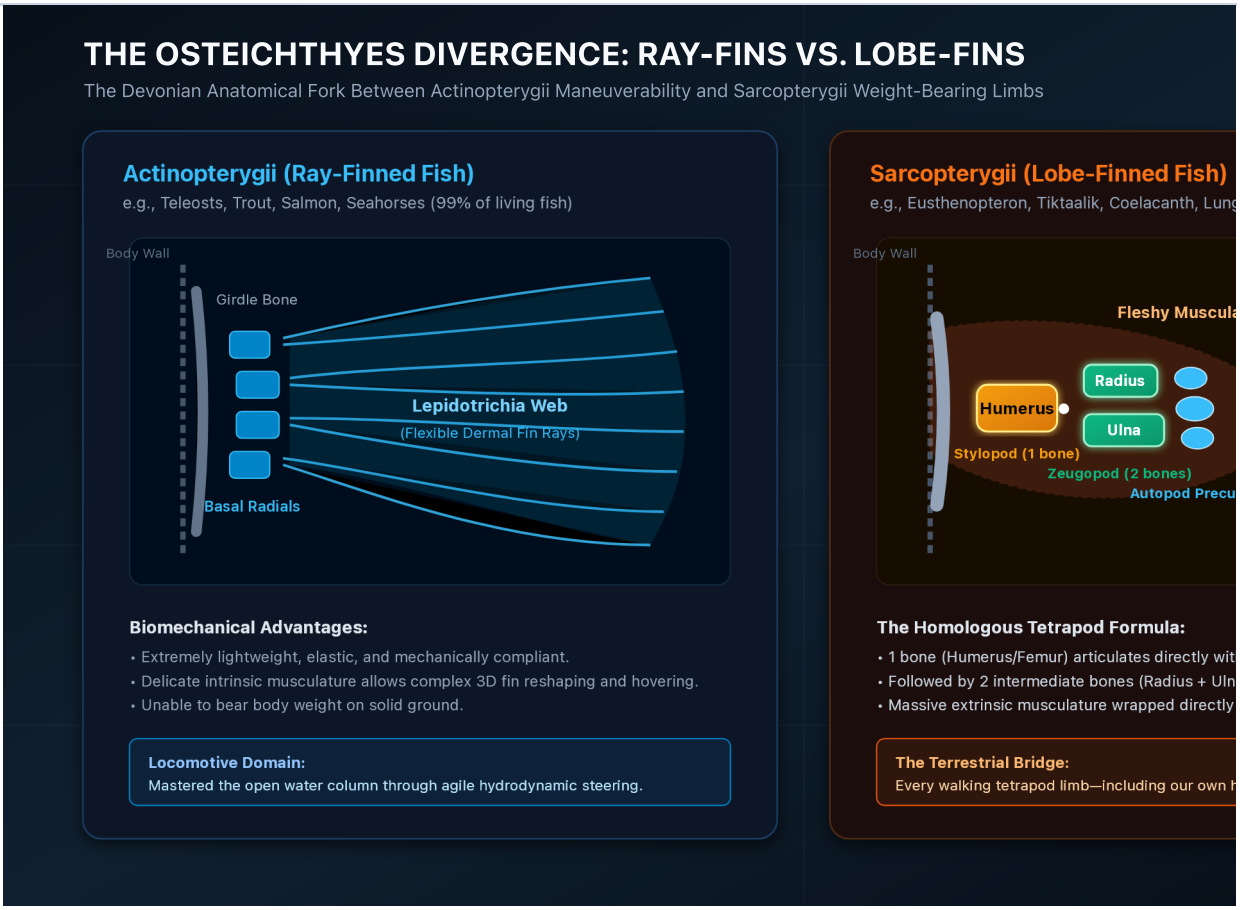
সামনের সূক্ষ্ম ফ্যানের মতো হাড়ের ডগায় এই দানবীয় বল কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এর প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রযুক্ত চাপ বা শিয়ার স্ট্রেস দাঁড়াত:

$$P = \frac{F}{A} > ১০৭\text{ মেগাপ্যাসকেল} \quad (\approx ১৫,৫০০\text{ psi})$$

এই বিধ্বংসী চাপ যেকোনো শক্ত ইস্পাত এবং অন্যান্য প্লাকোডার্ম মাছের ৫ সেন্টিমিটার পুরু হাড়ের বর্মকে অনায়াসে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারত!

৩. অস্থির দ্বিধাবিভক্তি: রশ্মি-পাখনা (Actinopterygii) বনাম মাংসল-পাখনা (Sarcopterygii)

প্লাকোডার্মরা যখন সমুদ্র কাঁপাচ্ছিল, তখন চোয়ালযুক্ত অস্থিময় মাছদের (Osteichthyes) মধ্যে এমন এক শারীরিক বিভাজন ঘটল যা পরবর্তীতে পৃথিবীর সম্পূর্ণ জীবজগতের ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেছিল। সিলুরিয়ান যুগের শেষের দিকে এরা নিজেদের পাখনার হাড়ের গঠনের ওপর ভিত্তি করে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়:



চিত্র ৮.৩: অস্থিময় মাছের কঙ্কালের দ্বিধাবিভক্তি। বামে: অ্যাক্টিনোপটেরিজি (রশ্মি-পাখনা)—শরীরের ভেতরে আবদ্ধ ব্যাসাল রেডিয়াল এবং বাইরে প্রসারিত স্থিতিস্থাপক লেপিডোট্রিকিয়া পাখনা। ডানে: সারকোপটেরিজি (মাংসল-পাখনা)—বাইরে প্রসারিত একক হিউমেরাস, রেডিয়াস এবং আলনা হাড় সমৃদ্ধ শক্তিশালী মাংসল কাণ্ড, যা ডাঙ্গার মেরুদণ্ডীদের হাতের আদি ভিত্তি।

অ্যাক্টিনোপটেরিজি (Actinopterygii): জলের অ্যারোব্যাটিক্স চ্যাম্পিয়ন

রশ্মি-পাখনার মাছেরা তাদের পাখনার সহায়ক হাড়গুলোকে (Radials) দেহের ভেতর সংকুচিত করে রাখে। আর শরীরের বাইরে কেবল সমান্তরাল, অস্থিময় ও স্থিতিস্থাপক রশ্মি বা **লেপিডোট্রিকিয়া (Lepidotrichia)** প্রসারিত থাকে। এই নকশা অত্যন্ত হালকা, স্থিতিস্থাপক এবং জলের স্রোতকে দ্রুত দিক পরিবর্তনের উপযোগী করে তোলে। আজ পৃথিবীর ৯৯% মাছ—রুই, কাতলা, স্যামন, টুনা—সবই এই রশ্মি-পাখনা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে এদের পাখনা কোনো ভারী ভর বহন করতে অক্ষম।

সারকোপটেরিজি (Sarcopterygii): ডাঙ্গায় চলার অগ্রদূত

বিপরীতে, মাংসল-পাখনার মাছেরা এক অদ্ভুত ও মজবুত শারীরিক নকশা বেছে নিল। এদের পাখনা শরীর থেকে আলাদা এক শক্ত মাংসল কাণ্ড হিসেবে বাইরে বের হয়ে এলো, যার ভেতরে ছিল পরপর সাজানো মজবুত এন্ডোকন্ড্রাল হাড়ের শৃঙ্খল:

- **মনোব্যাসিক জয়েন্ট:** সরাসরি কাঁধের হাড়ের সাথে যুক্ত ছিল একটি একক বৃহৎ অস্থি—**হিউমেরাস (Humerus)** (পেছনের পাখনার ক্ষেত্রে ফিমার)।
- **মধ্যবর্তী জোড় অস্থি:** হিউমেরাসের সাথে যুক্ত ছিল একজোড়া সমান্তরাল হাড়—**রেডিয়াস (Radius) এবং আলনা (Ulna)**।
- **মাংসপেশীর বিস্তার:** সাধারণ মাছের মতো পাখনার গোড়ায় নয়, বরং পুরো পেশীবহুল মাংস সরাসরি এই হাড়গুলোকে ঘিরে শরীরের বাইরে অবস্থান করছিল।

উন্মুক্ত গভীর সমুদ্রে সাঁতার কাটার জন্য এই ভারী মাংসল পাখনা তেমন চটপটে ছিল না। কিন্তু অগভীর জলাভূমি, জলজ উদ্ভিদে ভরা খাঁড়ি এবং ডেভোনিয়ান কাদার মাঝে চলার জন্য এই পাখনা ছিল এক অতুলনীয় আশীর্বাদ! *ইউস্থেনোপটেরন (Eusthenopteron)*-এর মতো সারকোপটেরিজিয়ান মাছেরা এই মজবুত পাখনার ওপর ভর দিয়ে নদীর তলদেশে হাঁটতে এবং অগভীর জলজ উদ্ভিদের ভেতর দিয়ে শরীর টেনে নিয়ে যেতে পারত।

৪. ডাঙ্গায় ওঠার আগেই ফুসফুসের জন্ম: পটকা ও ফুসফুসের রহস্য

একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হলো, মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হয়তো ডাঙ্গায় ওঠার পরই বাতাসে শ্বাস নেওয়ার জন্য ফুসফুস আবিষ্কার করেছিল। বাস্তবে জীবাশ্ম ও জিনতত্ত্ব প্রমাণ করে সম্পূর্ণ বিপরীত সত্য: **ডাঙ্গায় পা রাখার বহু কোটি বছর আগেই জলের নিচে মাছের শরীরে ফুসফুস জন্ম নিয়েছিল!**

উষ্ণ ও জলাভূমিময় ডেভোনিয়ান যুগে অগভীর নদীর জল নিয়মিতভাবে অক্সিজেনহীন (Hypoxia) হয়ে পড়ত। ফলে কেবল ফুলকার সাহায্যে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জীবন বাঁচাতে আদিম অস্থির মাছেরা তাদের খাদ্যনালীর নিচের প্রাচীর প্রসারিত করে রক্তজালক সমৃদ্ধ থলি তৈরি করে। জলের উপরিভাগে মুখ বের করে বাতাস গিললে সেই বাতাস এই থলির কৈশিক জালিকায় অক্সিজেন সরবরাহ করত—এটাই ছিল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের **আদি ফুসফুস**।

পরবর্তীতে যখন রশ্মি-পাখনার মাছেরা গভীর ও অক্সিজেনসমৃদ্ধ সমুদ্রে চলে গেল, তখন বাতাসে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তাদের এই ফুসফুসটি পিঠের দিকে সরে গিয়ে রূপান্তরিত হলো প্লবতা রক্ষাকারী **পটকা বা সুইম ব্লাডারে (Swim Bladder)**—যার মাধ্যমে তারা পেশীর শক্তি ব্যয় না করেই যেকোনো গভীরতায় ভেসে থাকতে পারে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

অন্যদিকে আমাদের মাংসল-পাখনার পূর্বপুরুষরা তাদের সক্রিয় জোড়া ফুসফুস ও ভারী হাড়যুক্ত পাখনা দুটোই টিকিয়ে রেখেছিল। মজবুত হিউমেরাস-রেডিয়াস-আলনা সমন্বিত পাখনা, মাথায় স্পাইরাকল শ্বাসছিদ্র এবং বায়ু-গ্রহণে সক্ষম ফুসফুস—এই তিন মহাশক্তি নিয়ে তারা প্রস্তুত হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য: জল ছেড়ে ডাঙ্গার মাটিতে স্থায়ী পদার্পণ।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "গভীর জলের জয়যাত্রা — চোয়ালের উদ্ভাবন এবং আর্মার্ড প্লাকোডার্মের যুগ"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ৮। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-8-the-age-of-fishes-and-jaw-evolution-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • নবম খণ্ড

জল থেকে ডাঙায় পদার্পণ — সারকোপটেরিজিয়ান টেট্রাপোডোমরফের ব্যবচ্ছেদ

জল থেকে ডাঙায় পদার্পণ — সারকোপটেরিজিয়ান টেট্রাপোডোমরফের ব্যবচ্ছেদ

1,052 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৯: *চিত্র: পানি থেকে ডাঙায় উত্তরণের প্রতীক সারকোপ্টেরিজিয়ান টিকটালিক (Tiktaalik roseae, ~৩৭৫ মিলিয়ন বছর আগে), যা ওজন বহনকারী কব্জি-পাখনা এবং চলমান ঘাড়ের সাহায্যে নদীর পাড়ে উঠে আসছে।*

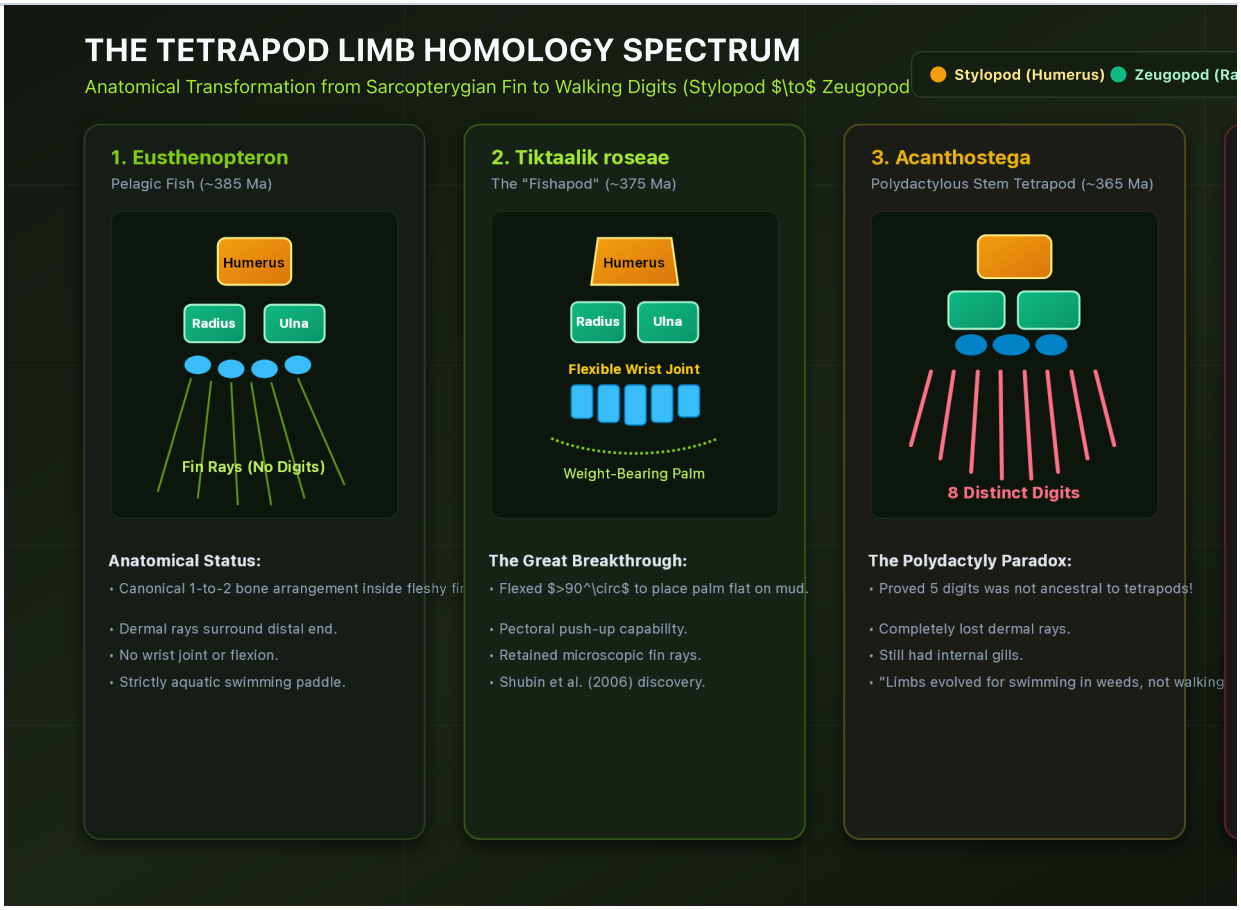
আজ থেকে প্রায় ৩৭৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীর মূল নাট্যমঞ্চ উন্মুক্ত গভীর সমুদ্রে ছিল না, বরং তা রচিত হচ্ছিল ক্রান্তীয় নদী উপত্যকা এবং কর্দমাক্ত মোহনার অগভীর কাদামাটির বুকে। সেখানে জল ও ডাঙার সীমারেখা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট—নদীর জল নিয়মিত শুকিয়ে তৈরি হতো অক্সিজেনহীন বদ্ধ জলাশয়। যেসব মাছ কেবল সাঁতার কাটতে পারত, তারা সেই শুকিয়ে যাওয়া কাদায় আটকা পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। কিন্তু মাংসল-পাখনার সারকোপটেরিজিয়ান মাছদের একটি সাহসী শাখা—টেট্রাপোডোমরফরা—এমন এক শারীরস্থানিক রূপান্তরের সূচনা করল যা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দিল: তারা পাখনার ভেতরে হাঁটার হাড় তৈরি করল, মাথার সাথে কাঁধের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আবিষ্কার করল পৃথিবীর প্রথম নমনীয় ঘাড় এবং বাতাসে শোনার জন্য কানের জটিল প্রকৌশল গড়ে তুলল।

১. টেট্রাপোডের চতুষ্পদ অঙ্গের মৌলিক সূত্র: স্টাইলোপড, জিউগোপড এবং অটোপড

আজকের পৃথিবীতে চার পায়ে হাঁটা যেকোনো মেরুদণ্ডী প্রাণী—একটি তুচ্ছ গেছো ব্যাঙ থেকে শুরু করে দ্রুতগামী চিতা বাঘ, উড়ন্ত চিলের ডানা থেকে শুরু করে যে হাত দিয়ে আপনি এই লেখাটি স্ক্রোল করছেন—সবাই এক অভিন্ন, গভীর বিবর্তনীয় কঙ্কালের উত্তরাধিকারী: ট্রাইপার্টাইট টেট্রাপোড অঙ্গ (Tripartite Limb)।

তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান এবং ভ্রূণীয় জিনতত্ত্ব প্রমাণ করে যে, এই নকশাটি হঠাৎ করে ডাঙায় তৈরি হয়নি। বরং ডেভোনিয়ান মাংসল-পাখনার মাছের শরীরের ভেতরের হাড়গুলো পরপর তিনটি সুনির্দিষ্ট জোনে বিন্যস্ত হয়ে এই অলৌকিক কাঠামো গঠন করেছিল:

Shakil Mahmud • Research Monograph



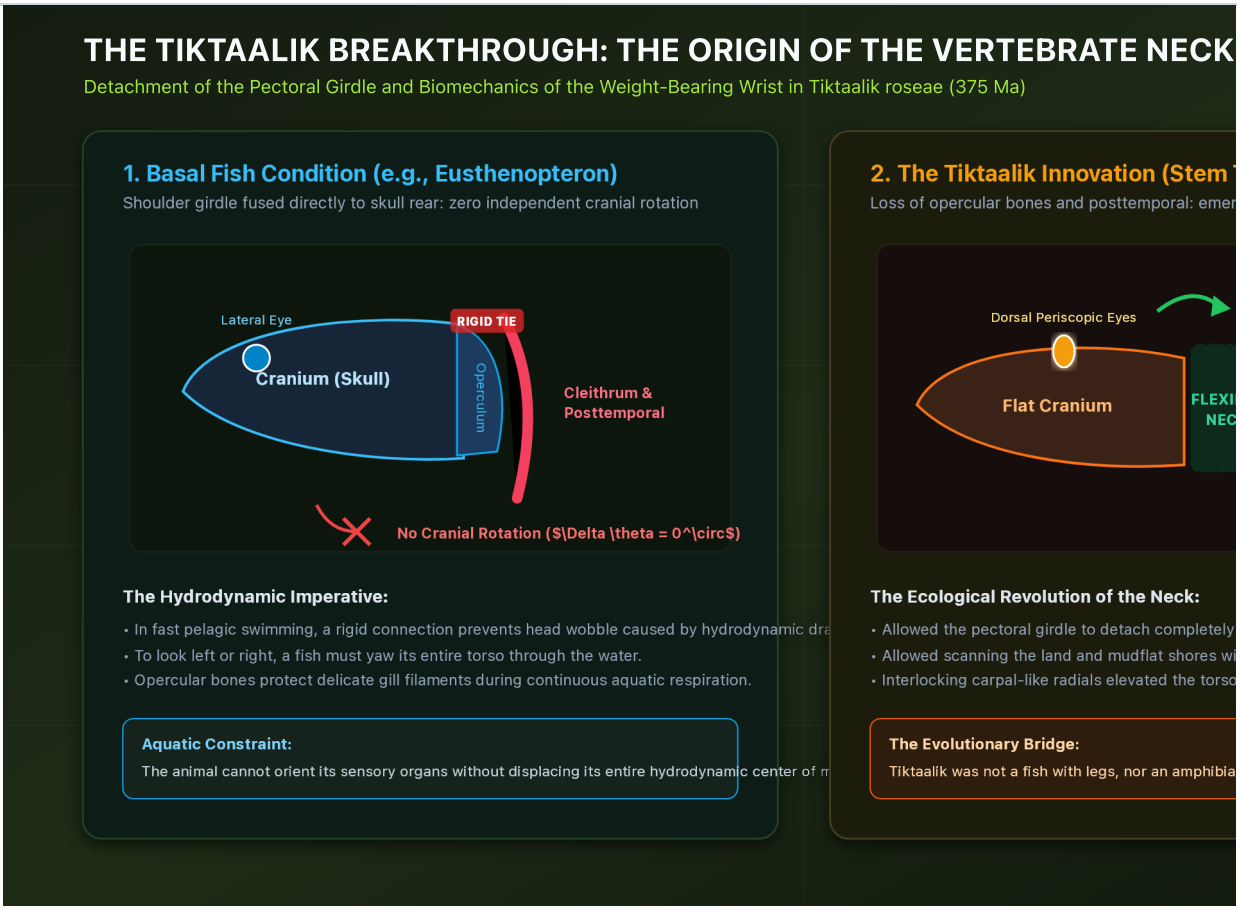
চিত্র ৯.১: টেট্রাপোড অঙ্গের বিবর্তনীয় ক্রমবিকাশ। চারটি প্রধান পর্যায়: (১) ইউস্থেনোপটেরন—পাখনার অভ্যন্তরে হিউমেরাস ও রেডিয়াস/আলনা কিন্তু বাইরে পাখনা রশ্মি বিদ্যমান; (২) টিকটালিক—প্রথম কব্জির সন্ধি ও বুক উঁচু করার মতো সমতল তালু; (৩) অ্যাক্যান্থোস্টেগা—আটটি স্বতন্ত্র আঙুলবিশিষ্ট সাঁতারের চওড়া প্যাডেল (পলিড্যাক্টাইলি); (৪) ক্রাউন টেট্রাপোড—স্থিরীকৃত ৫-আঙুলবিশিষ্ট শক্তিশালী হাঁটার পা।

1. **স্টাইলোপড (একটি প্রধান হাড়):** কাঁধ বা শ্রোণীচক্রের সাথে সরাসরি যুক্ত একক প্রকাণ্ড অস্থি—সামনের পায়ে **হিউমেরাস (Humerus)** এবং পেছনের পায়ে **ফিমার (Femur)**। *ইউস্থেনোপটেরন*-এর মতো মাছে এই হিউমেরাস হাড়ের গায়ে শক্তিশালী পেশী যুক্ত থাকার স্পষ্ট খাঁজ ছিল।
2. **জিউগোপড (দুটি সমান্তরাল হাড়):** হিউমেরাসের পরবর্তী জোড়া সমান্তরাল অস্থি—সামনের পায়ে **রেডিয়াস (Radius) ও আলনা (Ulna)** এবং পেছনের পায়ে **টিবিয়া (Tibia) ও ফিবুলা (Fibula)**। এই দ্বৈত হাড়ের অবস্থান শরীরকে মাটিতে ঠেলে তোলার সময় মোচড়জনিত চাপ (Torsional strain) প্রতিরোধ করে।
3. **অটোপড (বহু অস্থির জটিল সমাহার):** অঙ্গের শেষ প্রান্ত—কব্জির হাড় (Carpals/Tarsals), তালুর লম্বা হাড় (Metacarpals/Metatarsals) এবং আঙুলের সন্ধিযুক্ত হাড় (Phalanges)। ভ্রূণের *HoxA* এবং *HoxD* জিনের বিশেষ সক্রিয়তায় এই অংশে তৈরি হয় হাঁটা ও আঁকড়ে ধরার আঙুল।

২. টিকটালিক রোজির মহাবিপ্লব: প্রথম ঘাড় এবং কব্জি

২০০৪ সালে কানাডার দুর্গম আর্কটিকের এলসমেয়ার দ্বীপে নীল শুবিন, এডওয়ার্ড ড্যাশলার এবং ফারিশ জেনকিন্স বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম রোমাঞ্চকর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন: *টিকটালিক রোজি (Tiktaalik roseae)*—যার বয়স ঠিক ৩৭৫ মিলিয়ন বছর।

টিকটালিক ছিল সাঁতারু মাছ ও চারপেয়ে উভচরের মাঝখানের এক নিখুঁত মিসিং লিংক বা "ফিশাপড" (Fishapod)। এর দেহে আঁইশ ও ফুলকা থাকলেও এটি দুটি যুগান্তকারী শারীরিক উদ্ভাবন প্রদর্শন করেছিল:



চিত্র ৯.২: টিকটালিকের বলবিদ্যার উদ্ভাবন। বামে: সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে কাঁধের হাড় মাথার খুলির সাথে শক্তভাবে জোড়া লাগানো থাকায় স্বাধীনভাবে মাথা ঘোরানো অসম্ভব। ডানে: টিকটালিকের রূপান্তর—ফুলকা ঢাকনা (অপারকুলাম) হারিয়ে মাথার খুলি কাঁধ থেকে মুক্ত হয়ে তৈরি করেছে পৃথিবীর প্রথম নমনীয় ঘাড় (৩৫° মাথা ঘোরানোর ক্ষমতা), মাথার উপরে স্থাপন করেছে শিকার খোঁজার চোখ এবং তৈরি করেছে পুশ-আপ দিতে সক্ষম ৯০° বাঁকা কব্জি।

কাঁধের হাড়ের বিচ্ছিন্নতা: পৃথিবীর প্রথম ঘাড়ের জন্ম

সব সাঁতারু মাছের ক্ষেত্রে কাঁধের হাড় (Cleithrum এবং Posttemporal) সরাসরি মাথার খুলির পেছনের সাথে শক্তভাবে জোড়া লাগানো থাকে। জলে দ্রুত সাঁতারের সময় মাথা যাতে ডানে-বায়ে দোলে না যায় সেজন্য এই বন্ধন অপরিহার্য। কিন্তু এর মারাত্মক সীমাবদ্ধতা হলো: ডানে বা বায়ে তাকাতে হলে একটি মাছকে তার পুরো শরীরকে জলের ভেতর ঘোরাতে হয়।

টিকটালিক তার ফুলকার বাইরের শক্ত ঢাকনা (Operculum) এবং পেছনের সংযোগকারী হাড়গুলো সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মাথার খুলি কাঁধ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে তৈরি করল এক নমনীয় **ঘাড়**! টিকটালিক কাদায় শরীর স্থির রেখে তার চ্যাপ্টা কুমিরের মতো মাথাটিকে স্বাধীনভাবে ৩৫ ডিগ্রি ডানে-বায়ে ঘুরিয়ে ডাঙা ও জলের শিকার পর্যবেক্ষণ করতে পারত।

ভারবাহী নমনীয় কব্জির সন্ধি

টিকটালিকের পাখনার শেষ প্রান্তে ছিল রেডিয়েল অস্থির জটিল সন্ধি, যা আমাদের কব্জির সমগোত্রীয়। এই সন্ধিটি ৯০ ডিগ্রির বেশি বাঁকতে পারত—ফলে টিকটালিক তার পাখনার তালু মাটির ওপর সমতলভাবে রেখে "পুশ-আপ" দিয়ে বুককে কাদার উপর তুলে ধরতে পারত এবং ফুসফুসে বাতাস টেনে নিতে পারত।

৩. পলিড্যাক্টাইলি প্যারাডক্স: অ্যাক্যান্থোস্টেগার ৮টি আঙুল

বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, টেট্রাপোড প্রাণীদের আদি অবস্থা থেকেই পাঁচটি করে আঙুল (Pentadactyly) ছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে জেনি ক্ল্যাক এবং মাইকেল কোটস গ্রিনল্যান্ডের ৩৬৫ মিলিয়ন বছরের পুরনো *অ্যাক্যান্থোস্টেগা (Acanthostega)* জীবাশ্ম পরীক্ষা করে গোটা বিজ্ঞান জগতকে চমকে দেন।

দেখা গেল, *অ্যাক্যান্থোস্টেগা*-র প্রতিটি হাতে পাঁচটি নয়, বরং **আটটি সম্পূর্ণ গঠিত সুস্পষ্ট আঙুল** ছিল! তাদের আরেক নিকটাত্মীয় *ইকথায়োস্টেগা (Ichthyostega)*-র পেছনের পায়ে ছিল সাতটি আঙুল এবং *টুলারপেটন (Tulerpeton)*-এর ছিল ছয়টি আঙুল।

এই আবিষ্কার জীববিজ্ঞানে **Polydactyly Paradox** নামে পরিচিত। এর অর্থ: আঙুল মূলত শুকনো মাটিতে হাঁটার জন্য তৈরি হয়নি; বরং জলজ উদ্ভিদের জঙ্গলে শরীর আঁকড়ে সাঁতার কাটার চওড়া প্যাডেল হিসেবে জলের নিচেই আঙুলের জন্ম হয়েছিল! পরবর্তীতে কার্বনিফেরাস যুগে ডাঙায় চলার ভার বহন করতে গিয়ে অতিরিক্ত আঙুলগুলো বিলুপ্ত হয়ে পাঁচটি আঙুলের আদর্শ রূপ স্থায়ী হয়।

৪. বাতাসে শোনার নতুন ইন্দ্রিয়: স্পাইরাকল থেকে মধ্যকর্ণের স্টেপিস

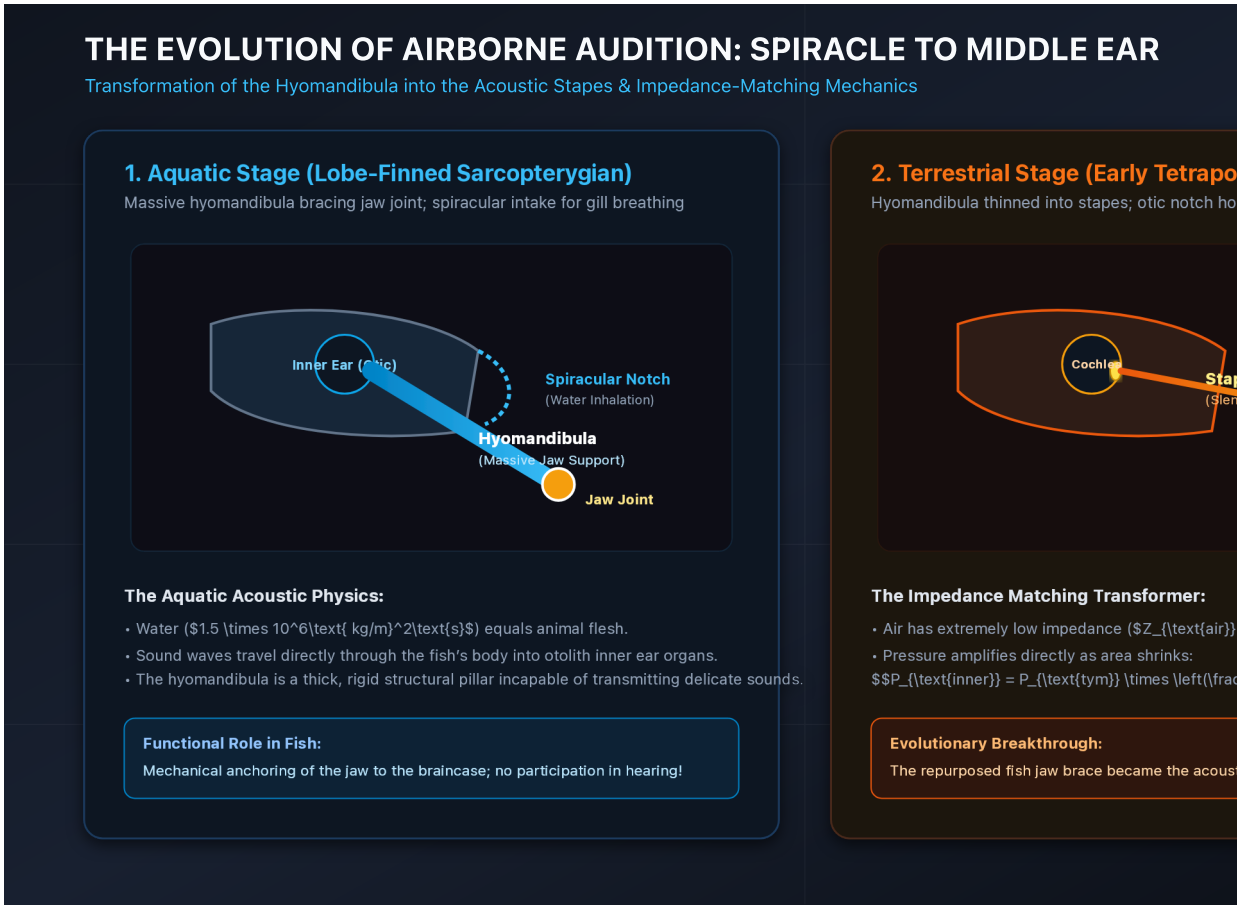
জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা ছিল শব্দ শোনা। জলের মধ্য দিয়ে শব্দ সরাসরি প্রাণীর দেহের টিস্যুতে প্রবেশ করতে পারে, কারণ জলের শাব্দিক প্রতিবন্ধকতা (Acoustic Impedance: $Z_{\text{water}} \approx ১.৫ \times ১০^{৬}\ \text{Pa} \cdot \text{s/m}$) প্রাণীর নরম মাংসের প্রায় সমান।

কিন্তু বাতাসে শব্দের শাব্দিক প্রতিবন্ধকতা প্রায় চার হাজার গুণ কম:

Shakil Mahmud • Research Monograph

$$Z_{\text{air}} \approx ৪১৫\ \text{Pa} \cdot \text{s/m}$$

ফলে বাতাস থেকে শব্দতরঙ্গ যখন সরাসরি কানের ভেতরের ঘন তরলে আঘাত করে, তখন **শব্দশক্তির ৯৯.৯% বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়**—যার ফলে প্রাণীটি কার্যত বধিরে পরিণত হয়।



চিত্র ৯.৩: বাতাসে শোনার পদার্থবিজ্ঞান। বামে: মাছের অবস্থায় বিশাল হায়োম্যান্ডিবুলা চোয়াল আটকে রাখত এবং স্পাইরাকল জল নেওয়ার ছিদ্র হিসেবে কাজ করত। ডানে: ডাঙার মধ্যকর্ণের ট্রান্সফর্মার—হায়োম্যান্ডিবুলা সরু স্টেপিস রডে রূপান্তরিত হয়ে কানের পর্দার (টিম্প্যানাম) বিশাল ক্ষেত্রফলের শব্দচাপকে অন্তঃকর্ণের সূক্ষ্ম ওভাল জানালায় কেন্দ্রীভূত করে ২০-৩০ গুণ চাপ বৃদ্ধি করে।

প্রকৃতি এই সংকট সমাধান করল অসাধারণ এক প্রকৌশলে:

- **কানের পর্দা (টিম্প্যানাম):** মাথার পেছনের আদিম শ্বাসছিদ্র বা স্পাইরাকল খাঁজটি প্রসারিত হয়ে গভীর গহ্বরে পরিণত হলো, যার মুখে তৈরি হলো এক সংবেদনশীল পর্দা—**টিম্প্যানিক মেমব্রেন বা কানের পর্দা**।
- **স্টেপিস অস্থির রূপান্তর:** চোয়াল সরাসরি মাথার খুলির সাথে আটকে যাওয়ায় প্রাচীন মাছের শক্ত **হায়োম্যান্ডিবুলা** হাড়টি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলো। এটি আকারে সরু ও সূক্ষ্ম এক দণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে কানের পর্দা থেকে অন্তঃকর্ণের তরলপূর্ণ ওভাল উইন্ডো পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করল—যার নাম **স্টেপিস (Stapes)**।

এই মেকানিজমটি একটি নিখুঁত **Impedance-Matching Transformer** হিসেবে কাজ করে। কানের পর্দার বিশাল ক্ষেত্রফল (A_{tym}) থেকে সংগৃহীত শব্দতরঙ্গ যখন ক্ষুদ্র স্টেপিস পায়ের ছাপে ($A_{\text{footplate}}$) ঘনীভূত হয়, তখন চাপের তীব্রতা এক লাফে ২০ থেকে ৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়:

$$P_{\text{inner}} = P_{\text{tym}} \times \left(\frac{A_{\text{tym}}}{A_{\text{footplate}}}\right) \approx ২০\text{–}৩০\times \text{ গুণ বর্ধন!}$$

এই যান্ত্রিক সুবিধার কারণে বাতাসের সামান্যতম শব্দও অন্তঃকর্ণের তরলে তরঙ্গ তৈরি করতে সক্ষম হয়—যার বদৌলতে ডাঙ্গার আদি মেরুদণ্ডী প্রাণীরা বাতাসে পাতার খসখস শব্দ এবং শিকারের উপস্থিতি টের পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

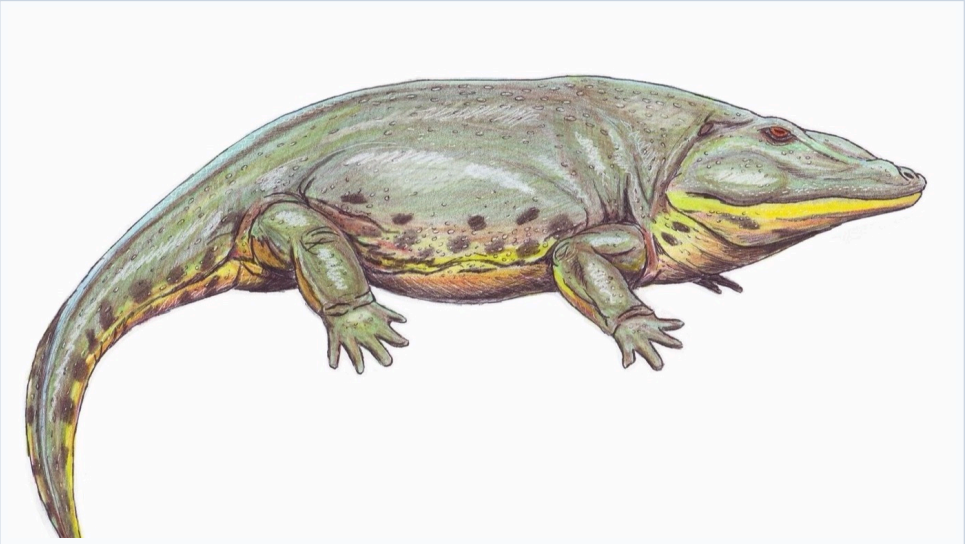
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "জল থেকে ডাঙায় পদার্পণ — সারকোপটেরিজিয়ান টেট্রাপোডোমরফের ব্যবচ্ছেদ"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ৯। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-9-the-water-to-land-transition-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দশম খণ্ড

কার্বনিফেরাস উভচর সাম্রাজ্য এবং জলনিরপেক্ষ অ্যামনিওটিক ডিমের বিপ্লব

কার্বনিফেরাস উভচর সাম্রাজ্য এবং জলনিরপেক্ষ অ্যামনিওটিক ডিমের বিপ্লব

966 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১০: *চিত্র: লেট কার্বনিফেরাস কয়লা জলাভূমি বন (~৩১০ মিলিয়ন বছর আগে), যেখানে বিশালাকার লেপিডোডেনড্রন গাছের ছায়ায় আদিম উভচর এরিওপস (Eryops) ঘুরে বেড়াচ্ছে।*

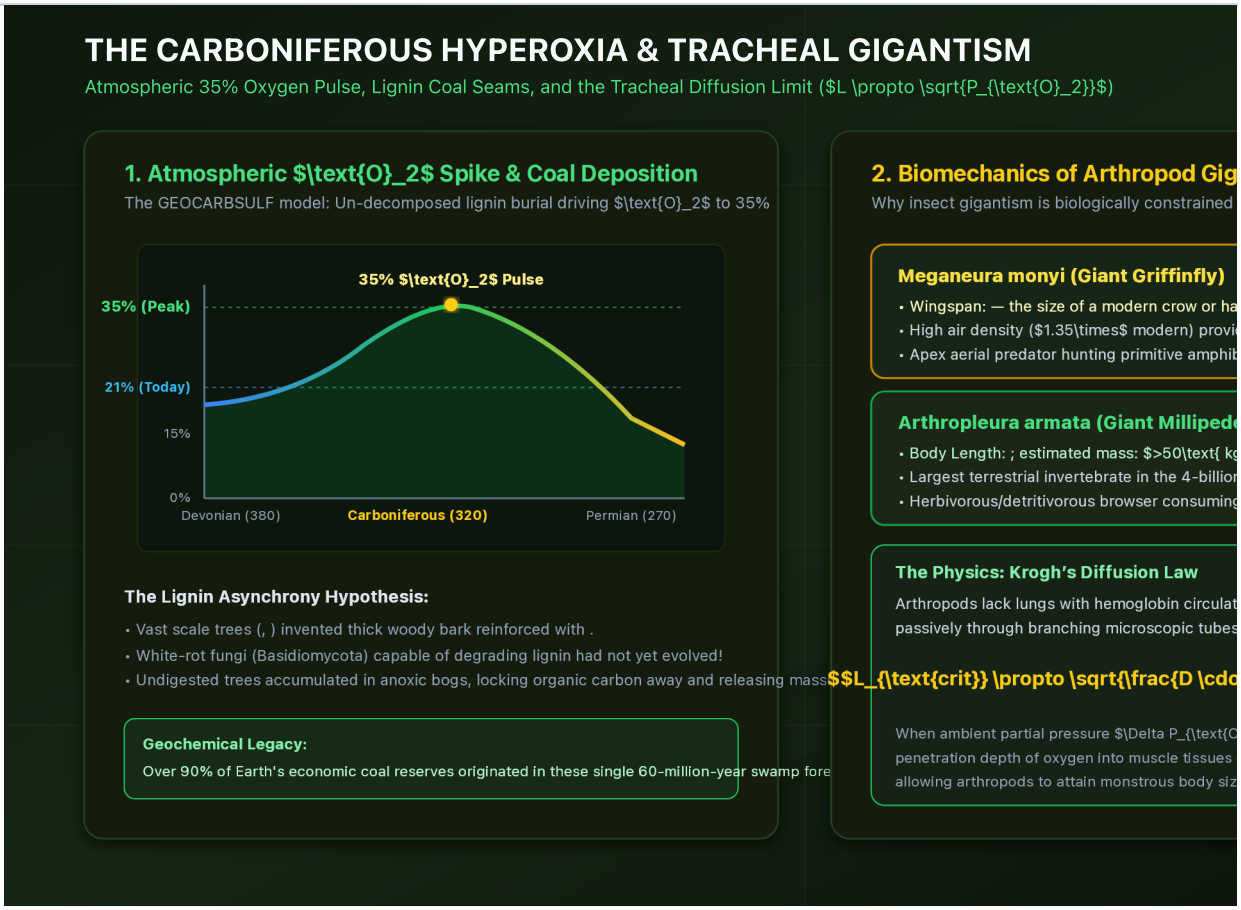
আজ থেকে প্রায় ৩২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবী আচ্ছাদিত ছিল এক অন্তহীন, ঘন ক্রান্তীয় জলাভূমির জঙ্গলে: কার্বনিফেরাস যুগের কয়লা অরণ্য। চল্লিশ মিটার উঁচু বিশাল লাইকোপসিড গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন শোষণ করে পৃথিবীর অক্সিজেন স্তরকে এক অভাবনীয় চূড়ায়—৩৫ শতাংশে—পৌঁছে দিয়েছিল। এই অতি-অক্সিজেনসমৃদ্ধ আকাশে চিলের সমান ডানার দানব ফড়িং শিকার করে বেড়াত এবং মাটির নিচে হেঁটে যেত দুই মিটার লম্বা দানবাকৃতির শতপদী বিছা। কিন্তু ডাঙায় রাজত্ব করা সত্ত্বেও আদি মেরুদণ্ডী উভচর প্রাণীরা একটি অদৃশ্য শিকলে জলের সাথে বাঁধা ছিল: তা হলো তাদের অরক্ষিত, জেলিযুক্ত ডিম। এই শিকল ছিঁড়ে **জলনিরপেক্ষ অ্যামনিওটিক ডিম (Cleidoic Amniotic Egg)**-এর আবিষ্কার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চিরতরে জলের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিল এবং সূচনা করল সিন্যাপসিড ও ডায়াপসিডদের ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধের।

১. কার্বনিফেরাসের অতি-অক্সিজেন এবং দানব সন্ধিপদীদের বিস্তার

কার্বনিফেরাস যুগ (৩৫৯\text{–}২৯৯\text{ Ma}) ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় অধ্যায়। সুবিশাল ক্লাবমস (*Lepidodendron*) এবং হর্সটেইল উদ্ভিদের কাণ্ড শক্ত রাখতে আবির্ভূত হয়েছিল এক জটিল পলিমার—**লিগনিন (Lignin)**। বিবর্তনের সেই প্রাথমিক লগ্নে কাঠ পচানোর উপযোগী হোয়াইট-রট ছত্রাক (Basidiomycota) তখনও পৃথিবীতে জন্মায়নি। ফলে মরা গাছগুলো অ্যাসিডিক ও অক্সিজেনহীন জলাভূমির কাদার নিচে অবিকৃত অবস্থায় চাপা পড়ে তৈরি করল পৃথিবীর প্রধান কয়লার স্তর।

সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন তৈরি হলেও কাঠ পচনে কোনো অক্সিজেন ক্ষয় না হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা সাধারণ ২১% থেকে লাফিয়ে **৩৫%**-এ পৌঁছায়!

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১০.১: ভূ-রাসায়নিক অতি-অক্সিজেন এবং দানবাকৃতির আর্থ্রোপড। বামে: লিগনিন পচনের অভাবে কয়লা সৃষ্টির সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেনের ৩৫% চূড়া স্পর্শ করা। ডানে: ট্র্যাকিয়াল ব্যাপন প্রক্রিয়ার বলবিদ্যা—ফ্রগের সূত্র অনুযায়ী অক্সিজেনের আংশিক চাপ বৃদ্ধির ফলে মেগনিউরা (৭৫ সেমি ডানা) এবং আর্থ্রোপ্লিউরা (২.৬ মিটার দৈর্ঘ্য) দানবীয় আকার লাভ করতে পেরেছিল।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতো রক্তে হিমোগ্লোবিন দিয়ে অক্সিজেন পরিবহনের বদলে কীটপতঙ্গ ও সন্ধিপদীরা শ্বাস নেয় শরীরের ভেতরের আণুবীক্ষণিক নালিকা বা **ট্র্যাকিয়া (Trachea)**-র মাধ্যমে গ্যাসীয় ব্যাপন প্রক্রিয়ায়। অগাস্ট ফ্রগের ব্যাপন সূত্র অনুযায়ী:

$$L_{\text{crit}} \propto \sqrt{\frac{D \cdot \Delta P_{\text{O}_2}}{R}}$$

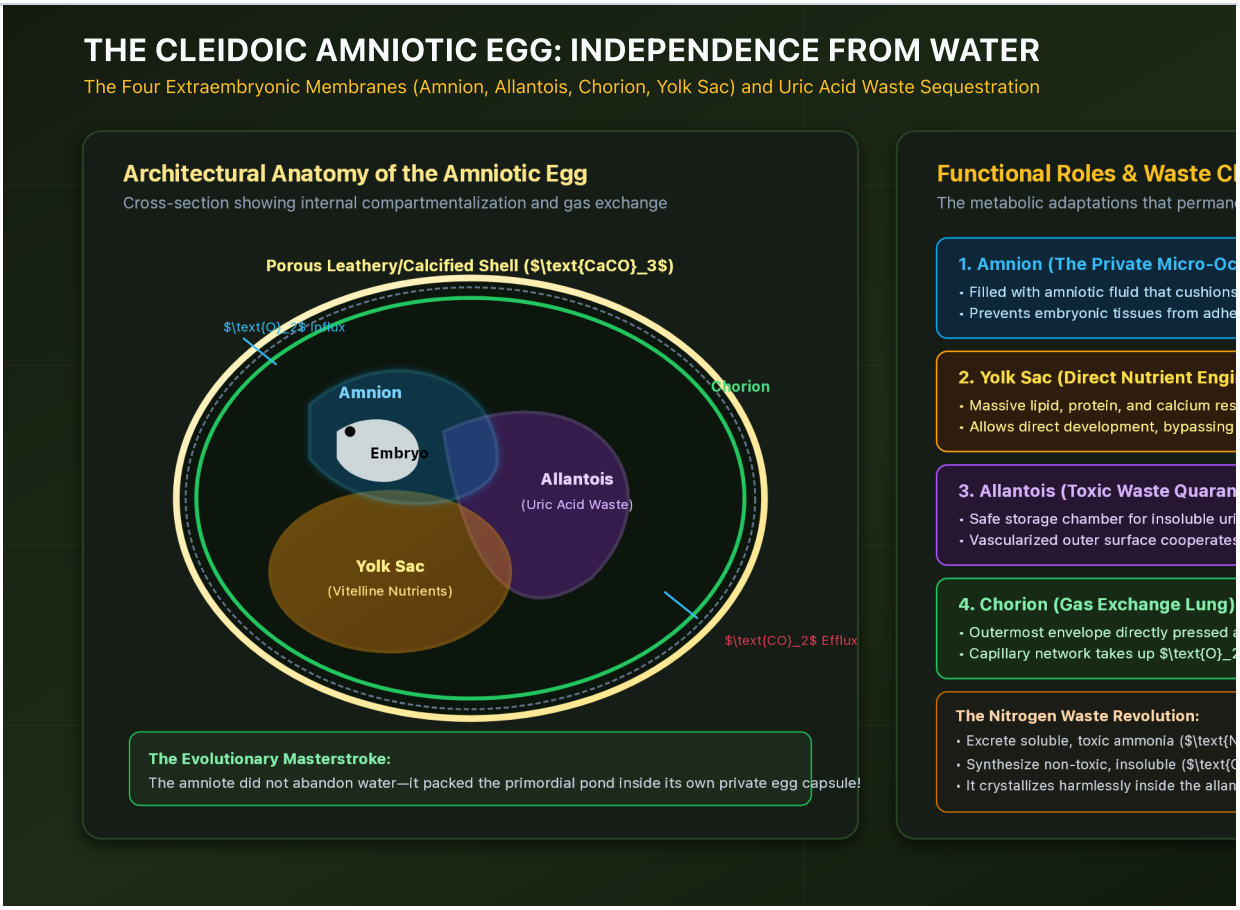
আধুনিক বাতাসে অক্সিজেনের চাপ কম থাকায় কয়েক সেন্টিমিটারের বেশি পুরু প্রাণীর ভেতরে অক্সিজেন পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু ৩৫% অক্সিজেনের চাপে বাতাসের আংশিক চাপ ৬৭% বেড়ে যাওয়ায় সন্ধিপদী প্রাণীরা দানবাকৃতি ধারণ করতে সক্ষম হয়:

- *মেগনিউরা (Meganeura monyi):* একটি বিশালাকার আদিম ফড়িং যার ডানার বিস্তার ছিল **৭৫ সেন্টিমিটার** (২.৫ ফুট)—একটি আধুনিক ঈগল বা চিলের সমান!
- *আর্থ্রোপ্লিউরা (Arthropleura armata):* একটি প্রকাণ্ড বর্মাবৃত শতপদী প্রাণী, যা লম্বায় ছিল **২.৬ মিটার** (৮.৫ ফুট) এবং ওজন ছিল ৫০ কেজিরও বেশি—পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম স্থলজ অমেরুদণ্ডী জীব!

২. অ্যামনিওটিক ডিমের মহাবিপ্লব: ভ্রূণের নিজস্ব ক্ষুদ্র সমুদ্র

উভচর প্রাণীরা স্থলভাগে শিকার করলেও তাদের প্রজননের একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা ছিল। তাদের ডিমের কোনো শক্ত খোসা নেই; বাতাস লাগলে তা দ্রুত শুকিয়ে ভ্রূণ মারা যায়। এছাড়া ভ্রূণ বর্জ্য হিসেবে নির্গমন করত অত্যন্ত বিষাক্ত **অ্যামোনিয়া (NH_3)**, যা ধুয়ে ফেলার জন্য প্রচুর জলের উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। ফলে উভচরদের সর্বদা জলের কাছে ফিরে যেতে হতো।

কার্বনিফেরাসের শেষভাগে ($\approx$ ৩১৫ Ma) মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্পন্ন করল: **জলনিরপেক্ষ অ্যামনিওটিক ডিম (Amniotic Egg)**। তারা মূলত জল ছেড়ে যায়নি, বরং *চারটি বিশেষ ভ্রূণীয় পর্দার ভেতরে আদিম সমুদ্রের জলকে একটি সুরক্ষিত ক্যাপসুলের মধ্যে বন্দি করে নিয়েছিল*:



চিত্র ১০.২: অ্যামনিওটিক ডিমের স্থাপত্য। প্রস্থচ্ছেদে প্রদর্শিত চারটি অপরিহার্য ভ্রূণীয় পর্দা: (১) অ্যামনিয়ন—ভ্রূণকে তরলপূর্ণ নিজস্ব পুকুরে সুরক্ষিত রাখা; (২) ইয়র্ক স্যাক—উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ কুসুমের আধার; (৩) অ্যালানটয়িস—বিষাক্ত ইউরিক অ্যাসিড বর্জ্যের প্রকোষ্ঠ; (৪) কোরিয়ন—ছিদ্রযুক্ত খোসার মধ্য দিয়ে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড আদান-প্রদানকারী ফুসফুস।

1. **অ্যামনিয়ন (Amnion):** সরাসরি ভ্রূণকে ঘিরে রাখা একটি স্বচ্ছ তরলপূর্ণ থলি। এই অ্যামনিওটিক তরল ভ্রূণকে মাধ্যাকর্ষণের চাপ এবং বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে ঠিক যেমন জল গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করে।
2. **ইয়র্ক স্যাক বা কুসুম থলি (Yolk Sac):** উচ্চমাত্রার স্নেহ ও প্রোটিন সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এটি ভ্রূণকে এতটাই পুষ্ট করে যে ডিম ফুটে সরাসরি একটি সম্পূর্ণ গঠিত বাচ্চা বেরিয়ে আসে—কোনো অরক্ষিত ব্যাঙাচি দশার প্রয়োজন হয় না।
3. **অ্যালানটয়িস (Allantois):** ভ্রূণের অন্ত্র থেকে বের হওয়া একটি বিশেষ থলি, যা যাবতীয় ক্ষতিকর রেচন বর্জ্য জমা রাখার সুরক্ষিত গুদাম হিসেবে কাজ করে।
4. **কোরিয়ন (Chorion):** সবচেয়ে বাইরের পর্দা, যা পুরো ভ্রূণীয় ব্যবস্থাকে ঢেকে রাখে। খোসার ঠিক নিচে অবস্থান করে এর রক্তজালক পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়।

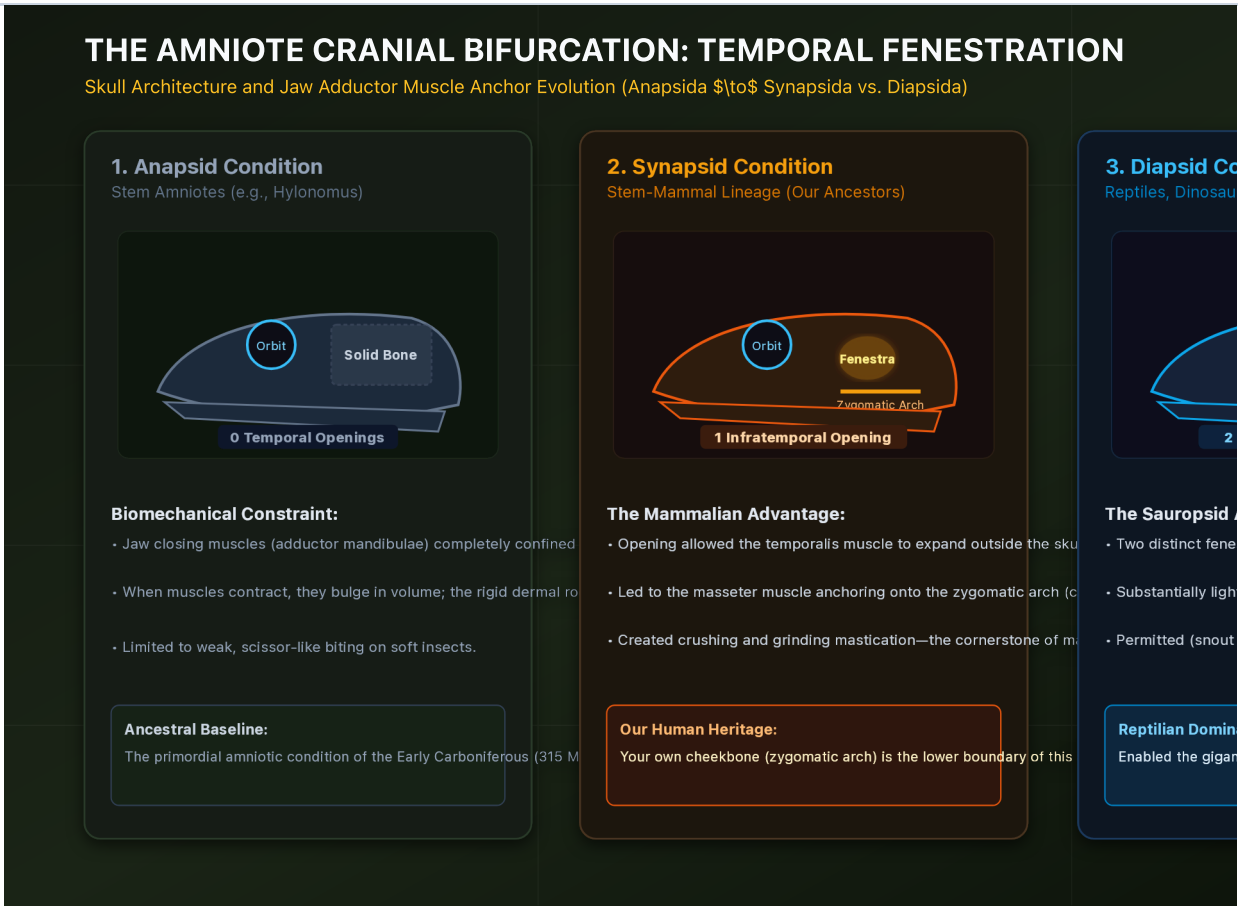
ইউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিপ্লব

বদ্ধ খোসার ভেতর বেঁচে থাকার জন্য অ্যামনিওট প্রাণীরা বিষাক্ত অ্যামোনিয়া ত্যাগের বদলে উদ্ভাবন করল **ইউরিক অ্যাসিড** ($C_5H_4N_4O_3$)। ইউরিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ অবিষাক্ত এবং জলে অদ্রবণীয়। এটি সাদা দানাদার ক্রিস্টাল হিসেবে অ্যালানটয়িসের ভেতরে জমা থাকে—এক ফোঁটা মূল্যবান জলও নষ্ট না করে! শক্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) খোসা এবং এই চার পর্দার বলে মেরুদণ্ডীরা জলের দাসত্ব থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করল।

৩. খুলির স্থাপত্যের মহাবিভাজন: সিন্যাপসিড বনাম ডায়াপসিড

অ্যামনিওটিক ডিমের জন্মের প্রায় সাথে সাথেই আদি অ্যামনিওটরা চোখের পেছনের খুলির হাড়ের ছিদ্র বা **টেম্পোরাল ফেনেস্ট্রা (Temporal Fenestra)**-র ভিত্তিতে দুটি প্রধান যুদ্ধংদেহী সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়:

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১০.৩: অ্যামনিওটার মাথার খুলির দ্বিধাবিভক্তি। (১) অ্যানাপসিড—নিশ্ছিদ্র নিরেট খুলি (আদি অ্যামনিওট হাইলোনোমাস); (২) সিন্যাপসিড—চোখের নিচে একটি একক নিম্ন টেম্পোরাল ছিদ্র ও জাইগোম্যাটিক আর্চ (স্তন্যপায়ী বংশলতিকা); (৩) ডায়াপসিড—উচ্চ ও নিম্ন দুটি স্বতন্ত্র ছিদ্রযুক্ত হালকা অথচ মজবুত খুলি (সরীসৃপ, ডাইনোসর ও পাখি)।

১. অ্যানাপসিড রূপ (Anapsid: কোনো ছিদ্র নেই)

প্রাচীনতম অ্যামনিওট *হাইলোনোমাস (Hylonomus)*-এর খুলিতে চোখের পেছনে কোনো ছিদ্র ছিল না। সম্পূর্ণ নিরেট হাড়ের বাক্সের ভেতরে চোয়াল বন্ধ করার পেশীগুলো আবদ্ধ থাকায় এদের কামড়ের শক্তি ছিল খুবই সীমিত।

২. সিন্যাপসিড শাখা (Synapsid: একটি নিম্ন ছিদ্র) — আমাদের পূর্বপুরুষ

কার্বনিফেরাসের শেষের দিকে একদল প্রাণীর খুলির চোখের পেছনে নিচে একটি একক ছিদ্র আবির্ভূত হলো—এরাই হলো **ক্লাস সিন্যাপসিডা (Synapsida)** বা স্তন্যপায়ীদের আদি পূর্বপুরুষ।

এই একক ছিদ্রের কারণে চিবানোর প্রধান পেশী *টেম্পোরালিস* খুলির বাইরে প্রসারিত হয়ে মাথার উপরের হাড়ে নোঙর করতে পারল এবং ছিদ্রের নিচের হাড়টি রূপান্তরিত হলো আমাদের গালের হাড় বা **জাইগোম্যাটিক আর্চ (Zygomatic Arch)**-এ। এর ফলে চোয়ালে তৈরি হলো ঘষে ঘষে খাবার চিবানোর ক্ষমতা—যা পরবর্তীতে স্তন্যপায়ীদের উষ্ণ রক্ত ও উচ্চ বিপাকীয় শক্তির ভিত্তি তৈরি করে।

৩. ডায়াপসিড শাখা (Diapsid: দুটি জোড়া ছিদ্র) — সরীসৃপ ও ডাইনোসর

দ্বিতীয় প্রধান শাখা **ডায়াপসিডা (Diapsida)** চোখের পেছনে উপরে ও নিচে দুটি স্বতন্ত্র ছিদ্র তৈরি করল। এই দ্বৈত জানালা খুলির সামগ্রিক ওজনকে অবিশ্বাস্য রকম হালকা করে দিল কিন্তু হাড়ের কাঠামোগত শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখল। এই নকশাই পরবর্তীতে ডাইনোসরদের বিশালাকার হালকা খুলি এবং পাখিদের নমনীয় ঠোঁটের বায়োমেকানিক্সের জন্ম দেয়।

কার্বনিফেরাস যুগের সমাপ্তির সাথে সাথে জলবায়ু শুষ্ক হতে শুরু করল এবং কয়লা জলাভূমিগুলো শুকিয়ে গেল। জলকাদায় আবদ্ধ প্রাচীন উভচররা পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু অ্যামনিওটিক ডিম আর শক্তিশালী সিন্যাপসিড চোয়াল নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রস্তুত হলো নতুন এক যুগ বিজয়ের জন্য: পার্মিয়ান যুগ।

❦

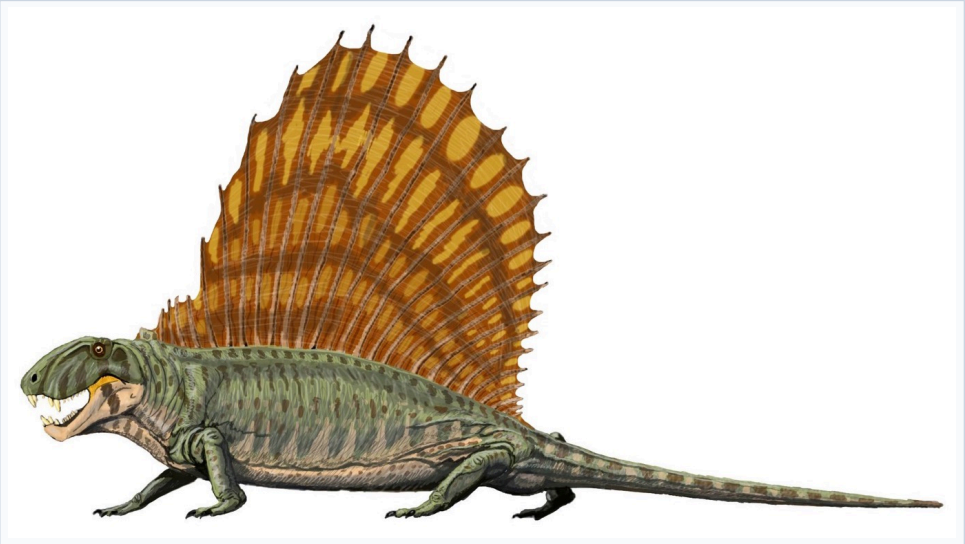
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কার্বনিফেরাস উভচর সাম্রাজ্য এবং জলনিরপেক্ষ অ্যামনিওটিক ডিমের বিপ্লব"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১০। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-10-the-carboniferous-amphibian-world-and-amniotic-egg-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • একাদশ খণ্ড

সিন্যাপসিডদের বিশ্বজয় এবং পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাপ্রলয়

সিন্যাপসিডদের বিশ্বজয় এবং পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাপ্রলয়

1,124 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১১: *চিত্র: স্তন্যপায়ীর পূর্বপুরুষ সিনাপসিড ডাইমেট্রোডন (Dimetrodon grandis, ~২৭৫ মিলিয়ন বছর আগে), পারমিয়ান প্লাবনভূমিতে রোদ পোহাচ্ছে; দৃশ্যমান রক্তনালীযুক্ত পিঠের পাল এবং বিভিন্ন ধরণের দাঁত।*

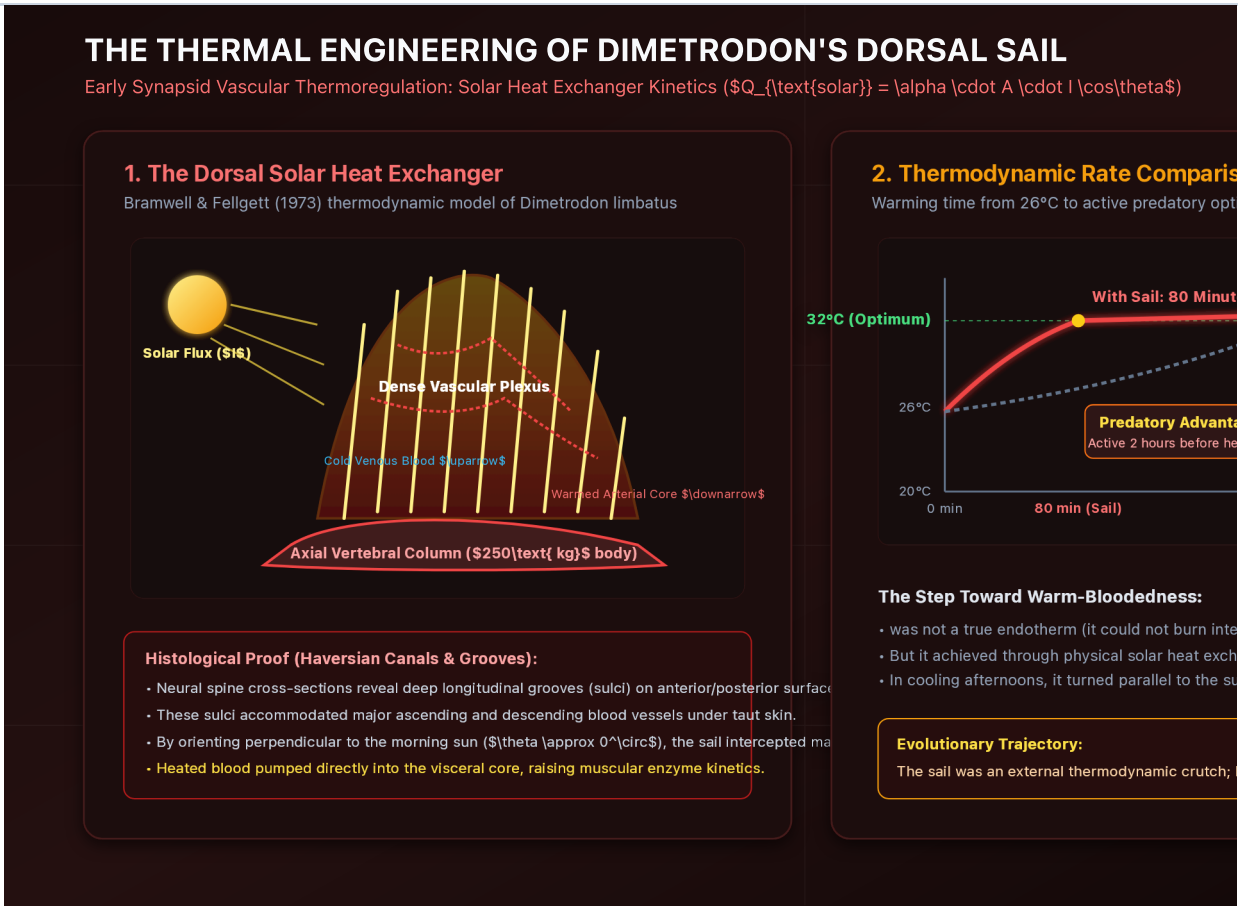
আজ থেকে ২৯০ মিলিয়ন বছর পূর্বে, প্যানজিয়া সুপারমহাদেশে প্রথম ডাইনোসরের পদচিহ্ন পড়ার বহু কোটি বছর আগে, পৃথিবীর স্থলভাগ শাসন করত আমাদের সরাসরি পূর্বপুরুষেরা—স্তন্যপায়ী বংশের আদি পিতা **সিন্যাপসিড (Synapsida)** দল। পিঠের ওপর বিশালাকার পাল উড়িয়ে সৌরশক্তি শোষণকারী *ডাইমেট্রোডন* থেকে শুরু করে খরগোশের মতো লোমশ ও শিকারী দাঁতযুক্ত সাইনোডন্ট—তারা পৃথিবীর বুকে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছিল। কিন্তু পার্মিয়ান ও ট্রায়াসিক যুগের সীমারেখায় (২৫১.৯ Ma) পৃথিবী তার ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার ও প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলো: সাইবেরিয়ান ট্র্যাপসের অগ্ন্যুৎপাত। মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর ৯৬% সামুদ্রিক প্রজাতি এবং ৭০% স্থলজ মেরুদণ্ডী পরিবার চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—সংঘটিত হলো ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপ্রলয় (The Great Dying)।

১. সৌর তাপীয় প্রকৌশল: ডাইমেট্রোডনের পিঠের পালের রহস্য

জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে *ডাইমেট্রোডন*-কে ভুলবশত প্রায়ই ডাইনোসর বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, প্রথম ডাইনোসর জন্মানোর ৪০ মিলিয়ন বছর আগেই ডাইমেট্রোডন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; এবং সম্পর্কের দিক থেকে এটি ডাইনোসরের চেয়ে মানুষের বহু গুণ নিকটাত্মীয়! এরা ছিল আদিম স্টেম-ম্যামালদের পেলিকোসর (Pelycosauria) দলের অন্তর্ভুক্ত।

ডাইমেট্রোডন-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো তার পিঠের মেরুদণ্ড থেকে খাড়া উঠে যাওয়া ১.৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ কাঁটার সমন্বয়ে গঠিত বিশাল চামড়ার পাল। বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীদের বিতর্ক ছিল এটি নিছক আত্মরক্ষা নাকি যৌন আকর্ষণের অঙ্গ ছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে সি. ডি. ব্রামওয়েল এবং পি. বি. ফেলগেট প্রমাণ করেন যে, এই পালটি ছিল মূলত একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন **সৌর তাপ সংগ্রাহক বা হিট এক্সচেঞ্জার**।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১১.১: ডাইমেট্রোডনের সৌর তাপীয় ইঞ্জিন। বামে: পিঠের পালের কঙ্কাল ও গভীর রক্তনালীর খাঁজ, যা দিয়ে ঠান্ডা রক্ত উপরে উঠে উষ্ণ হয়ে দেহে ফিরে আসত। ডানে: তাপ বৃদ্ধির লেখচিত্র—২৫০ কেজি ওজনের ডাইমেট্রোডন মাত্র ৮০ মিনিটে সক্রিয় শিকারী তাপমাত্রা (৩২° সে.) অর্জন করত, যা পালহীন শীতল রক্তের প্রাণীদের চেয়ে ১২৫ মিনিট আগে শিকার করার বিশাল সুবিধা দিত।

কাঁটাগুলোর আণুবীক্ষণিক প্রস্থচ্ছেদে দেখা গেছে, প্রতিটি হাড়ের গায়ে ছিল গভীর অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ (Sulci), যার ভেতর দিয়ে প্রধান ধমনী ও শিরা চামড়ার নিচে বিস্তৃত রক্তজালকে রক্ত সরবরাহ করত।

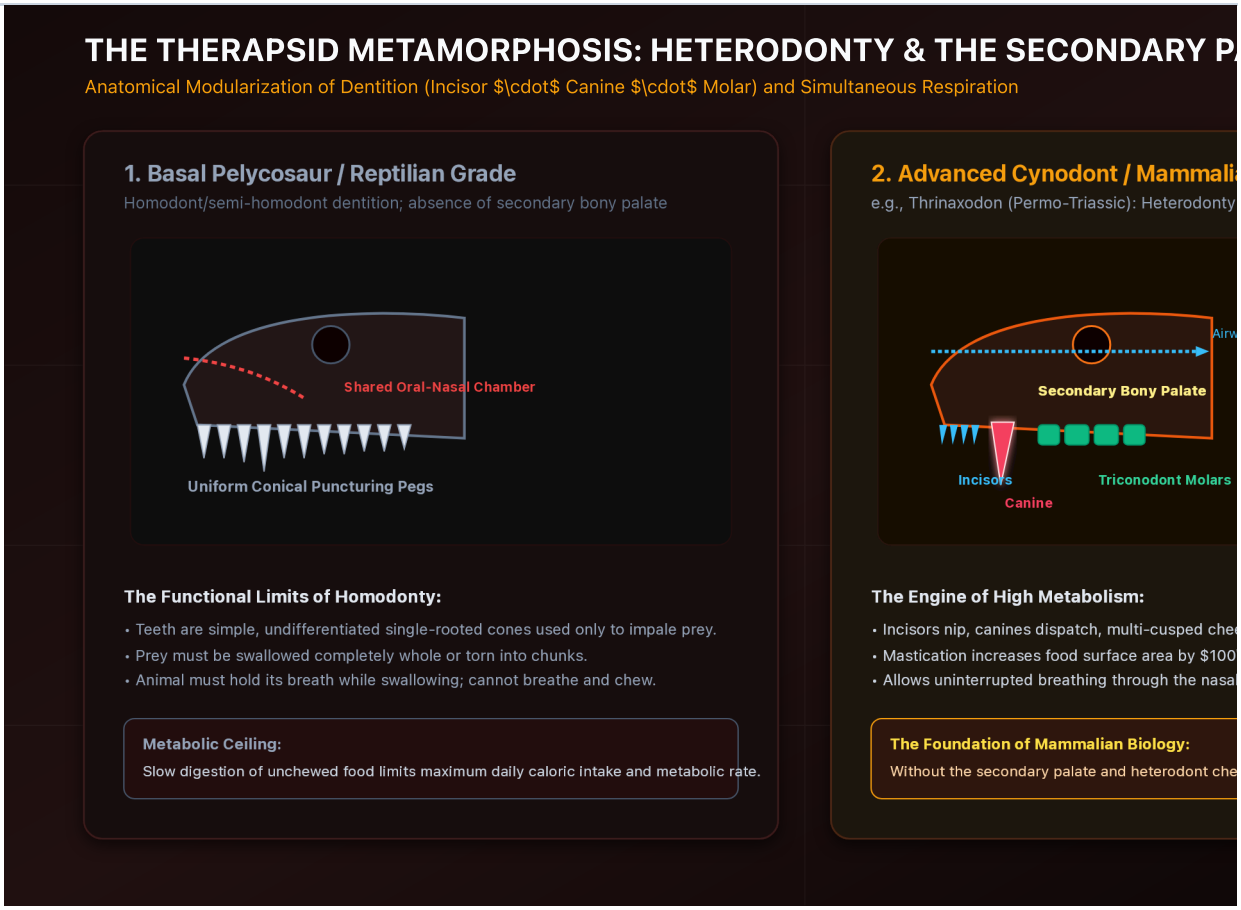
সকালে যখন সূর্য উঠত, ডাইমেট্রোডন সূর্যের দিকে ৯০ ডিগ্রি কোণে নিজের পালটিকে আড়াআড়িভাবে মেলে ধরত ($Q_{\text{solar}} = \alpha \cdot A \cdot I \cos\theta$)। এর ফলে রক্ত দ্রুত উষ্ণ হয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ড ও মাংসপেশিতে ছড়িয়ে পড়ত। ২৫০ কেজি ওজনের একটি ডাইমেট্রোডনের শরীর শিকারের উপযোগী ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৌঁছাতে লাগত মাত্র **৮০ মিনিট**; যেখানে পালহীন অন্য সমওজনের সরীসৃপদের একই তাপমাত্রা ছুঁতে লাগত **২০৫ মিনিট**!

এই তাপীয় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ডাইমেট্রোডন প্রতিদিন সকালে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় পেত যখন সে ছিল পুরোপুরি ক্ষিপ্র ও শক্তিশালী, আর তার শিকার তৃণভোজী প্রাণীরা সকালের ঠান্ডায় জমে অসাড় হয়ে পড়ে থাকত!

২. থেরাপসিডদের রূপান্তর: হেটেরোডন্ট দাঁত এবং সেকেন্ডারি প্যালেট

মধ্য পার্মিয়ানে পেলিকোসরদের স্থান দখল করল আরো উন্নত একদল প্রাণী—**থেরাপসিড (Therapsida)**, যাদের উত্তরসূরি সাইনোডন্টরাই সরাসরি আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্ম দিয়েছে।

আদিম প্রাণীদের সব দাঁত ছিল একই রকম সরল পেরেকের মতো (হোমোডন্ট—যা কেবল শিকারকে আটকে রাখতে পারে)। কিন্তু থেরাপসিডরা জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাঁতের বিপ্লব ঘটাল—**হেটেরোডন্টী (Heterodonty)** বা কাজের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা রূপের দাঁত:



চিত্র ১১.২: স্তন্যপায়ীদের চিবানোর কঙ্কালের জন্ম। বামে: আদি পেলিকোসরের অবিভক্ত পেরেকের মতো দাঁত এবং বাতাস ও খাবারের অভিন্ন গহ্বর। ডানে: উন্নত সাইনোডন্ট (থ্রিনাক্সোডন)—কর্তন দাঁত (Incisor), রক্ত বের করার শ্বাঁদাত (Canine), চিবানোর ট্রাইকোনোডন্ট মাড়ির দাঁত (Molar) এবং মুখের খাবার চিবানোর সময় অবিরাম শ্বাস নেওয়ার সেকেন্ডারি প্যালেট।

- **ইনসাইজর (Incisors / কর্তন দাঁত):** মুখের সামনের ধারালো ছেনির মতো দাঁত, যা মাংসের টুকরো ছিঁড়তে বা গাছের পাতা কাটতে ব্যবহৃত হতো।
- **ক্যানাইন (Canines / শ্বাঁদাত):** প্রকাণ্ড, লম্বা ও ছুরির মতো ধারালো দাঁত, যা শিকারের গলার প্রধান ধমনীতে বিধ্বংসী কামড় বসাতে সাহায্য করত। *ইনোস্ট্রান্সেভিয়া*-র মতো শিকারীদের ক্যানাইন ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতো!
- **মোলার ও প্রিমোলার (Postcanines / মাড়ির দাঁত):** চিবানোর খাঁজযুক্ত চওড়া দাঁত। খাবার আস্ত গিলে ফেলার বদলে এরা মুখের ভেতরেই তা চিবিয়ে মণ্ড বানাতে পারত, যা পাচক এনজাইমের কার্যক্ষমতা ১০০ গুণ বাড়িয়ে দিত।

সেকেন্ডারি প্যালেট: খাবার চিবানোর সময় অবিরাম শ্বাস নেওয়া

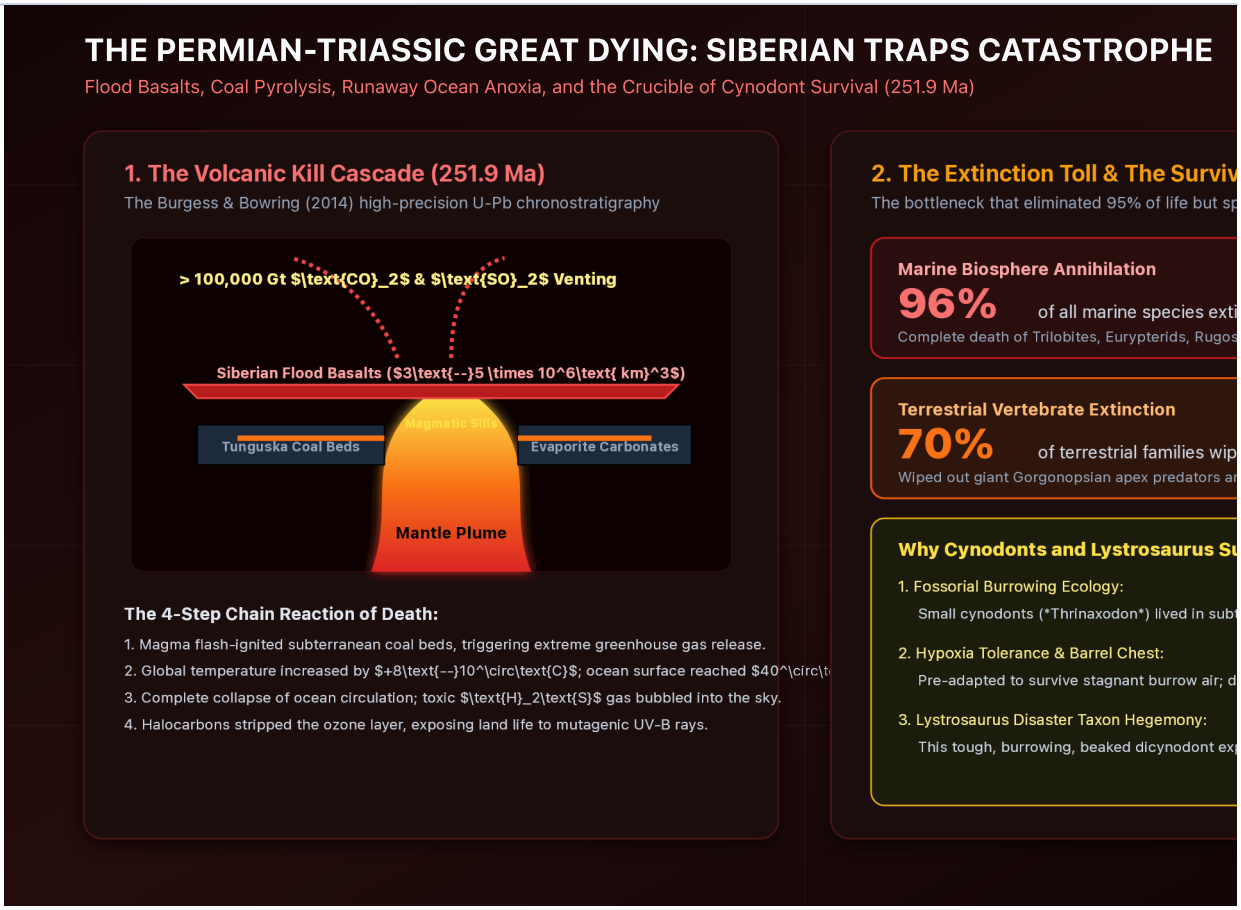
মুখভর্তি খাবার চিবানোর একটি মারাত্মক অসুবিধা আছে: খাবার মুখে থাকলে বাতাস ফুসফুসে পৌঁছাবে কীভাবে? টিকটিকি ও কুমিরের কোনো আলাদা তালু না থাকায় খাবার গেলার সময় তাদের শ্বাস বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু উন্নত সাইনোডন্টরা (যেমন *Thrinaxodon*) আবিষ্কার করল **সেকেন্ডারি বনি প্যালেট (Secondary Bony Palate)** বা হাড়ের শক্ত ছাদ।

এই প্যালেটটি মুখগহ্বর থেকে নাকের বায়ু চলাচলের পথকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল। ফলে প্রাণীটি মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাবার চিবানো অবস্থাতেও নাক দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ফুসফুসে বাতাস গ্রহণ করতে পারত! এই অবিরাম অক্সিজেন সরবরাহ ছাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উষ্ণ রক্ত ও উচ্চ বিপাকীয় ক্ষমতা অর্জন কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

৩. সাইবেরিয়ান ট্র্যাপস এবং পার্মিয়ান মহাপ্রলয়

২৫৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে যখন সিন্যাপসিডরা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে, ঠিক তখনই শুরু হলো পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়। উত্তর সাইবেরিয়ার নিচে ভূ-অভ্যন্তরের গভীর ম্যান্টল প্লুম থেকে লাভা উদগিরণ শুরু হলো—যার পরিমাণ ছিল **৩০ থেকে ৫০ লক্ষ ঘন কিলোমিটার ব্যাসাল্টিক লাভা**: যা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে দুই কিলোমিটার পুরু লাভার নিচে ডুবিয়ে দেওয়ার সমান!

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১১.৩: পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাপ্রলয়ের চেইন রিঅ্যাকশন। বামে: ম্যান্টল প্লুমের লাভা ভূগর্ভস্থ তুঙ্গুস্কা কয়লা স্তর পুড়িয়ে ১,০০,০০০ গিগাটনের বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করে। ডানে: সামুদ্রিক ৯৬% ও স্থলজ ৭০% পরিবারের চিরতরে নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং মাটির নিচের গর্তে বাস করে সাইনোডন্ট ও লিস্টিরোসরাসের টিকে থাকার কৌশল।

তুঙ্গুস্কার কয়লা খনিতে অগ্নিকাণ্ড

কেবল লাভার উত্তাপ পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করেনি; আসল বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটেছিল মাটির নিচে। সাইবেরিয়ার সেই অঞ্চলের ভূগর্ভে ছিল বিশ্বের বৃহত্তম **তুঙ্গুস্কা কয়লা ও তেলের খনি**। ম্যাগমা সেই কয়লা স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় কয়লা পুড়ে কোটি কোটি টন বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হলো।

মাত্র ৬০,০০০ বছরের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হলো **এক লক্ষ গিগাটনেরও বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও সালফার ডাই-অক্সাইড**:

1. **ভয়াবহ উষ্ণায়ন:** বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর মাত্রা ৩,০০০ পিপিএম ছাড়িয়ে গেল। বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেল। নিরক্ষীয় সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা দাঁড়াল ৪০° সেলসিয়াস (১০৪°F)—যা প্রোটিন জমাট বাঁধার কাছাকাছি!
2. **মহাসাগরের অ্যাসিডিক মৃত্যু ও অ্যানোক্সিয়া:** উষ্ণ জল পর্যাপ্ত অক্সিজেন ধরে রাখতে পারে না। ফলে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের জলস্তর সম্পূর্ণ অক্সিজেনহীন (Anoxic) হয়ে পড়ল এবং অ্যাসিডের মাত্রায় প্রবাল ও শামুক-ঝিনুক গলে যেতে লাগল।
3. **বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড মেঘ:** অক্সিজেনহীন সমুদ্রে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বিস্ফোরক রূপ নিল। তারা কোটি কোটি টন বিষাক্ত **হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)** গ্যাস তৈরি করল। সমুদ্রের জল বেগুনি রঙ ধারণ করল এবং সেই বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে উঠে এসে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে দিল।

৪. টিকে থাকার অগ্নিপরীক্ষা: সাইনোডন্ট এবং লিস্টিরোসরাস

মহাপ্রলয়ের ধ্বংসযজ্ঞ ছিল সর্বগ্রাসী। **সমুদ্রের ৯৬% প্রজাতি** চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল—ক্যামব্রিয়ান থেকে টিকে থাকা ট্রাইলোবাইটরা আর কখনোই ফিরল না। স্থলভাগের **৭০% মেরুদণ্ডী পরিবার** পৃথিবী থেকে মুছে গেল।

কিন্তু এই ভস্মীভূত ট্রায়াসিক সকালে আমাদের সিন্যাপসিড বংশলতিকার দুটি অসাধারণ শাখা টিকে রইল:

- **গর্তে বাসকারী সাইনোডন্ট:** *থ্রিনাক্সোডন (Thrinaxodon)*-এর মতো ক্ষুদ্র সাইনোডন্টরা মাটির গভীরে জটিল সুড়ঙ্গ তৈরি করে বাস করত। মাটির নিচের ঠান্ডা পরিবেশ তাদের চরম উত্তাপ, অ্যাসিড বৃষ্টি ও বিষাক্ত বাতাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এছাড়া তাদের ড্রাফ্রাম ও উন্নত ফুসফুস অল্প অক্সিজেনের বাতাসেও তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারত।
- **লিস্টিরোসরাসের অবিশ্বাস্য রাজত্ব:** তৃণভোজী ডাইসাইনোডন্ট *লিস্টিরোসরাস (Lystrosaurus)*—একটি শূকরের সমান আকৃতির শক্তপোক্ত খননকারী প্রাণী—এমন এক অবিশ্বাস্য জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটাল যা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। সব শিকারী মারা যাওয়ায় প্রারম্ভিক ট্রায়াসিকে পৃথিবীর সমগ্র স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের **৯৫ শতাংশই ছিল একক এই লিস্টিরোসরাস গণের অন্তর্ভুক্ত!**

আমাদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে ওঠা নতুন ট্রায়াসিক যুগে তাদের মুখোমুখি হতে হবে এক নতুন ও চটপটে প্রতিদ্বন্দ্বীর—যাদের নাম আর্কোসর (Archosauria), যাদের হাত ধরেই শুরু হতে চলেছে ডাইনোসরদের বিশ্ববিজয়ের মহাকাব্য।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সিন্যাপসিডদের বিশ্বজয় এবং পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাপ্রলয়"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১১। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-11-the-synapsid-hegemony-and-permian-extinction-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বাদশ খণ্ড

আর্কোসরদের জয়যাত্রা — ডাইনোসর সাম্রাজ্য, টেরোসর এবং পাখির বিবর্তন

আর্কোসরদের জয়যাত্রা — ডাইনোসর সাম্রাজ্য, টেরোসর এবং পাখির বিবর্তন

1,106 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



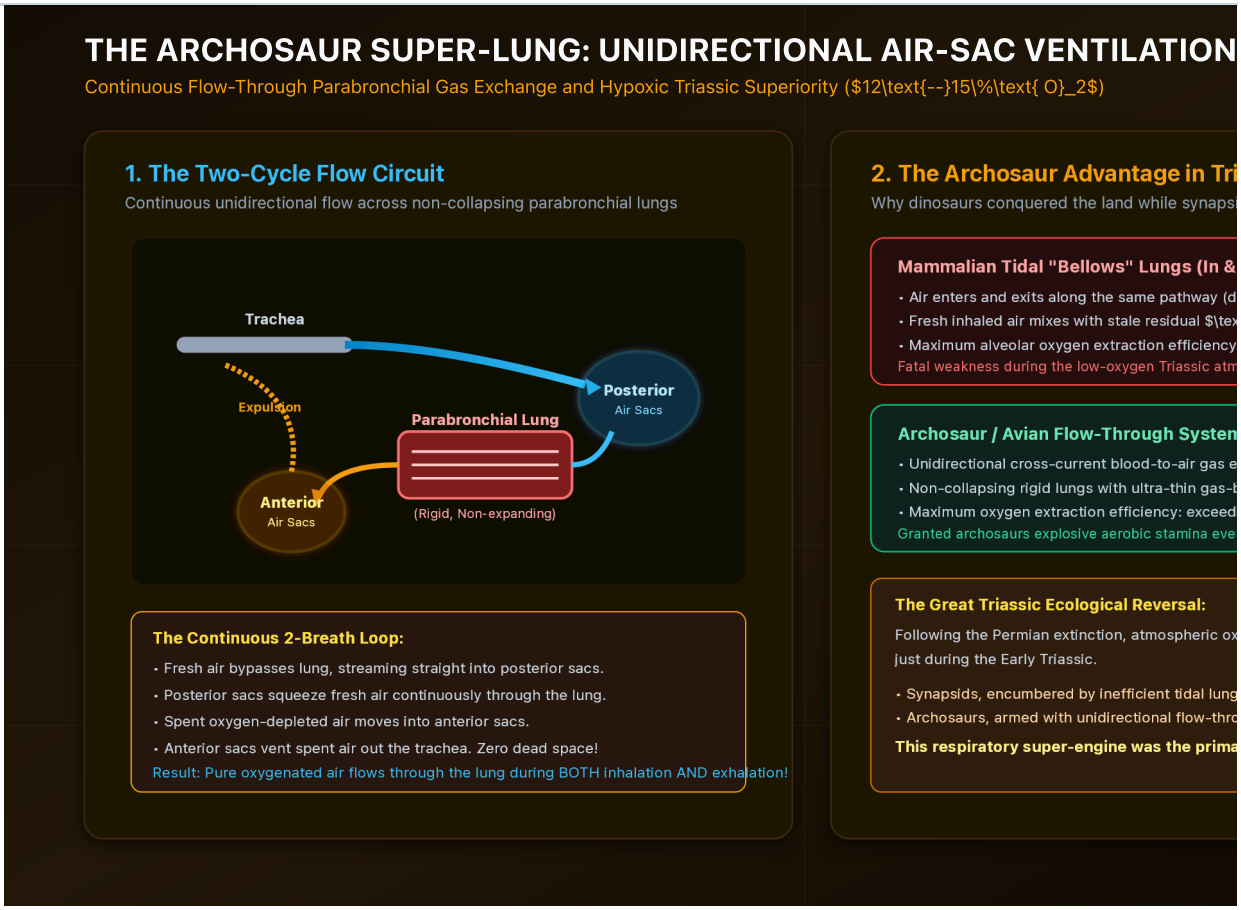
চিত্র ১২: *চিত্র: লেট ক্রিটেশিয়াস বনাঞ্চলে পালকযুক্ত ড্রমিয়োসরিড ডাইনোসর (Velociraptor / Deinonychus), যা ডানায় বাস্তবসম্মত পাখির পালক, বাইনোকুলার দৃষ্টি এবং শিকারী নখর প্রদর্শন করছে।*

প্রায় একশত ষাট মিলিয়ন বছর ধরে—ট্রায়াসিক যুগের সূচনা থেকে শুরু করে ক্রিটেশিয়াস যুগের শেষভাগের উল্কাপাত পর্যন্ত—মেসোজোয়িক মহাযুগ ছিল এক অপরাজেয় সরীসৃপ গোষ্ঠীর সাম্রাজ্য: আর্কোসর (Archosauria) বা "শাসক সরীসৃপ"। সাধারণ মানুষের চোখে ডাইনোসররা তাদের দানবীয় আকার, তীক্ষ্ণ নখ আর ভয়াল দাঁতের জন্য পরিচিত হলেও তাদের বিশ্বজয়ের আসল জৈবিক চাবিকাঠি লুকিয়ে ছিল তাদের বুকের খাঁচায়: একমুখী বায়বীয় ফুসফুস ও এয়ার-স্যাকের (Air Sac) অবিশ্বাস্য শ্বাসযন্ত্র। এই শ্বাসযন্ত্রীয় বিপ্লবই ৭০ টনের সরোপড ডাইনোসরদের হালকা অথচ ইস্পাত-কঠিন কঙ্কাল নির্মাণের শক্তি জুগিয়েছিল, চালিত করেছিল শিকারী থেরোপডদের এবং তাদের আদিম লোমশ পালককে রূপান্তরিত করেছিল পাখির নিখুঁত উড়ন্ত ডানায়।

১. একমুখী এয়ার-স্যাক শ্বাসযন্ত্রের মহাবিপ্লব

পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা কার্বনিফেরাসের ৩০% থেকে এক ধাক্কায় মাত্র **১২ থেকে ১৫ শতাংশে** নেমে আসে—যা আজকের দিনে এভারেস্ট পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে শ্বাস নেওয়ার সমান! এই চরম অক্সিজেনহীন পৃথিবীতে আমাদের স্তন্যপায়ী পূর্বপুরুষরা তাদের আদিম ফুসফুসের কারণে চরম বিপর্যয়ে পড়ে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ফুসফুসে বাতাস একই পথ দিয়ে ঢোকে ও বের হয় (Tidal Breathing), ফলে নতুন প্রবেশ করা বাতাসের সাথে আগের কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত বাসি বাতাস মিশে যায় এবং অক্সিজেনের কার্যক্ষমতা মাত্র ২৫%-এ সীমাবদ্ধ থাকে।

কিন্তু আর্কোসররা আবিষ্কার করল এক অসাধারণ **একমুখী প্রবাহমান শ্বাসযন্ত্র (Unidirectional Air-Sac System)**—যা আধুনিক পাখিদের মাঝে আজও কার্যকর রয়েছে:



চিত্র ১২.১: আর্কোসরদের অবিরাম একমুখী শ্বাসযন্ত্র। বামে: দুই-শ্বাসের সমন্বিত চক্র—শ্বাস গ্রহণের সময় বাতাস সরাসরি পেছনের এয়ার-স্যাকে প্রবেশ করে, প্রশ্বাসের সময় প্যারাব্রঙ্কিয়াল ফুসফুসের মধ্য দিয়ে একমুখীভাবে প্রবাহিত হয়, সামনের স্যাকে জমা হয় এবং বের হয়ে যায়। ডানে: অক্সিজেন গ্রহণের তুলনা যা দেখায় ট্রায়াসিক যুগে (১২% অক্সিজেন) স্তন্যপায়ীদের জোয়ার-ভাটা ফুসফুসের চেয়ে ডাইনোসরদের ফুসফুস দ্বিগুণেরও বেশি কার্যকর ছিল।

এই শ্বাসযন্ত্রটি **দুটি পূর্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের সমন্বয়ে** একটি নিরবচ্ছিন্ন চক্র তৈরি করে:

1. **প্রথম শ্বাস গ্রহণ:** বাতাস ফুসফুসকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি শরীরের পেছনের **পোস্টেরিয়র এয়ার-স্যাকে** চলে যায়।
2. **প্রথম শ্বাস ত্যাগ:** পেছনের এয়ার-স্যাক সংকুচিত হয়ে তাজা বাতাসকে একমুখী স্রোতের মতো **প্যারাব্রঙ্কিয়াল ফুসফুসের** ভেতর দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। এখানে রক্তের কৈশিক জালিকা বাতাসের বিপরীত মুখে প্রবাহিত হয়ে সর্বাধিক অক্সিজেন শোষণ করে নেয়।
3. **দ্বিতীয় শ্বাস গ্রহণ:** নতুন বাতাস যখন আবার পেছনের স্যাকে ঢোকে, তখন ফুসফুসের ব্যবহৃত বাতাসটি টেনে নেওয়া হয় সামনের **অ্যান্টেরিয়র এয়ার-স্যাকে**।
4. **দ্বিতীয় শ্বাস ত্যাগ:** সামনের এয়ার-স্যাক সংকুচিত হয়ে ব্যবহৃত দূষিত বাতাসকে শ্বাসনালী দিয়ে বাইরে বের করে দেয়।

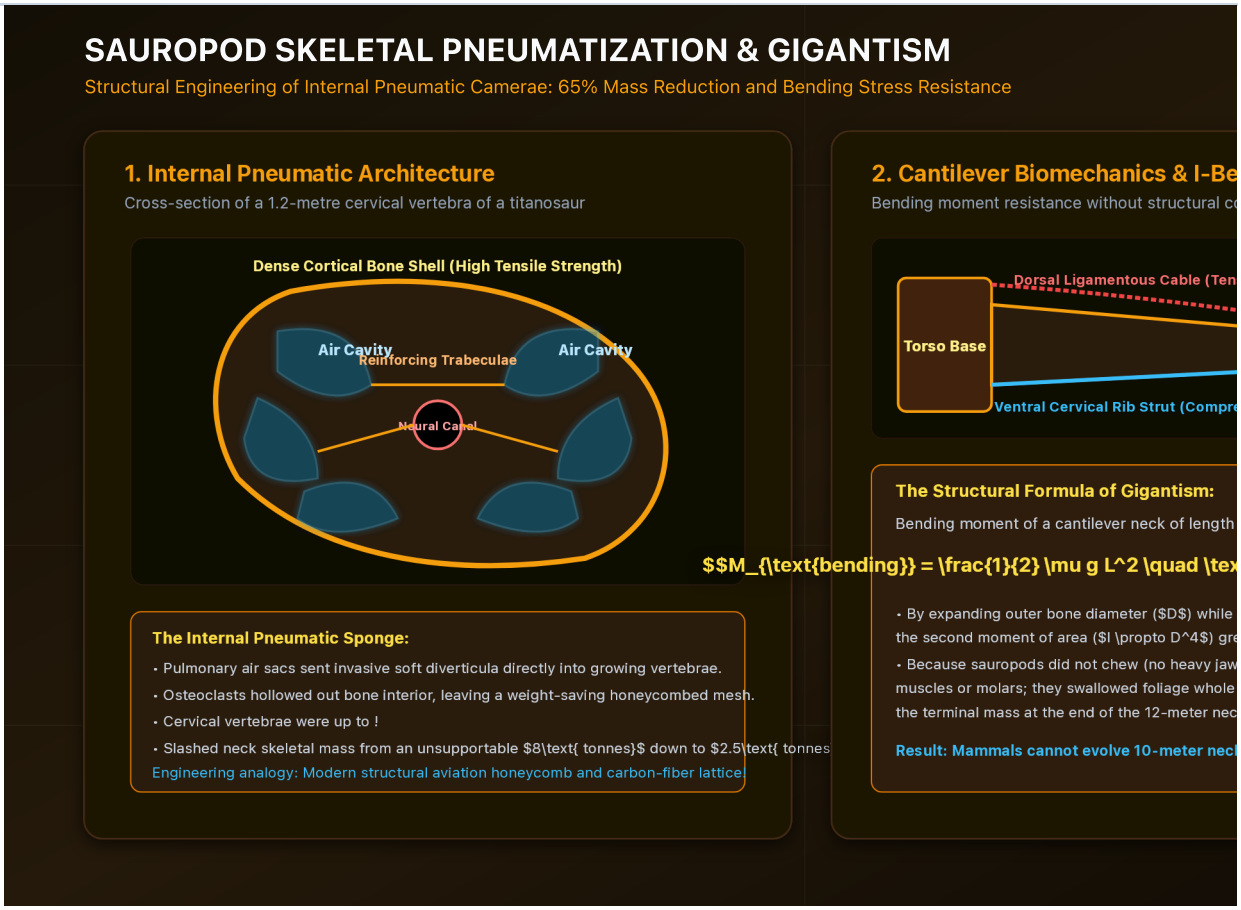
এর সবচেয়ে বড় অলৌকিকত্ব হলো: *শ্বাস গ্রহণ এবং ত্যাগ—উভয় অবস্থাতেই ফুসফুসের মধ্য দিয়ে অবিরাম খাঁটি বাতাস প্রবাহিত হয়!* কোনো বাসি বাতাসের অবশিষ্টাংশ থাকে না এবং অক্সিজেনের শোষণ ক্ষমতা **৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়**। এই অবিশ্বাস্য অ্যারোবিক স্ট্যামিনার কারণেই ডাইনোসররা ট্রায়াসিকের পাতলা বাতাসেও প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে পারত এবং স্তন্যপায়ীদের তাড়িয়ে মেসোজোয়িক সাম্রাজ্য নিজেদের দখলে নিয়েছিল।

২. সরোপডদের দানবীয় আকার: ফাঁপা হাড়ের বায়োমেকানিক্স (PSP)

এই শ্বাসযন্ত্রের ওপর ভর করে ডাইনোসরদের এক দল স্থলভাগের সর্বকালের সর্ববৃহৎ প্রাণীতে রূপান্তরিত হলো: **সরোপড (Sauropoda)** (যেমন *আর্জেন্টিনোসরাস, ব্র্যাকিওসরাস, ড্রেডনোটাস*)—যাদের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫ মিটার এবং ওজন ছাড়িয়ে গিয়েছিল **৭০ মেট্রিক টন**!

পদার্থবিজ্ঞানের স্কয়ার-কিউব সূত্র অনুযায়ী, কোনো প্রাণীর আকার বাড়ালে তার ভর বাড়ে ঘনক হারে ($M \propto L^3$), কিন্তু হাড়ের ভারবাহী ক্ষেত্রফল বাড়ে কেবল বর্গ হারে ($A \propto L^2$)। একটি হাতির শরীর যদি নিরেট হাড় দিয়ে ৭০ টন আকারে বাড়ানো হতো, তবে তার নিজের কঙ্কালের ওজনেই তার পা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। কীভাবে সরোপডরা ১২ মিটার দীর্ঘ ঘাড় উঁচু করে রাখতে পারত?

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১২.২: সরোপডদের দানবীয় কঙ্কালের প্রকৌশল। বামে: কশেরুকার সিটি স্ক্যান প্রস্থচ্ছেদ—বাইরে শক্ত কর্টিকাল হাড়ের টিউব এবং ভেতরে বায়ুপুর্ণ ফাঁপা প্রকোষ্ঠ (ক্যামেরা) ও জালিকা, যা হাড়ের ভর ৬৫% কমিয়ে দিত। ডানে: ক্যান্টিলিভার বিমের বলবিদ্যা এবং ভারী দাঁতহীন ক্ষুদ্র মাথার অনন্য ভূমিকা।

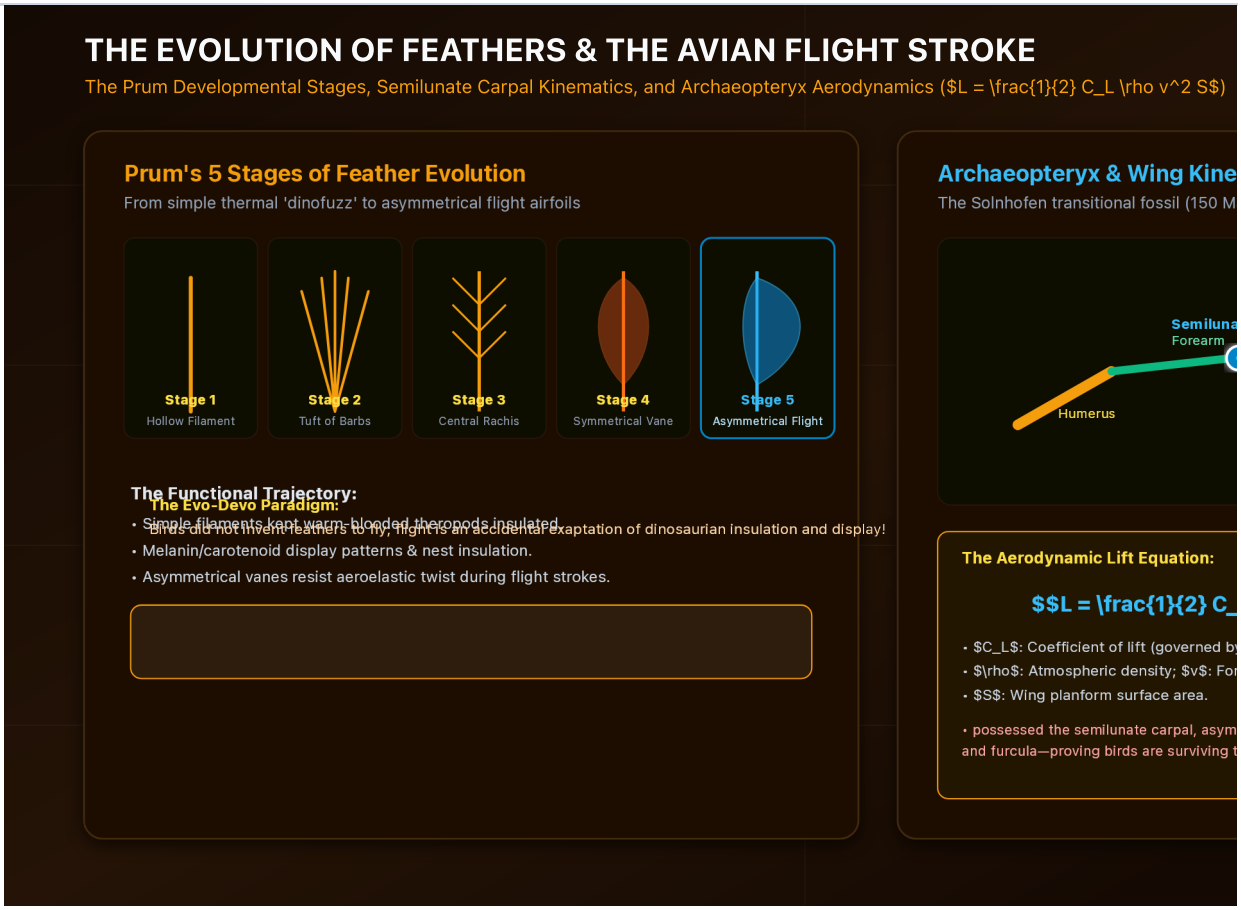
এর মূল রহস্য ছিল **কঙ্কালের বায়বীয়করণ বা Postcranial Skeletal Pneumatization (PSP)**। ফুসফুসের এয়ার-স্যাকের শাখা-প্রশাখা সরোপডদের কশেরুকার হাড়ের ভেতর প্রবেশ করে ভেতরের অংশকে মৌচাকের মতো ফাঁপা করে দিত:

- কশেরুকাগুলোর ভেতরের **৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ স্থানই ছিল বাতাসপূর্ণ**! ভেতরের নিরেট হাড়ের বদলে সেখানে ছিল কাগজের মতো পাতলা অস্থির জালিকা।
- কিন্তু হাড়ের বাইরের খোলসটি ছিল অত্যন্ত শক্ত ও ঘন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আধুনিক বিমানের ফাঁপা ডানার কার্বন-ফাইবার বা ফাঁপা ইস্পাত পাইপের মতোই এই নকশা ওজনকে দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিত অথচ বাঁকানোর চাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা ($I \propto D^4$) বহুগুণ বাড়িয়ে দিত!
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: **সরোপডরা খাবার চিবাত না!** ভারী দাঁত বা চিবানোর পেশী না থাকায় এদের মাথার খুলি ছিল অবিশ্বাস্য রকম ছোট (১০০ কেজির কম)। ফলে ১২ মিটার দীর্ঘ ঘাড়ের মাথায় কোনো বাড়তি ওজন চাপত না—যা স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে শারীরস্থানিকভাবে অসম্ভব।

৩. থেরোপড ডাইনোসর এবং পালকের বিবর্তন

সরোপডরা যখন দানবীয় আকারের দিকে ছুটছিল, দুই পায়ে হাঁটা মাংসাশী **থেরোপড (Theropod)** ডাইনোসররা তখন আকার ছোট করার এক দীর্ঘ বিবর্তনীয় পথ বেছে নিল। আর এই পথেই জন্ম নিল প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর ও জটিল জৈব উদ্ভাবন: **পালক**।

২০০২ সালে বিজ্ঞানী রিচার্ড প্রাম পালক বিবর্তনের যে ৫-ধাপের মডেল উপস্থাপন করেছিলেন, চীনের লিয়াওনিং-এ আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলো তার হুবহু সত্যতা প্রমাণ করে:



চিত্র ১২.৩: ডাইনোসরের লোম থেকে পাখির ডানা। বামে: রিচার্ড প্রামের ৫টি বিবর্তনীয় ধাপ—১ম ধাপের ফাঁপা ফিলামেন্ট (সিনোসরোপটেরিক্স), ২য় ধাপের গুচ্ছ, ৩য় ধাপের শ্যাফ্ট, ৪র্থ ধাপের রঙিন ডিসপ্লে পালক এবং ৫ম ধাপের অসম উড়ন্ত পালক। ডানে: আর্কিওপ্টেরিক্সের কব্জির সেমিলুনার কার্পাল হাড়ের ঘূর্ণন এবং ওড়ার বায়ুগতিবিদ্যার সমীকরণ।

1. **১ম ধাপ (ফাঁপা আঁশ / Dinofuzz):** *সিনোসরোপটেরিক্স*-এর মতো ডাইনোসরে দেখা যাওয়া চুলের মতো ফাঁপা নালী। এর মূল কাজ ছিল উষ্ণ রক্তযুক্ত ডাইনোসরের **শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখা (ইনসুলেশন)**।
2. **২য় ও ৩য় ধাপ (শাখা-প্রশাখা ও কেন্দ্রীয় শ্যাফ্ট):** একাধিক আঁশ একত্রিত হয়ে তুলোর মতো কোমল গুচ্ছ এবং কেন্দ্রীয় ডাঁট তৈরি করল।
3. **৪র্থ ধাপ (প্রতিসম সমতল পালক):** পালকের গায়ে আণুবীক্ষণিক হুক আবির্ভূত হয়ে একটি সমতল বাতাসেরোধী তলের সৃষ্টি করল। *কডিপটেরিক্স*-এর মতো ডাইনোসরে এই পালকগুলো মেলানিনের উজ্জ্বল রঙে রঙিন ছিল—যা ব্যবহৃত হতো **সঙ্গীকে আকর্ষণ এবং ডিম তা দেওয়ার জন্য**।
4. **৫ম ধাপ (অসম উড়ন্ত পালক):** পালকের কেন্দ্রীয় শ্যাফ্টটি একপাশে সরে গিয়ে সামনের কিনারাটিকে সরু ও শক্ত এবং পেছনের কিনারাটিকে চওড়া করে তুলল ($w_{\text{lead}} < w_{\text{trail}}$)। বাতাসের ধাক্কায় এই পালক বেঁকে যায় না, বরং বায়ুগতিবিদ্যার লিফট (Lift) তৈরি করে।

> ***বিবর্তনের চিরন্তন সত্য:*** *ডাইনোসররা ওড়ার জন্য পালক আবিষ্কার করেনি! ওড়ার বহু কোটি বছর আগেই শরীর গরম রাখা এবং যৌন প্রদর্শনের জন্য তাদের দেহে পালক জন্ম নিয়েছিল; ওড়া ছিল সেই পালকের এক আকস্মিক দ্বিতীয় ব্যবহার (Exaptation)!*

৪. আর্কিওপ্টেরিক্স এবং পাখির উড্ডয়ন

১৮৫৯ সালে ডারউইনের *On the Origin of Species* প্রকাশের মাত্র দুই বছর পর, জার্মানির সোলেনহফেনের চুনাপাথরে আবিষ্কৃত হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মিসিং লিংক: **আর্কিওপ্টেরিক্স (Archaeopteryx lithographica)** (১৫০ Ma)।

- **ডাইনোসরের বৈশিষ্ট্য:** মাড়িতে ধারালো শিকারী দাঁত, ডানায় বাঁকা নখযুক্ত তিনটি মুক্ত আঙুল এবং কশেরুকাযুক্ত লম্বা টিকটিকির মতো লেজ।
- **পাখির বৈশিষ্ট্য:** স্থিতিস্থাপক উইশবোন বা ফারকুলা (Furcula), ডালে বসার উপযোগী উল্টানো পেছনের আঙুল এবং ডানায় সুবিন্যস্ত ৫ম ধাপের অসম উড়ন্ত পালক।

শিকারী থেরোপড ডাইনোসরদের কাছ থেকে আর্কিওপ্টেরিক্স উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল একটি বিশেষ অর্ধচন্দ্রাকার কব্জির হাড়—**সেমিলুনার কার্পাল (Semilunate Carpal)**। শিকারে ক্ষিপ্র কামড় বসানোর সময় দুই হাত দিয়ে শিকারকে চেপে ধরার এই কব্জির মোচড়টি পরবর্তীতে ডানার ঝাপটা বা ফ্ল্যাপিংয়ের মূল যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হলো!

বায়ুগতিবিদ্যার লিফট সমীকরণ অনুযায়ী:

$$L = \frac{1}{2} C_L \rho v^2 S$$

ডানার বক্রতা এবং সেমিলুনার কার্পালের গতিশীলতায় ভর করে থেরোপড ডাইনোসরের একটি শাখা প্রবেশ করল আকাশে। ডাইনোসররা মাটি ও আকাশ দুটোই জয় করেছিল। কিন্তু আজ থেকে ৬৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে মহাকাশ থেকে ধেয়ে আসা ১০ কিলোমিটার চওড়া একটি উল্কাপিণ্ড মেসোজোয়িক স্বর্গের পতন ঘটাল। আর সেই পারমাণবিক শীতের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে

Shakil Mahmud • Research Monograph

প্রস্তুত হলো গুহায় লুকিয়ে থাকা আমাদের রক্তমাংসের ছোট্ট স্তন্যপায়ীরা।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "আর্কোসরদের জয়যাত্রা — ডাইনোসর সাম্রাজ্য, টেরোসর এবং পাখির বিবর্তন"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১২। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-12-the-archosaur-and-dinosaur-empire-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ত্রয়োদশ খণ্ড

স্তন্যপায়ীদের নিশাচর অধ্যায় এবং কে-পিজি উল্কাপাতের মহাপ্রলয়

স্তন্যপায়ীদের নিশাচর অধ্যায় এবং কে-পিজি উল্কাপাতের মহাপ্রলয়

1,047 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৩: *চিত্র: সিনোজোয়িক যুগের ঊষা (~৬৬ মিলিয়ন বছর আগে): চিকসুলুব উল্কাপাতের পর ছাই ও ছত্রাকের মাঝে খুদে নিশাচর আদিম স্তন্যপায়ী পারগেটরিয়াস (Purgatorius)-এর বেঁচে থাকার সংগ্রাম।*

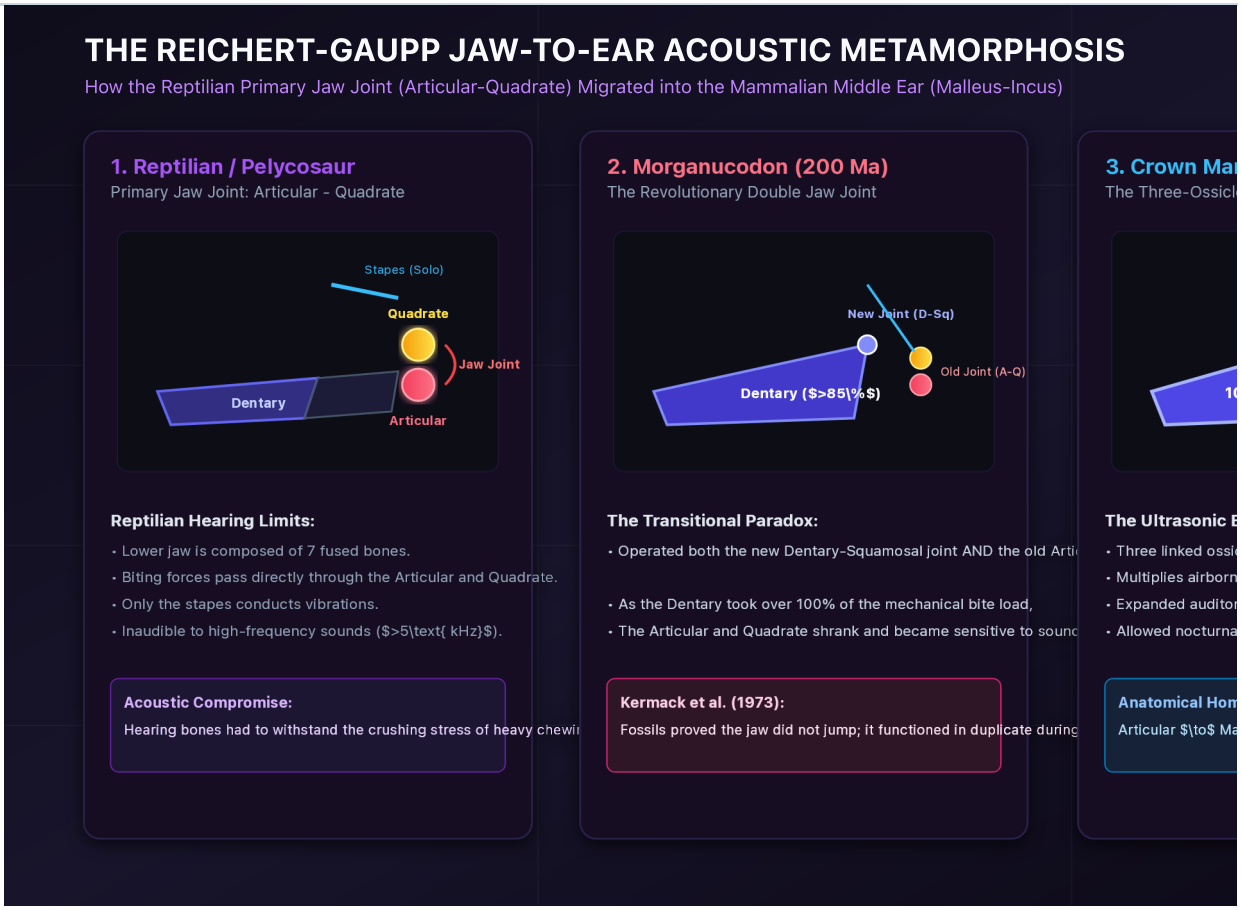
দেড়শত মিলিয়ন বছর ধরে—জুরাসিক থেকে শুরু করে ক্রিটেশিয়াস যুগের শেষ অবধি এক অবিশ্বাস্য দীর্ঘ সময়—আমাদের স্তন্যপায়ী পূর্বপুরুষরা এক ভয়াবহ অবরোধের মুখে বেঁচে ছিল। পৃথিবীর দিনের আলোয় ডাইনোসরদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় আমাদের পূর্বপুরুষরা নির্বাসিত হয়েছিল রাতের কনকনে ঠান্ডা অন্ধকারের কোলে। কিন্তু এই নিশাচর জীবন কোনো পরাজয় ছিল না; এটিই ছিল স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের আধুনিক নিওকর্টেক্স, অনুভূতিশীল গোঁফ, উষ্ণ রক্তের পশম এবং মাতৃদুগ্ধের জন্মশালা। জীববিজ্ঞানে একে বলা হয় **Nocturnal Bottleneck** বা নিশাচর প্রতিবন্ধকতা। ৬৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে যখন চিকসুলুবের উল্কাপিণ্ড এসে মেসোজোয়িক স্বর্গের পতন ঘটাল, তখন মাটির গর্তে লুকিয়ে থাকা আমাদের এই ছোট্ট নিশাচর পূর্বপুরুষরাই পৃথিবীর নতুন অধিপতি হিসেবে আবির্ভূত হলো।

১. রাইখার্ট-গউপ রূপান্তর: চোয়ালের হাড় থেকে মধ্যকর্ণের জন্ম

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অঙ্গসংস্থানবিদ্যার সবচেয়ে বিস্ময়কর বিবর্তন হলো চোয়ালের জোড়ার মধ্যকর্ণে রূপান্তর। ১৮৩৭ সালে কার্ল রাইখার্ট এবং ১৯১৩ সালে আর্নস্ট গউপ ভ্রূণতত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের মধ্যকর্ণের তিনটি হাড় নতুন করে তৈরি করেনি—বরং *তাদের সরীসৃপ পূর্বপুরুষদের চোয়ালের হাড় খুলে নিয়ে কানের পর্দা তৈরি করেছে!*

সরীসৃপ এবং আদিম উভচরদের নিচের চোয়াল গঠিত ছিল ৭টি আলাদা হাড়ের সমন্বয়ে। তাদের চোয়ালের প্রধান কব্জাটি ছিল পেছনের **আর্টিকুলার (Articular)** এবং মাথার খুলির **কোয়াড্রেট (Quadrate)** হাড়ের সংযোগে। তাদের কানের ভেতর কেবল একটি একক হাড় ছিল—স্টেপিস।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৩.১: রাইখার্ট-গউপ কানের মেটামরফোসিস। ১ম ধাপ: সরীসৃপের আদিম চোয়ালের কব্জা (আর্টিকুলার ও কোয়াড্রেট)। ২য় ধাপ: ট্রায়াসিক যুগের সাইনোডন্ট মর্গানুকোডনের যুগান্তকারী দ্বৈত চোয়ালের কব্জা (একই সাথে ডেন্টারি-স্কোয়ামোসল এবং আর্টিকুলার-কোয়াড্রেট সক্রিয় ছিল)। ৩য় ধাপ: আধুনিক স্তন্যপায়ীদের ১০০% ডেন্টারি চোয়াল, যা আর্টিকুলার (ম্যালিয়াস) এবং কোয়াড্রেটকে (ইনকাস) মধ্যকর্ণে সরিয়ে নিয়ে অতি-শব্দ শোনার ৩-হাড়ের কানের লিভার তৈরি করেছে।

এর ফলে প্রাচীন সরীসৃপদের এক মারাত্মক সংকটে পড়তে হতো: চিবানোর প্রচণ্ড যান্ত্রিক চাপ এবং কানের শব্দ শোনার সূক্ষ্ম কম্পন—দুটোই একই হাড়ের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতো! ট্রায়াসিক যুগের শেষে আদি স্তন্যপায়ী *মর্গানুকোডন (Morganucodon)* (২০০ Ma) এর এক অবিশ্বাস্য সমাধান বের করল: **দ্বৈত চোয়ালের কব্জা (The Double Jaw Joint)**।

দাঁতযুক্ত **ডেন্টারি (Dentary)** হাড়টি আকারে বিশাল হয়ে সরাসরি মাথার খুলির স্কোয়ামোসল হাড়ের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের আধুনিক চোয়ালের কব্জা (TMJ) তৈরি করল। দীর্ঘ কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে এই প্রাণীরা একই সাথে দুটি কব্জা ব্যবহার করে খাবার চিবাত!

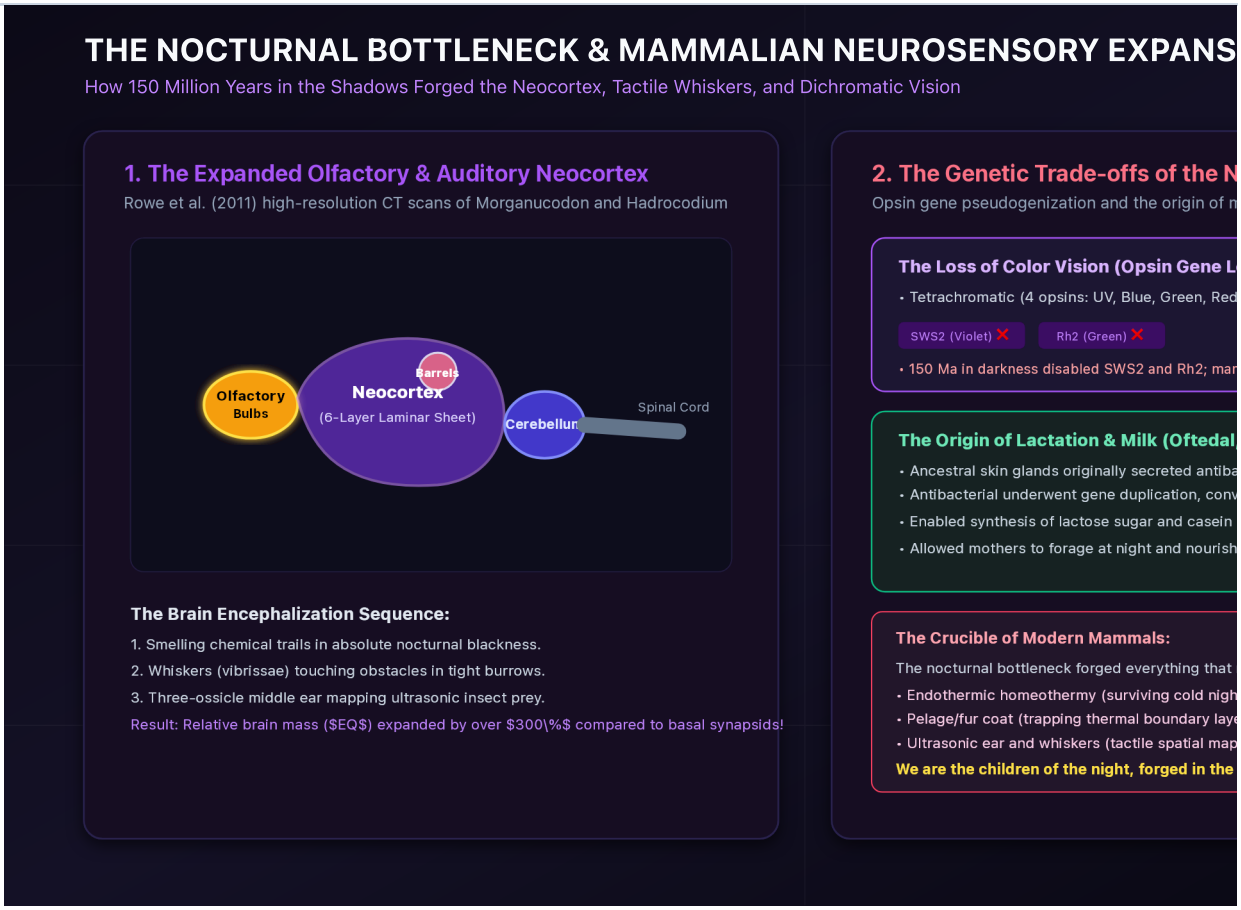
একবার ডেন্টারি হাড় চিবানোর সম্পূর্ণ ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার পর, পুরনো আর্টিকুলার ও কোয়াড্রেট হাড় দুটি তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব থেকে চিরতরে মুক্ত হলো। তারা আকারে ক্ষুদ্র হয়ে মধ্যকর্ণের পেট্রোসাল গহ্বরে ঢুকে গেল:

- **আর্টিকুলার** রূপান্তরিত হলো **ম্যালিয়াস (Malleus / হাতুড়ি)**-এ।
- **কোয়াড্রেট** রূপান্তরিত হলো **ইনকাস (Incus / নেহাই)**-এ।
- আর আদিম হায়োম্যান্ডিবুলার **স্টেপিস (Stapes / রেকাব)**-এর সাথে যুক্ত হয়ে তারা তৈরি করল ৩-অস্থির এক নিখুঁত লিভার!

এই তিন হাড়ের সমন্বয় বায়ুর শব্দচাপকে বহুগুণ বাড়িয়ে কানের ককলিয়ার তরলে পৌঁছে দিল। এর ফলে স্তন্যপায়ীরা বাতাসে **১০০ কিলোহার্টজের বেশি অতি-শব্দ (Ultrasound)** শোনার ক্ষমতা অর্জন করল—যা দিয়ে তারা নিকষ কালো রাতেও পোকা-মাকড়ের সূক্ষ্ম নড়াচড়ার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেত।

২. নিশাচর প্রতিবন্ধকতা: গোঁফ, নিওকর্টেক্স এবং রঙের অন্ধত্ব

টানা দেড়শত মিলিয়ন বছর ডাইনোসরের ভয়ে রাতের অন্ধকারে বেঁচে থাকার ফলে স্তন্যপায়ীদের জিনোম এবং মস্তিষ্কে বিশাল পরিবর্তন এলো—যাকে বলা হয় **Nocturnal Bottleneck Hypothesis**:



চিত্র ১৩.২: স্তন্যপায়ী মস্তিষ্কের পুনর্বিন্যাস। বামে: ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশালাকার অলফ্যাক্টরি বাল্ব এবং ৬-স্তরের উন্নত নিওকর্টেক্সের বিস্তার। ডানে: অন্ধকার রাতের জেনেটিক মূল্য—দুটি রঙের অপসিন জিন নষ্ট হয়ে ডাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টিতে অবনমন, যা পরবর্তীতে মাতৃদুগ্ধের উদ্ভাবন এবং গোঁফের ব্যারেল কর্টেক্স দিয়ে পূরণ করা হয়।

দৃষ্টির বিসর্জন: লাল-সবুজের অন্ধত্ব

সরীসৃপ ও পাখিরা চার রঙের আলো দেখতে পেত (Tetrachromatic: অতিবেগুনী, নীল, সবুজ ও লাল)। কিন্তু ঘন কালো রাতে রঙের কোনো অস্তিত্ব ছিল না; দরকার ছিল ক্ষীণ আলোয় দেখার জন্য রড কোষ। ফলে অব্যবহারে স্তন্যপায়ীদের দুটি অপসিন জিন ($SWS2$ এবং $Rh2$) চিরতরে অকেজো হয়ে গেল। স্তন্যপায়ীরা হয়ে গেল **ডাইক্রোম্যাট (Dichromatic)** বা লাল-সবুজ বর্ণান্ধ—যা আজও বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া ও হরিণে বিদ্যমান।

মস্তিষ্কের বিস্ময়: নিওকর্টেক্স ও মাতৃদুগ্ধ

দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হলো ঘ্রাণ ও স্পর্শের মাধ্যমে। ফসিলের সিটি স্ক্যানে দেখা যায় আদি স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্ক সরীসৃপদের চেয়ে এক ধাক্কায় **৩০০% বড় হয়ে গেল**:

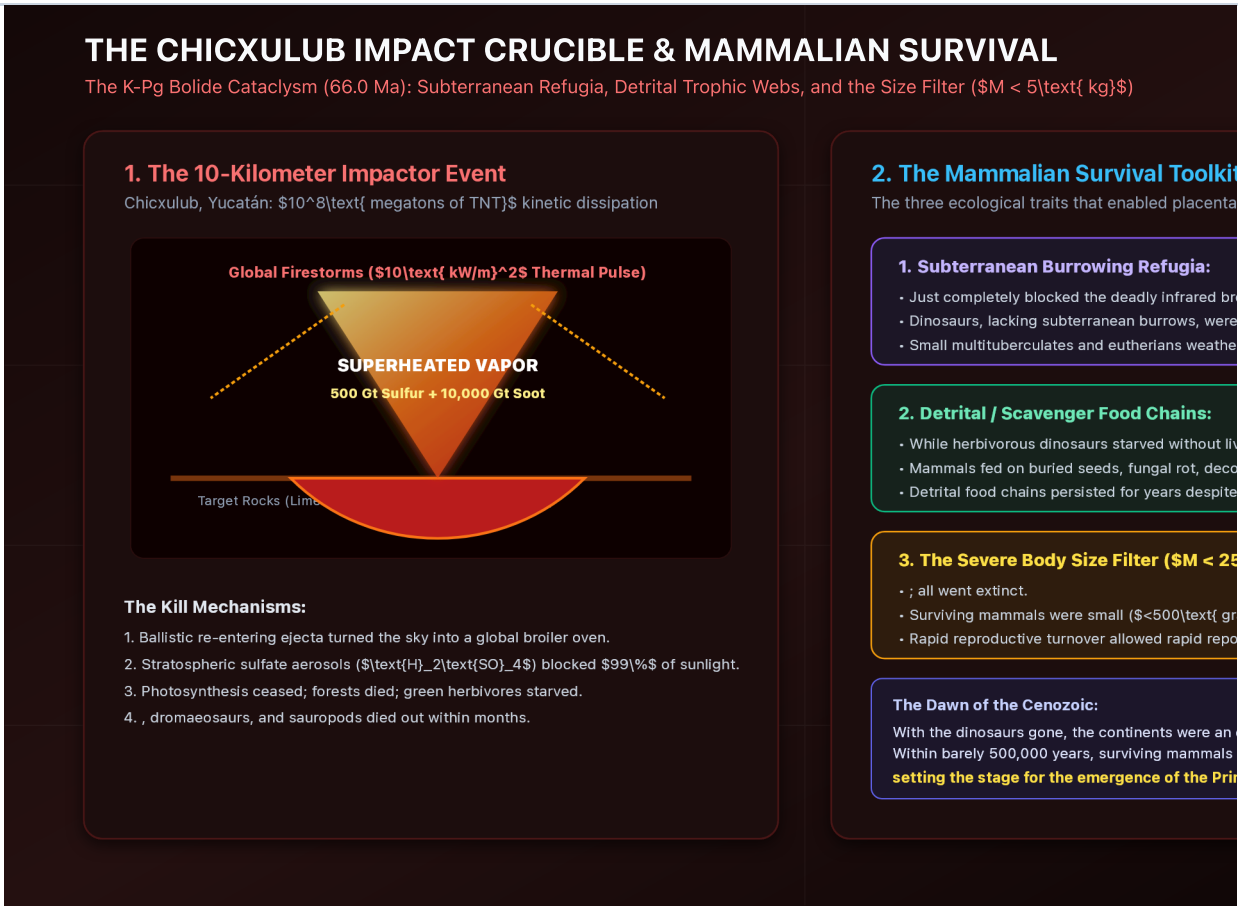
1. **অলফ্যাক্টরি বাল্ব:** গন্ধ শোনার রিসেপ্টর জিন এক হাজার ছাড়িয়ে গেল। গন্ধ শুঁকে তারা রাতের অন্ধকারে সম্পূর্ণ মানচিত্র এঁকে ফেলত।
2. **গোঁফ ও ব্যারেল কর্টেক্স:** মুখের চারপাশে জন্ম নিল সংবেদী গোঁফ (Vibrissae)। মস্তিষ্কের সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সে প্রতিটি গোঁফের জন্য সুনির্দিষ্ট নিউরনের সিলিন্ডার বা **ব্যারেল কর্টেক্স** তৈরি হলো, যা দিয়ে সংকীর্ণ গর্তের প্রতিটি ইঞ্চি স্পর্শ দিয়ে নিখুঁতভাবে অনুভব করা যেত।
3. **মাতৃদুগ্ধের উদ্ভাবন (Lactation):** ত্বকের ব্যাকটেরিয়ারোধী **লাইসোজাইম** এনজাইম পরিবর্তিত হয়ে তৈরি করল ল্যাকটোজ শর্করা ও কেসিন প্রোটিন সমৃদ্ধ দুধ! মাতৃদুগ্ধের ফলে মায়েরা রাতে দ্রুত শিকার করে এসে মাটির গভীর গর্তে লুকিয়ে থাকা শিশুদের দুধ খাইয়ে পুষ্ট করতে পারত।

৩. চিকসুলুব উল্কাপাত: ৬৬ মিলিয়ন বছর পূর্বের অগ্নিপরীক্ষা

আজ থেকে ৬৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে মেসোজোয়িক স্বর্গের পতন ঘটল এক মুহূর্তের আঘাতে। মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে ঘণ্টায় ৪৫,০০০ মাইল বেগে আছড়ে পড়ল **১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার চওড়া একটি বিশালাকার উল্কাপিণ্ড: চিকসুলুব ইমপ্যাক্ট**।

এই আঘাতে নির্গত শক্তি ছিল দশ কোটি মেগাটন টিএনটির সমান—দশ কোটি হিরোশিমা পারমাণবিক বোমার সমতুল্য! ভূগর্ভের জিপসাম চুনাপাথর বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ৫০০ গিগাটন সালফার এবং ১০,০০০ গিগাটন ধোঁয়া নিক্ষেপ করল:

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৩.৩: কে-পিজি মহাপ্রলয় এবং স্তন্যপায়ীদের টিকে থাকার ফিল্টার। বামে: চিকসুলুব গহ্বরের সৃষ্টি, বায়ুমণ্ডলে সালফার মেঘ এবং বিশ্বব্যাপী ১০ কিলোওয়াট/বর্গমিটারের ইনফ্রারেড আগুনের ঝড়। ডানে: মাটির নিচের গর্তের ইনসুলেশন, পচা পাতা ও মাটির পোকা খাওয়ার খাদ্যশৃঙ্খলা এবং ২৫ কেজির নিচে দেহের ওজনের ফিল্টার।

আগুনের বৃষ্টি এবং পারমাণবিক শীত

- **প্রথম ৪ ঘণ্টা:** মহাকাশে ছিটকে যাওয়া কোটি কোটি পাথরের টুকরো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করে আকাশকে ১,০০০° সেলসিয়াসের ওভেনে পরিণত করল। বিশ্বব্যাপী বনভূমিতে দাবানল জ্বলে উঠল।
- **পরবর্তী ১০ বছর:** ধোঁয়া ও সালফারের মেঘে সূর্যের আলো ৯৯% অবরুদ্ধ হয়ে গেল। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেল। সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গাছপালা মরে গেল এবং ডাইনোসরদের খাদ্যশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল।

৪. কেন ডাইনোসররা মরল কিন্তু স্তন্যপায়ীরা বাঁচল?

কে-পিজি বিলুপ্তি কোনো অন্ধ ধ্বংসযজ্ঞ ছিল না; এটি ছিল কঠোর একটি বায়োফিজিক্যাল ফিল্টার। পৃথিবীর সমস্ত নন-অ্যাভিয়ান ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু স্তন্যপায়ীরা বেঁচে রইল তিনটি কারণে:

1. **মাটির নিচের গর্ত:** মাটি হলো তাপের পরম কুপরিবাহী। পদার্থবিজ্ঞানের হিসাব দেখায় যে, মাত্র **১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার মাটির গভীরতা** আকাশের সেই ভয়ংকর আগুনের তাপকে ১০০% রুখে দিয়েছিল! উন্মুক্ত প্রান্তরে থাকা ডাইনোসররা পুড়ে ছাই হলেও স্তন্যপায়ীরা তাদের মাটির নিচের সুড়ঙ্গে নিরাপদে ঘুমিয়ে ছিল।
2. **পচা পাতা ও বীজের খাদ্যশৃঙ্খলা:** ডাইনোসরদের প্রতিদিন শত শত কেজি তাজা কাঁচা পাতা লাগত। কিন্তু স্তন্যপায়ীরা খেত মাটির নিচে সংরক্ষিত বীজ, শিকড়, পচা কাঠ, ছত্রাক এবং মাটিতে বাস করা পোকা-মাকড়—যা অন্ধকার পারমাণবিক শীতেও বছরের পর বছর টিকে ছিল।
3. **২৫ কেজির আকারের ফিল্টার:** জীবাশ্মের হিসাব অনুযায়ী, **স্থলভাগের ২৫ কেজির বেশি ওজনের ১০০% প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল!** বেঁচে থাকা স্তন্যপায়ীরা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির (৫০০ গ্রামের কম), যাদের খাদ্যের চাহিদা ছিল অতি নগণ্য।

যখন ধোঁয়ার মেঘ কেটে গেল এবং নতুন সূর্য আকাশে উঠল, ডাইনোসর সাম্রাজ্য তখন মাটির সাথে মিশে গেছে। ফাঁকা পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল এক সোনালী প্রভাত—শুরু হলো সেনোজোয়িক যুগ, এবং আমাদের স্তন্যপায়ী পূর্বপুরুষরা প্রস্তুত হলো গাছ বেয়ে ওঠার নতুন অভিযানের জন্য: প্রাইমেটদের উন্মেষ।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "স্তন্যপায়ীদের নিশাচর অধ্যায় এবং কে-পিজি উল্কাপাতের মহাপ্রলয়"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১৩। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-13-the-nocturnal-mammalian-bottleneck-and-k-pg-impact-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্দশ খণ্ড

প্যালিওজিন স্তন্যপায়ী মহাবিস্ফোরণ এবং প্রাইমেটদের প্রথম পদচিহ্ন

প্যালিওজিন স্তন্যপায়ী মহাবিস্ফোরণ এবং প্রাইমেটদের প্রথম পদচিহ্ন

1,258 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৪: *চিত্র: ইওসিন যুগের বৃষ্টিঅরণ্যের শামিয়ানায় আদিম প্রাইমেট ডারউইনিয়াস (Darwinius masillae / Ida, ~৫০ মিলিয়ন বছর আগে), যা আঁকড়ে ধরার হাত, চ্যাপ্টা নখ এবং ত্রিমাত্রিক দৃষ্টি নিয়ে ডালপালায় বিচরণ করছে।*

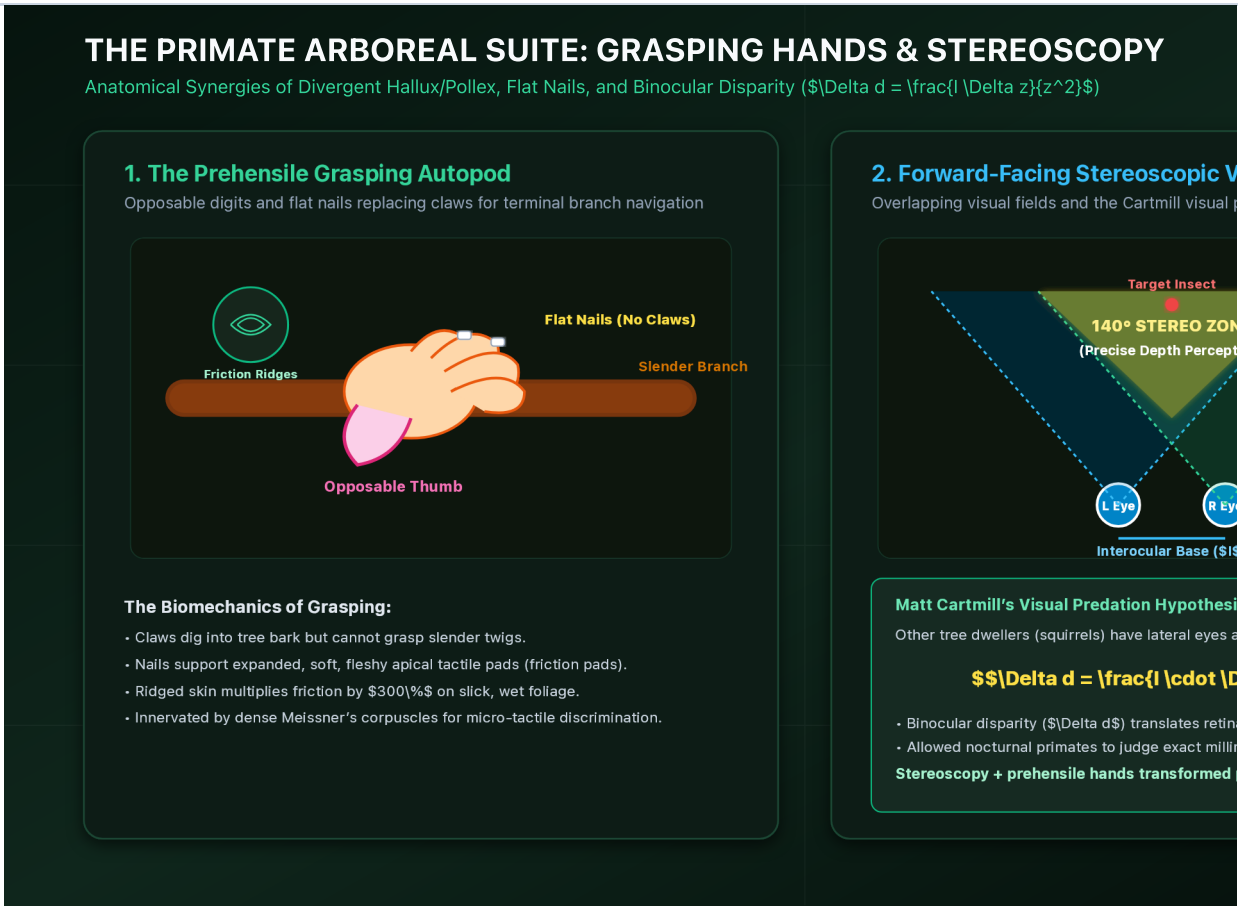
ছয় কোটি ষাট লাখ বছর পূর্বে চিকসুলুব গ্রহাণুর মহাপ্রলয়ে নন-এভিয়ান ডাইনোসরদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। ডাইনোসরদের এই বিদায়ে পৃথিবীর মহাদেশীয় বাস্তুতন্ত্র পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ও রাত্রিকালীন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে বেঁচে থাকা স্তন্যপায়ী প্রাণীরা। প্যালিওসিন ও প্রারম্ভিক ইওসিন যুগে (৬৬\text{–}৫০\text{ Ma})—ভূতাত্ত্বিক সময়ের মাপকাঠিতে মাত্র এক কোটি বছরের মধ্যে—স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ঘটে ইতিহাসের অন্যতম দ্রুত ও বৈচিত্র্যময় অভিযোজনিক বিস্ফোরণ (Adaptive Radiation)। এই উর্বর যুগেই জন্ম নেয় মানবজাতির প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষের ট্যাক্সন: **প্রাইমেট (Primates)**। মাটির বিপজ্জনক অন্ধকার ছেড়ে তারা পা বাড়ায় রৌদ্রোজ্জ্বল, ঘন সাবট্রপিক্যাল রেইনফরেস্টের বহুতল বৃক্ষশাখায় (Canopy)। সেখানেই গঠিত হয় মানুষের শারীরিক ভিত্তি: আঁকড়ে ধরার উপযোগী আঙুল ও সমতল নখ, সামনে মুখ করা ত্রিমাত্রিক স্টেরিওস্কোপিক চোখ, রঙের নির্ভুল বিভেদ এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল নিউরোকর্টেক্স।

১. বৃক্ষচারী জীবনের অভিযাত্রা: প্রাইমেট উৎপত্তির তিনটি ধ্রুপদী মতবাদ

কী কারণে মাটিতে বিচরণকারী একটি সাধারণ পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ী বৃক্ষচারী বিশেষজ্ঞ প্রাইমেটে রূপান্তরিত হলো? গত এক শতাব্দী ধরে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে তিনটি প্রধান বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস আলোড়ন সৃষ্টি করেছে:

1. **আরবোরিয়াল হাইপোথিসিস (স্মিথ ও উড জোন্স, ১৯১২–১৯১৬):** গ্রাফটন ইলিয়ট স্মিথ ও ফ্রেডেরিক উড জোন্স প্রস্তাব করেন যে গাছের শাখায় জীবনযাপনের সাধারণ অভিযোজনই প্রাইমেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি করেছে। নখের বদলে আঁকড়ে ধরার হাত-পা এবং ঘ্রাণের বদলে ত্রিমাত্রিক দূরত্ব মাপার দৃষ্টি গাছে চড়ার জন্য অপরিহার্য ছিল।
2. **ভিজ্যুয়াল প্রেডেশন হাইপোথিসিস (ম্যাট কার্টমিল, ১৯৭৪):** নৃবিজ্ঞানী কার্টমিল দেখান যে কাঠবিড়ালি বা ট্রি-শ্রু তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখ ও দুই পাশে থাকা চোখ নিয়েও গাছে নিখুঁতভাবে বাস করে। প্রাইমেটের অভিযোজন বরং শিকারী বিড়াল বা পেঁচার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ: গাছের চিকন ডালের মাথায় (Terminal Branch) রাতের অন্ধকারে পতঙ্গ শিকারের জন্যই সামনের দিকে মুখ করা স্টেরিওস্কোপিক চোখ ও শব্দহীনভাবে শিকার ধরার উপযোগী গ্রাস্পিং থাবা বিবর্তিত হয়েছিল।
3. **অ্যাঞ্জিওস্পার্ম কো-ইভোলিউশন হাইপোথিসিস (রবার্ট সাসম্যান, ১৯৯১):** সাসম্যান লক্ষ্য করেন যে ইওসিন যুগে প্রাইমেটের উত্থান ঘটেছিল সপুষ্পক ও ফলবান বৃক্ষের (Angiosperms) বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরণের সাথে হুবহু একই সময়ে। প্রাইমেটের গ্রাস্পিং হাত ও রঙিন দৃষ্টি মূলত দূরবর্তী সরু ডালে জন্মানো ফল, ফুল ও মধু সহজে সনাক্ত ও সংগ্রহ করার জন্য বিবর্তিত হয়েছিল।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৪.১: প্রাইমেটের অঙ্গসংস্থানিক রূপান্তর। বামে: সাধারণ স্তন্যপায়ীর নখরযুক্ত থাবা বনাম প্রাইমেটের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বৃদ্ধাঙ্গুলি (Pollex/Hallux), সমতল নখ এবং স্পর্শকাতর ফিঙ্গারপ্রিন্ট খাঁজ। মাঝে: পার্শ্বীয় চোখ থেকে মুখমণ্ডলের সামনের দিকে কেন্দ্রীভূত স্টেরিওস্কোপিক বাইনোকুলার দৃষ্টি ও অক্ষিকোটরের পোস্টঅরবিটাল বার। ডানে: কার্টমিলের শিকার তত্ত্ব ও সাসম্যানের ফলভুক তত্ত্বের সমন্বিত বাস্তুতান্ত্রিক মডেল।

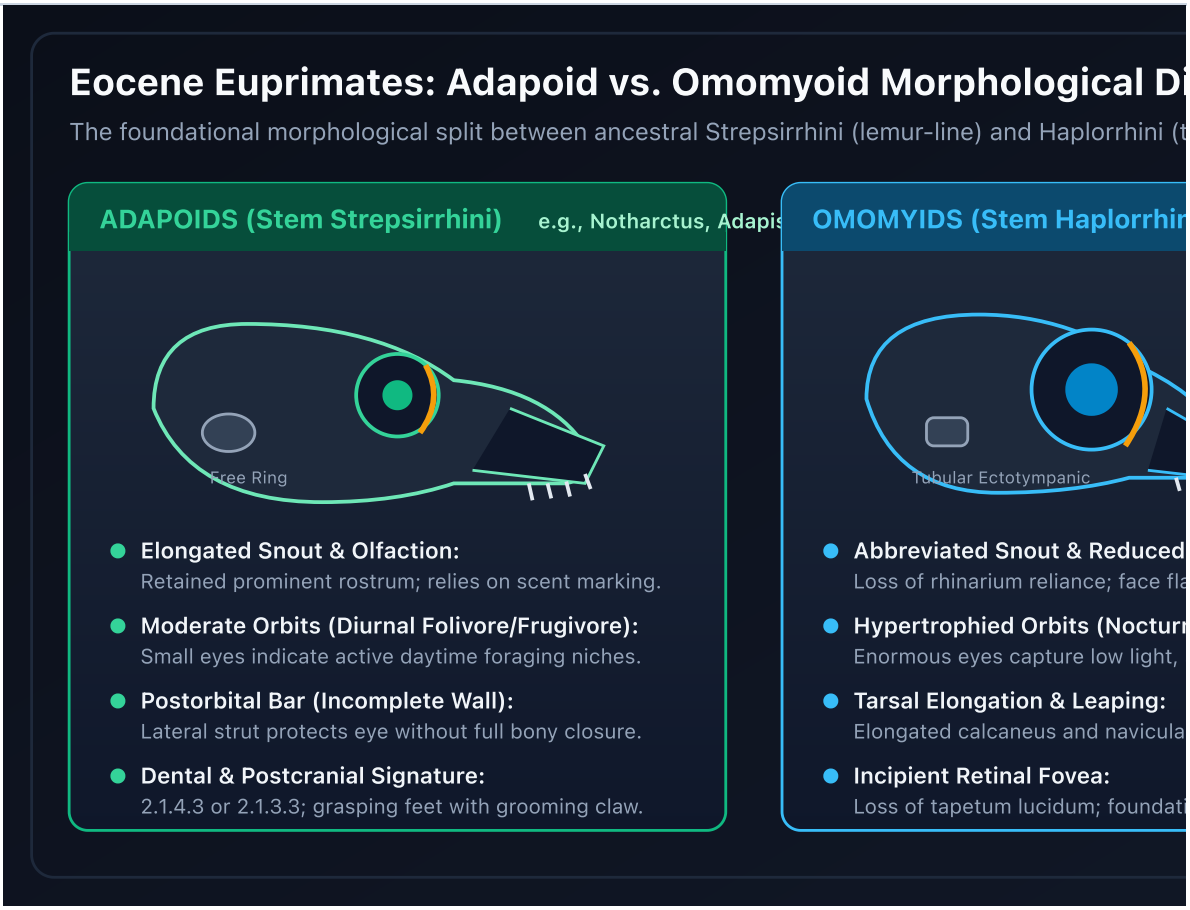
আধুনিক জীবাশ্মবিদরা এখন একটি **সমন্বিত মডেল (Synthetic Model)** গ্রহণ করেছেন: প্রাথমিক স্টেম প্রাইমেটরা সাসম্যানের তত্ত্বানুযায়ী সরু ডালে ফল ও রস সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের হাত ও পায়ের গ্রাস্পিং ক্ষমতা অর্জন করেছিল; পরবর্তীতে কার্টমিলের তত্ত্বানুযায়ী ফলখেকো ক্যানোপিতে জড়ো হওয়া দ্রুতগামী পতঙ্গ শিকারের মাধ্যমে তাদের চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ও পোস্টঅরবিটাল বার দ্বারা সুরক্ষিত হয়।

গ্রাস্পিং অটোঁপডের অঙ্গসংস্থান

বাঁকানো নখ দিয়ে গাছের ছাল ছিদ্র করার পরিবর্তে প্রাইমেটের হাত ও পায়ে সৃষ্টি হয় **সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রথম আঙুল**—হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি (*Pollex*) এবং পায়ে বিপরীতমুখী বুড়ো আঙুল (*Hallux*)। আঙুলের ডগার বাঁকা নখ রূপান্তরিত হয় **সমতল নখে (Flat Nails)**। এর ফলে উন্মুক্ত হয় মেসনার্স কর্পাসেল ও খাঁজযুক্ত ত্বকের স্পর্শকাতর প্যাড (**ডার্মাটোগ্লিফিক্স বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট**), যা ভেজা পিচ্ছিল ডালে অনন্য গ্রিপ এবং সূক্ষ্ম টেক্সচার অনুভব করার সংবেদনশীলতা প্রদান করে।

২. অ্যাডাপয়েড বনাম ওমোমাইয়েড: ইওসিনের মহান প্রাইমেট বিভাজন

ইওসিন যুগের সূচনালগ্নে (৫৬ Ma) উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার জীবাশ্ম স্তরে আত্মপ্রকাশ করে **ইউপ্রাইমেট (Euprimates)**—যাদের আধুনিক প্রাইমেটের প্রকৃত পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। সূচনা থেকেই তারা দুটি স্পষ্ট পরাপরিবারে বিভক্ত ছিল, যা আজকের জীবিত দুটি প্রধান উপবর্গের পূর্বসূরি:



চিত্র ১৪.২: প্রারম্ভিক ইওসিনের অঙ্গসংস্থানিক বিভাজন। অ্যাডাপয়েডরা (যেমন Notharctus, Adapis, Darwinius) আধুনিক স্ট্রেপসিরহিনি (লেমুর/লরিস)-এর পূর্বপুরুষ, যাদের লম্বা থুতনি, ঘ্রাণশক্তি, মাঝারি আকারের দিবাচর চোখ এবং রিং-সদৃশ মধ্যকর্ণ ছিল। ওমোমাইয়েডরা (যেমন Teilhardina, Necrolemur) হ্যাপলোরহিনি (টার্সিয়ার, বানর ও মানুষ)-এর পূর্বপুরুষ, যাদের চ্যাপ্টা মুখ, বিশালাকার নিশাচর অক্ষিকোটর এবং নলাকার অস্থিময় কানের পর্দা ছিল।

১. অ্যাডাপয়েড (Adapoidea — স্টেম স্ট্রেপসিরহিনি)

অ্যাডাপয়েডরা (যেমন উত্তর আমেরিকার *Notharctus*, ইউরোপের *Adapis* এবং জার্মানির বিখ্যাত নিখুঁত জীবাশ্ম *Darwinius masillae* বা "আইডা") ছিল আকারে মাঝারি থেকে বড় (১\text{–}৮\text{ কেজি}):

- **মাথার খুলি ও সংবেদনশীলতা:** এদের মুখ বা রোস্ট্রাম ছিল কিছুটা লম্বাটে, যা কার্যকর ঘ্রাণশক্তির প্রমাণ দেয়। অক্ষিকোটর ছিল পরিমিত আকারের, যা প্রমাণ করে এরা মূলত ছিল **দিবাচর (Diurnal)**।
- **দাঁতের গঠন:** চোয়ালে চারটি বা তিনটি প্রিমোলার (২.১.৪.৩ বা ২.১.৩.৩) ছিল এবং মোলার দাঁতগুলোর শৃঙ্গ পাতা ও বীজ চিবানোর জন্য উপযুক্ত ছিল।
- **শারীরিক গঠন:** এরা চারপায়ে ডাল বেয়ে চলাফেরা করত। এদের সরাসরি বংশধর হিসেবে আজকের মাদাগাস্কারের **লেমুর (Lemurs)** ও এশিয়া-আফ্রিকার **লরিস (Lorises)** বেঁচে রয়েছে।

২. ওমোমাইয়েড (Omomyoidea — স্টেম হ্যাপলোরহিনি)

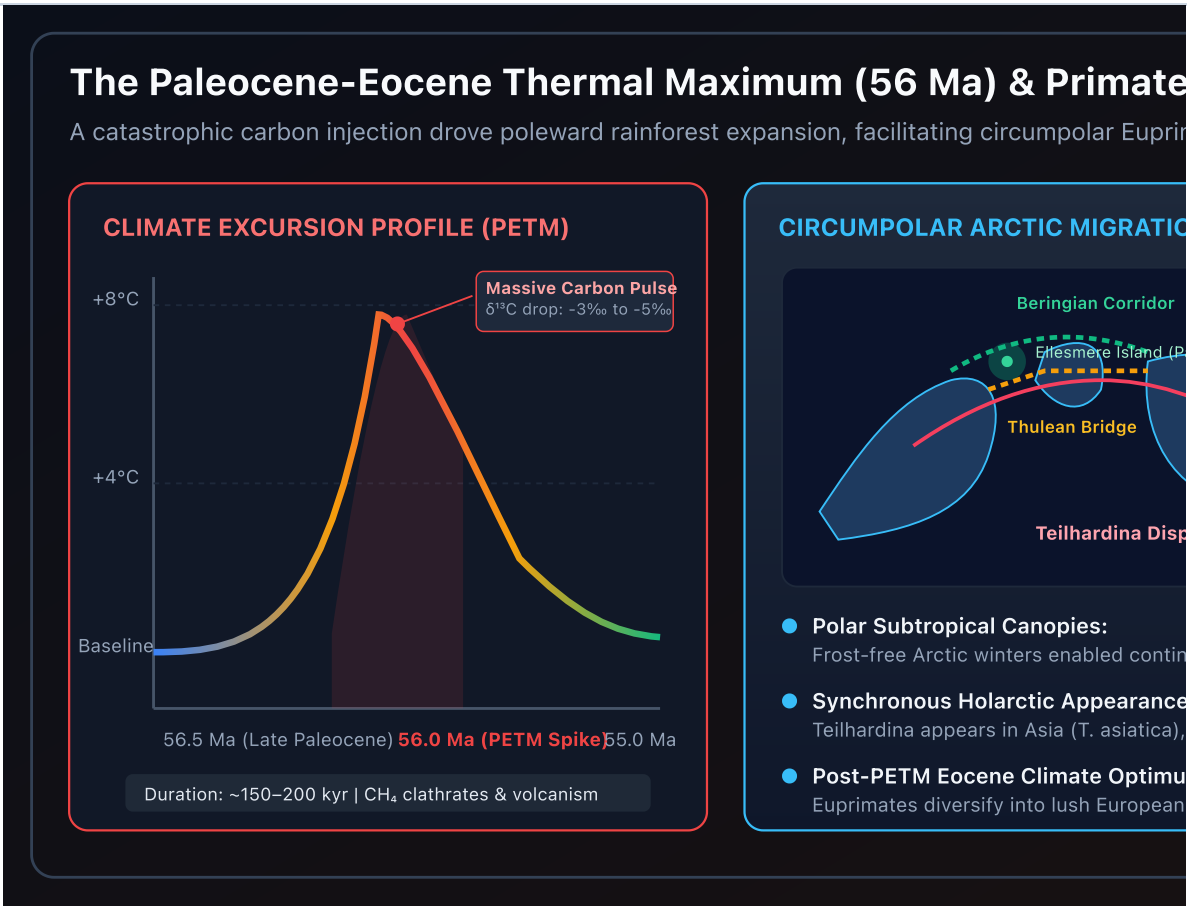
অ্যাডাপয়েডদের সমসাময়িক ছিল ওমোমাইয়েডরা (যেমন *Teilhardina*, *Necrolemur* ও *Tetonius*), যাদের দেহের ওজন ছিল মাত্র ৫০\text{–}৫০০\text{ গ্রাম}:

- **ক্ষুদ্র থুতনি ও বিশালাকার চোখ:** এদের মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত ছোট ও চ্যাপ্টা, যা ঘ্রাণশক্তির হ্রাস ও দৃষ্টিশক্তির বিপুল প্রাধান্য নির্দেশ করে। অক্ষিকোটর ছিল **বিশাল আকৃতির (Hypertrophied Orbits)**, যা তাদের সম্পূর্ণ **নিশাচর পতঙ্গভুক** জীবনধারার স্পষ্ট প্রমাণ।
- **শ্রবণ নালী ও চোখের প্লেট:** খুলির কানের অংশে নলাকার এক্টোটাইম্প্যানিক টিউব এবং চোখের পেছন অংশ ধীরে ধীরে অস্থি দ্বারা আবদ্ধ হতে শুরু করে—যা আধুনিক **হ্যাপলোরহিনদের** অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য।
- **লম্ফপ্রদানকারী চলন:** এদের গোড়ালির ক্যালকেনিয়াস ও নেভিকুলার হাড় ছিল প্রসারিত, যা খাড়া ডাল আঁকড়ে ধরে ক্ষিপ্র গতিতে লাফানোর শক্তি জোগাত—বর্তমান টার্সিয়ারদের মতোই। এরাই আজকের বানর, বনমানুষ ও মানুষের মূল ভিত্তি।

৩. পিইটিএম মহাউষ্ণায়ন এবং আর্কটিক হাইওয়ে দিয়ে বিশ্বজয়

কীভাবে কোনো উড়ন্ত বা সামুদ্রিক ক্ষমতা ছাড়া ইউপ্রাইমেটরা ঠিক ৫ কোটি ৬০ লাখ বছর পূর্বে একই সাথে এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল? এই ধাঁধার উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম চরম উষ্ণায়ন ঘটনায়: **প্যালিওসিন-ইওসিন থার্মাল ম্যাক্সিমাম (PETM)**।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৪.৩: পিইটিএম জলবায়ু শক এবং প্রাইমেটদের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি। বামে: ৫৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে বায়ুমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণের ফলে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা মাত্র বিশ হাজার বছরে +৫° থেকে +৮° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়। ডানে: বর্তমান বরফাবৃত উত্তর মেরুর বেরিঞ্জিয়ান ও থুলিয়ান ল্যান্ডব্রিজে বরফহীন উষ্ণমণ্ডলীয় পাম ও সাইপ্রেস বনভূমি সৃষ্টি হয়, যার ওপর দিয়ে ক্ষুদ্র প্রাইমেট টেইলহার্ডিনা মাত্র ২৫,০০০ বছরের মধ্যে এশিয়া থেকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

পিইটিএম-এর ভূরাসায়নিক প্রক্রিয়া

প্রায় ৫৬.০ Ma-তে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং সমুদ্রের তলদেশের মিথেন ক্ল্যাথ্রেট (CH_4) গলে যাওয়ার কারণে আনুমানিক ৪,৫০০\text{–}৬,০০০\text{ গিগাটন} হালকা কার্বন বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত হয়। কার্বন আইসোটোপ এক্সকারশনে ($\delta^{13}C$) ৩ থেকে ৫ পারমিল ঋণাত্মক পতন ঘটে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ১,৫০০ ppm ছাড়িয়ে যায়।

এর ফলে বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা মাত্র ২০,০০০ বছরের মধ্যে **৫° থেকে ৮° সেলসিয়াস বেড়ে যায়**। উত্তর মেরুর ৭৫ ডিগ্রি অক্ষাংশে (বর্তমান কানাডার এলসমিয়ার দ্বীপ ও নরওয়ের স্পিটসবার্গেনে) কোনো বরফ ছিল না; সেখানে জন্ম নিয়েছিল পাম গাছ ও সাইপ্রেস জলাভূমি, যেখানে ঘুরে বেড়াত কুমির ও কচ্ছপ।

বৃক্ষচারী আর্কটিক হাইওয়ে

যেহেতু সুদূর উত্তর মেরুতেও হিমশীতল শীতকাল ছিল না এবং ঘন রেইনফরেস্ট বিস্তৃত ছিল, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যকার **বেরিঞ্জিয়া সেতু** এবং উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যকার **থুলিয়ান ল্যান্ডব্রিজ** অবিচ্ছিন্ন সবুজ ছাউনিতে পরিণত হয়। ঠান্ডায় বাঁচতে অক্ষম ক্ষুদ্র প্রাইমেটরা গাছ থেকে মাটিতে না নেমেই মহাদেশ থেকে মহাদেশে পাড়ি জমায়।

জীবাশ্মবিদ ফিলিপ জিঞ্জেরিখের গবেষণায় দেখা গেছে, ক্ষুদ্র ওমোমাইয়েড *Teilhardina* মাত্র ২৫,০০০ বছরের কম সময়ের মধ্যে এশিয়া (*T. asiatica*), ইউরোপ (*T. belgica*) এবং উত্তর আমেরিকায় (*T. brandti*) বিস্তার লাভ করে। এই মহাউষ্ণায়নের করিডোরই প্রাইমেটদের উত্তর গোলার্ধের প্রতিটি বনে স্থায়ী আসন করে দেয়।

৪. মস্তিষ্ক সম্প্রসারণ এবং নৃবিজ্ঞানীদের পূর্বসূরি (Anthropoidea)

বৃক্ষচারী পরিবেশ কেবল শারীরিক চলনই পরিবর্তন করেনি, তা ঘটায় স্নায়বিক বিপ্লব। দেহের ওজনের অনুপাতে মস্তিষ্কের আকার বা **এনসেফালাইজেশন কোটিয়েন্ট** (EQ) সমসাময়িক অন্য যেকোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

উঁচু শাখাপ্রশাখায় বিচরণের জন্য প্রয়োজন ছিল উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা:

- **ত্রিমাত্রিক স্থানিক মানচিত্রায়ন:** একটি ডাল থেকে অন্য ডালে লাফ দেওয়ার সময় দূরত্ব, বাতাসের গতি এবং ডালের নমনীয়তা তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব করার জন্য প্যারাইটাল কর্টেক্স ও সেরিবেলামের প্রভূত বিকাশ ঘটে।
- **স্মৃতিশক্তি ও খাদ্যের প্রাচুর্য:** বিশাল জঙ্গলে কোন ডালে কখন ফল পাকবে তা মনে রাখা এবং সেই গাছে পৌঁছানোর সংক্ষিপ্ত পথ মনে রাখার ক্ষমতা যেসব প্রাইমেটের বেশি ছিল, তারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে এগিয়ে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস ও টেম্পোরাল লোব সম্প্রসারিত হয়।
- **দৃষ্টি কর্টেক্সের প্রাধান্য:** মস্তিষ্কের পেছনের অক্সিপিটাল লোব প্রায় সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত হয় এবং জটিল রঙ ও টেক্সচার বোঝার নতুন নিউরাল সার্কিট ($V1, V2, V4$) গঠিত হয়।

ইওসিন যুগের শেষে জলবায়ু যখন পুনরায় শীতল হতে শুরু করে, তখন এই বৃহৎ মস্তিষ্কের চতুর প্রাইমেটরাই জন্ম দেয় পরবর্তী মহান ট্যাক্সনের: **অ্যানথ্রোপয়েডিয়া (Anthropoidea)**—যাদের বংশধারায় পরবর্তীতে বিবর্তিত হবে প্রাচীন বানর, উল্লুক এবং শেষ পর্যন্ত মানব প্রজাতি।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্যালিওজিন স্তন্যপায়ী মহাবিস্ফোরণ এবং প্রাইমেটদের প্রথম পদচিহ্ন"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১৪। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-14-the-paleogene-mammalian-explosion-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চদশ খণ্ড

ক্যাটারাইন বিভাজন: ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টি এবং মায়োসিন নরবানর মহাজাগরণ

ক্যাটারাইন বিভাজন: ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টি এবং মায়োসিন নরবানর মহাজাগরণ

1,373 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



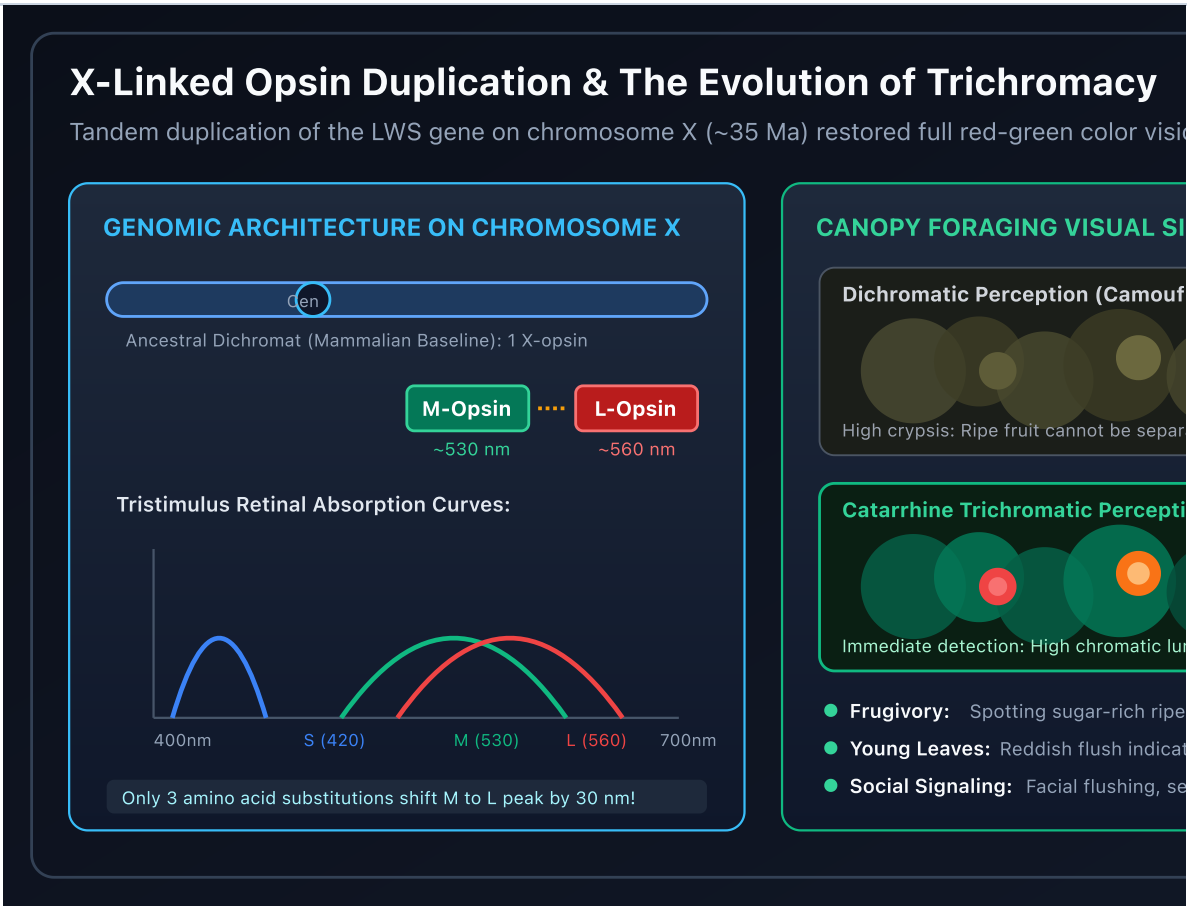
চিত্র ১৫: *চিত্র: পূর্ব আফ্রিকার মায়োসিন অরণ্যে আদিম হোমিনিড লেজহীন বনমানুষ প্রকনসাল (Proconsul africanus, ~১৮ মিলিয়ন বছর আগে), যা লেজবিহীন কঙ্কাল এবং আধুনিক বনমানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বহন করছে।*

তিন কোটি চল্লিশ লাখ বছর পূর্বে ইওসিন-অলিগোসিন যুগসন্ধিতে পৃথিবীর জলবায়ুতে ঘটে তীব্র পতন। মেরু অঞ্চলের উষ্ণমণ্ডলীয় রেইনফরেস্ট পরিণত হয় বরফের চাদরে। এই বৈরী পরিবেশে আফ্রিকা ও আরব অঞ্চলের বেঁচে থাকা অ্যানথ্রোপয়েড প্রাইমেটদের মাঝে ঘটে এক যুগান্তকারী বিভাজন: **প্লাটিরহিনি** (চ্যাপ্টা নাকের নিউ ওয়ার্ল্ড বানর, যারা সরু আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছিল) এবং আমাদের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ **ক্যাটারাইনি** (নিচের দিকে মুখ করা নাকের ওল্ড ওয়ার্ল্ড বানর ও নরবানর)। পরবর্তী দুই কোটি বছরে ক্যাটারাইনদের মধ্যে ঘটে তিনটি অসামান্য জৈবিক মাইলফলক: এক্স ক্রোমোজোমে জিন ডুপ্লিকেশনের মাধ্যমে পূর্ণ রঙিন বা ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধার, একটি জাম্পিং জিনের অনুপ্রবেশের ফলে লেজের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং মায়োসিন যুগে খাড়া শরীরের বৃক্ষচারী নরবানরদের (Hominoidea) অবিস্মরণীয় মহাজাগরণ।

১. অপসিন জিন ডুপ্লিকেশন: ট্রাইক্রোম্যাটিক রঙিন জগতের পুনরুদ্ধার

পর্ব ১৩-তে আমরা দেখেছি যে মেসোজোয়িক যুগের ১৫ কোটি বছরের নিশাচর জীবনে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের দুটি অপসিন জিন ($SWS2$ ও $Rh2$) হারিয়েছিল। এর ফলে আদি প্ল্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ীরা পরিণত হয়েছিল ডাইক্রোম্যাট বা লাল-সবুজ বর্ণান্ধ প্রাণীতে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আদি প্রাইমেটরা কেবল নীল ($SWS1$) এবং সবুজ-হলুদ (LWS) অপসিন দিয়ে বিশ্ব অবলোকন করেছে।

প্রায় ৩ কোটি থেকে ৩ কোটি ৫০ লাখ বছর পূর্বে মিশরের ফায়ুম অববাহিকায় বসবাসকারী ক্যাটারাইন পূর্বপুরুষদের এক্স ক্রোমোজোমে একটি অসম হোমোলোগাস ক্রসিং-ওভার ঘটে। এর ফলে LWS অপসিন জিনটির একটি **ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশন (Tandem Duplication)** ঘটে এবং একই ক্রোমোজোমে দুটি পাশাপাশি অনুরূপ অপসিন জিনের সৃষ্টি হয়:



চিত্র ১৫.১: ট্রাইক্রোম্যাটিক রঙিন দৃষ্টির জেনেটিক পুনরুদ্ধার। বামে: এক্স ক্রোমোজোমে ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশনের মাধ্যমে এম-অপসিন (~৫৩০ ন্যানোমিটার) ও এল-অপসিন (~৫৬০ ন্যানোমিটার)-এর উদ্ভব, যা মূলত মাত্র কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তনের ফল। ডানে: বনাঞ্চলের সিমুলেশন—ডাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাকা ফল যেখানে পাতার সাথে মিশে থাকে, ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টিতে উজ্জ্বল লাল-কমলা ফল তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ে।

ফাইভ-সাইটস নিয়ম ও অপসিন টিউনিং

জিনতত্ত্ববিদ জেরেমি নাথান্স ও জেরাল্ড জ্যাকবস প্রমাণ করেন যে, জিন ডুপ্লিকেশনের পর মাত্র **তিন থেকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতিস্থাপন** একটি অপসিন জিনের আলোক শোষণ ক্ষমতাকে (λ_{max}) প্রায় ৩০ ন্যানোমিটার ডানদিকে সরিয়ে দেয়:

- আদি রূপটি **এম-অপসিন (Medium-Wavelength Sensitive)** হিসেবে $\lambda_{max} \approx ৫৩০\ \text{nm}$ (সবুজ আলো) শোষণ করে।
- নতুন মিউট্যান্ট রূপটি **এল-অপসিন (Long-Wavelength Sensitive)** হিসেবে $\lambda_{max} \approx ৫৬০\ \text{nm}$ (লাল আলো) শোষণ করে।

৭ নম্বর অটোজোমাল ক্রোমোজোমে থাকা নীল আলোর অপসিনের ($SWS1$, $\lambda_{max} \approx ৪২০\ \text{nm}$) সাথে যুক্ত হয়ে ক্যাটারাইন প্রাইমেটরা ফিরে পায় **রুটিন ট্রাইক্রোম্যাসি (Trichromacy)**। দক্ষিণ আমেরিকার বানরদের ক্ষেত্রে যেখানে ট্রাইক্রোম্যাসি কেবল কিছু স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, ক্যাটারাইনদের (ওল্ড ওয়ার্ল্ড বানর, বনমানুষ ও মানুষ) প্রতিটি পুরুষ ও নারী সন্তান বংশপরম্পরায় সম্পূর্ণ রঙিন দৃষ্টি লাভ করে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের তিনটি চালিকাশক্তি

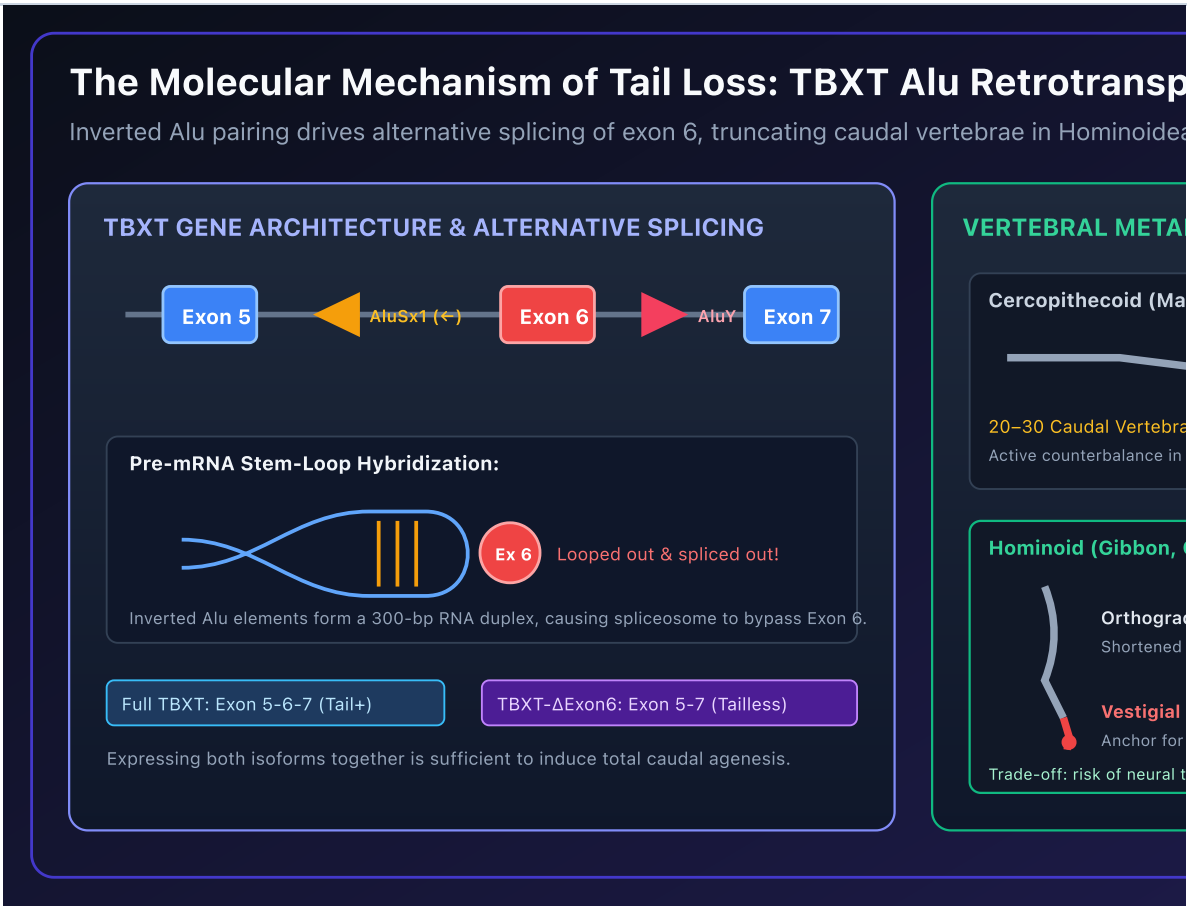
1. **পাকা ফলের প্রাচুর্য (Frugivory):** পাকা ডুমুর ও মিষ্টি ফল লাল ও হলুদ তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রতিফলিত করে। ডাইক্রোম্যাটের চোখে সবুজ পাতার ভেতর লাল ফল সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে; ট্রাইক্রোম্যাটদের চোখে তা শত মিটার দূর থেকেও ভাস্বর হয়ে ওঠে।
2. **কচি পাতার পুষ্টি (Folivory):** গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনে পুরোনো শক্ত পাতা সেলুলোজ ও বিষাক্ত ট্যানিনে পূর্ণ থাকে। অন্যদিকে কচি পাতা প্রোটিনে ভরপুর থাকে এবং অ্যান্থোসায়ানিনের কারণে লালচে বা তামাটে দেখায়। রঙিন দৃষ্টি কচি পাতা শনাক্ত করা সহজ করে তোলে।
3. **সামাজিক ও প্রজনন সংকেত:** ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টির ফলেই মুখমণ্ডলের রক্তিম আভা, রাগ ও প্রজনন ঋতুর ত্বকের ফোলাভাব শনাক্ত করা সম্ভব হয়, যা সমাজবদ্ধ প্রাইমেটদের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

২. লেজ বিলুপ্তির আণবিক রহস্য: টিবিএক্সটি (TBXT) অ্যালু অনুপ্রবেশ

প্রাইমেট বিবর্তনের প্রথম চার কোটি বছর পর্যন্ত প্রতিটি জীবাশ্ম প্রাইমেটের একটি কার্যকর দীর্ঘ লেজ ছিল। ডালে দ্রুত চলাফেরার সময় লেজ ছিল শারীরিক ভারসাম্য রক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু ঠিক **২ কোটি ৫০ লাখ বছর পূর্বে** সমস্ত নরবানর ও মানুষের অভিন্ন পূর্বপুরুষদের (হমিনয়েড বা Hominoidea) দেহ থেকে বহিঃস্থ লেজ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তা রূপান্তরিত হয় মেরুদণ্ডের শেষের ক্ষুদ্র অস্থি **কক্সিস (Coccyx)**-এ।

বহু দশক ধরে লেজ বিলুপ্তির এই জেনেটিক কারণ অজানা ছিল। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিজ্ঞান সাময়িকী *Nature*-এ বো জিয়া ও তার আন্তর্জাতিক গবেষক দল এর চমকপ্রদ আণবিক সমাধান উন্মোচন করেন:

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৫.২: নরবানরদের লেজ বিলুপ্তির আণবিক প্রক্রিয়া। বামে: হমিনয়েড পূর্বপুরুষের TBXT জিনের ইন্ট্রন ৬-এ একটি AluY উপাদান প্রবেশ করে ইন্ট্রন ৫-এ থাকা প্রাচীন AluSx1 উপাদানের সাথে উল্টোভাবে জোড় বাঁধে। এই আরএনএ লুপের কারণে স্প্লাইসোসোম এক্সন ৬-কে বাদ দিয়ে দেয়। ডানে: বানরের ২৫টি কশেরুকাযুক্ত লম্বা লেজ বনাম বনমানুষ ও মানুষের ফিউজড কক্সিস, যা খাড়া শরীরে শ্রোণীদেশের পেশীবহুল ভিত্তি তৈরি করে।

জাম্পিং জিনের কারসাজি

ভ্রূণের লেজ গঠনের জন্য দায়ী একটি অত্যন্ত প্রাচীন মাস্টার জিন হলো *TBXT* (পূর্বে *Brachyury* নামে পরিচিত)। গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে প্রায় আড়াই কোটি বছর পূর্বে নরবানরদের সাধারণ পূর্বপুরুষের *TBXT* জিনের **ইন্ট্রন ৬-এ একটি Alu জাম্পিং জিন (AluY)** প্রবেশ করে।

এর ঠিক পূর্বের *ইন্ট্রন ৫*-এ কোটি বছর আগে থেকেই আরেকটি Alu উপাদান (**AluSx1**) উল্টো বিন্যাসে বিদ্যমান ছিল। যখন ডিএনএ থেকে প্রি-এমআরএনএ গঠিত হয়:

- দুটি বিপরীতমুখী Alu আরএনএ পরস্পরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত হয়ে ৩০০ বেস-পেয়ারের একটি শক্ত হেয়ারপিন লুপ গঠন করে।
- এই ফাঁদে আটকে পড়ে **এক্সন ৬ (Exon 6)** কোষীয় স্প্লাইসিং ব্যবস্থা থেকে আড়াল হয়ে যায়।
- কোষে স্বাভাবিক প্রোটিনের পাশাপাশি এক্সন-৬ বিহীন একটি নতুন প্রোটিন আইসোফর্ম ($TBXT^{\Delta exon6}$) তৈরি হতে থাকে।

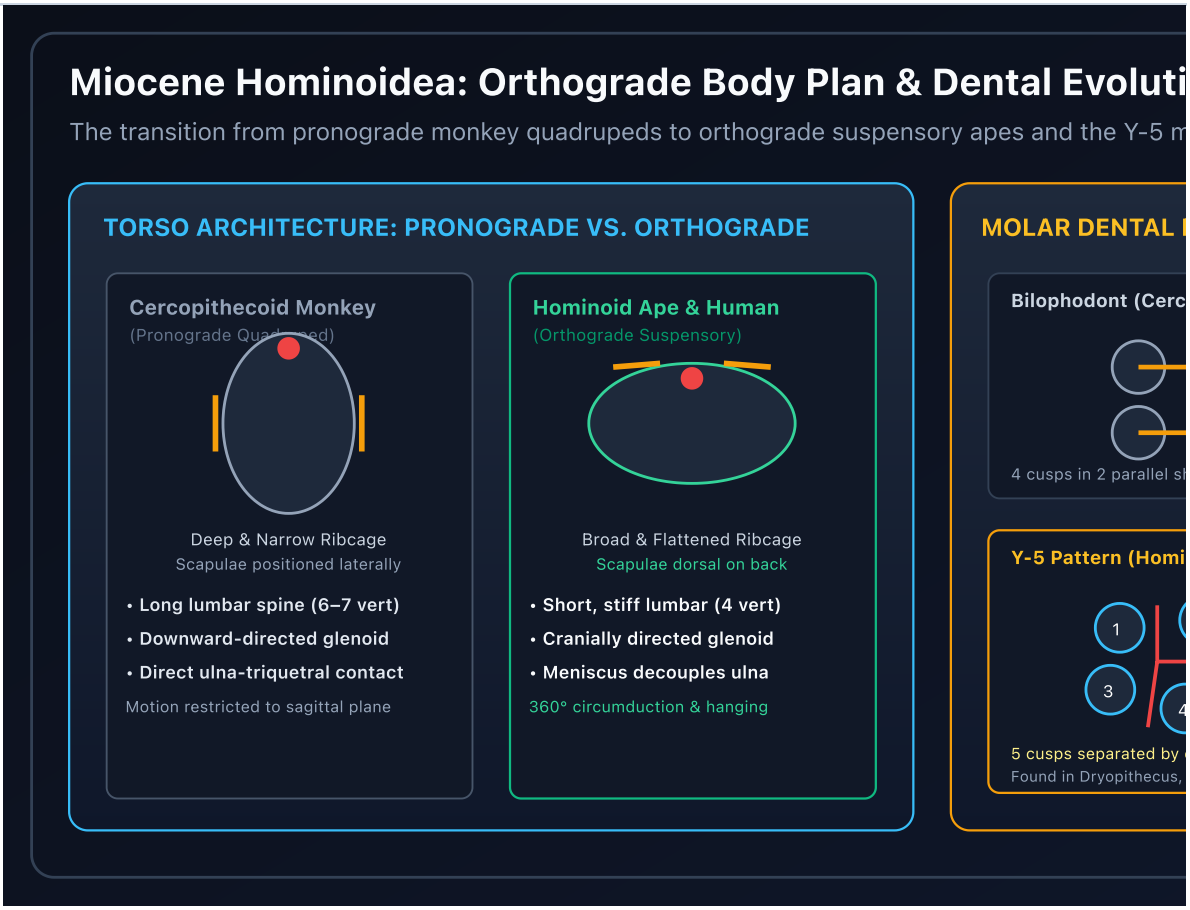
গবেষকরা যখন ল্যাবরেটরির ইঁদুরের জিনোমে এই Alu উপাদানটি প্রতিস্থাপন করেন, তখন আশ্চর্যজনকভাবে ইঁদুরগুলো সম্পূর্ণ লেজবিহীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে! দুটি আইসোফর্মের যুগপৎ উপস্থিতি ভ্রূণের লেজ তৈরির সংকেতকে আটকে দেয়।

বায়োমেকানিক্যাল সুবিধাবাদ ও মূল্য

খাড়াভাবে গাছে চড়া নরবানরদের জন্য ঝুলন্ত লেজ ভারসাম্যের চেয়ে বরং ওজন ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লেজ বিলুপ্তির ফলে শ্রোণীদেশে (Pelvis) একটি শক্তিশালী পেশীবহুল পর্দা (**লেভেটর অ্যানাই কমপ্লেক্স**) গঠিত হতে পেরেছিল, যা পরবর্তীতে খাড়া দুই পায়ে হাঁটার সময় পেটের ভেতরের অঙ্গগুলোকে ধরে রাখার উপযোগী হয়। তবে এর একটি মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে—গবেষকরা দেখেছেন যে এই জিন মিউটেশনের ফলে মেরুদণ্ডের স্নায়ুনালী গঠনের ত্রুটি বা **স্পাইনা বাইফিডা (Spina Bifida)**-র ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আজও মানব সমাজে দেখা যায়।

৩. মায়োসিন নরবানর মহাজাগরণ: খাড়া শারীরিক কাঠামো ও Y-5 মোলার দাঁত

মায়োসিন যুগে (২৩\text{–}৫.৩\text{ Ma}) পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছিল **বনমানুষদের সোনালী যুগ**। বর্তমানে পৃথিবীতে মাত্র পাঁচটি গণের নরবানর বেঁচে আছে (গিবন, ওরাংওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও মানুষ); কিন্তু মায়োসিন যুগে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে দাপিয়ে বেড়াত **৪০টিরও বেশি বিলুপ্ত গণ এবং ১০০টিরও বেশি প্রজাতি**।



চিত্র ১৫.৩: মায়োসিন হোমিনিডের রূপান্তর। বামে: চারপায়ে চলা বানরের চাপা ও গভীর পাঁজর বনাম নরবানর ও মানুষের চওড়া ও অগভীর পাঁজর, পিঠের ওপর স্ক্যাপুলা এবং ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরতে সক্ষম কাঁধের জয়েন্ট। ডানে: বানরের চার-শৃঙ্গযুক্ত বাইলোফোডন্ট মোলার দাঁত বনাম হোমিনয়েডের পাঁচটি শৃঙ্গ ও ইংরেজি 'Y' আকৃতির খাঁজযুক্ত বিখ্যাত Y-5 মোলার দাঁত।

অর্থোগ্রেড শারীরিক বিপ্লব

প্রারম্ভিক মায়োসিনের *Proconsul* (২০ Ma) মূলত ডালের ওপর চারপায়ে দৌড়াত। কিন্তু মধ্য ও শেষ মায়োসিনে *Morotopithecus*, *Pierolapithecus* এবং *Dryopithecus*-এর মতো বনমানুষরা চতুষ্পদ শারীরিক কাঠামো ভেঙে তৈরি করে **অর্থোগ্রেড বা খাড়া ঝুলন্ত শারীরিক গড়ন**:

1. **চওড়া ও অগভীর পাঁজর:** চারপায়ে হাঁটা বানরের পাঁজর দুই পাশ থেকে চাপা ও গভীর। নরবানরদের পাঁজর সামনে-পেছনে চ্যাপ্টা ও ডানে-বামে চওড়া হয়ে ওঠে, যা শরীরের ভারকেন্দ্রকে মেরুদণ্ডের কাছে নিয়ে আসে।
2. **পিঠের স্ক্যাপুলা ও ঊর্ধ্বমুখী শোল্ডার সকেট:** কাঁধের হাড় (স্ক্যাপুলা) পাঁজরের দুই পাশ থেকে সরে গিয়ে সরাসরি পিঠের পেছনের অংশে বসে যায়। কাঁধের গ্লেনয়েড ক্যাভিটি ওপরের দিকে মুখ করে, যা হাতকে ৩৬০ ডিগ্রি বৃত্তাকারে ঘোরানো এবং ডাল ধরে শরীর ঝুলিয়ে রাখার অসাধারণ সক্ষমতা এনে দেয়।
3. **কবজির মেনিস্কাস ডিস্ক:** বানরদের উলনা হাড় সরাসরি কবজির সাথে সংযুক্ত থাকে। নরবানরদের ক্ষেত্রে উলনা হাড় কবজি থেকে কিছুটা সরে যায় এবং মাঝে একটি কার্টিলেজ বা মেনিস্কাস যুক্ত হয়, যা কবজিকে অবাধে ঘুরানোর ক্ষমতা দেয়।
4. **সংক্ষিপ্ত ও অনমনীয় কটিদেশ (Lumbar Spine):** বানরের মতো দীর্ঘ ও নমনীয় কোমরের পরিবর্তে নরবানরদের কোমরের কশেরুকা ৪-৫টিতে নেমে আসে, যা খাড়া আরোহণের সময় পিঠকে অনড় ও স্থিতিশীল রাখে।

জীবাশ্মের পরিচয়: Y-5 মোলার দাঁতের প্যাটার্ন

জীবাশ্মের কঙ্কাল অক্ষত না থাকলেও দাঁতের গঠন দেখে নৃবিজ্ঞানীরা বানর ও নরবানরের পার্থক্য নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। যেখানে ওল্ড ওয়ার্ল্ড বানরদের মোলার দাঁতে চারটি শৃঙ্গ দুটি সমান্তরাল শৈলশিরায় বিভক্ত থাকে (**বাইলোফোডন্ট প্যাটার্ন**), সেখানে নরবানর ও মানুষের চোয়ালে সংরক্ষিত রয়েছে আদিম **Y-5 মোলার প্যাটার্ন**:

- নিচের চোয়ালের মোলার দাঁতে **পাঁচটি সুনির্দিষ্ট চূড়া বা শৃঙ্গ** থাকে।
- দ্বিতীয় ও তৃতীয় শৃঙ্গের সংযোগকারী খাঁজগুলো স্পষ্টভাবে ইংরেজি **'Y' অক্ষরের আকৃতি** ধারণ করে।

ইউরোপের ১ কোটি ২০ লাখ বছরের প্রাচীন *Dryopithecus* থেকে শুরু করে বর্তমান শিম্পাঞ্জি এবং আপনার নিজের নিচের মাড়ির দাঁত পর্যন্ত এই Y-5 নকশাটি আমাদের মায়োসিন নরবানর ঐতিহ্যের এক অনপনেয় স্বাক্ষর।

৪. অন্ত্য মায়োসিনের সংকট ও মানবজাতির পূর্বসূরিদের প্রস্তুতি

এক কোটি থেকে ৬০ লাখ বছর পূর্বে পৃথিবীর জলবায়ু আবারো বদলে যেতে থাকে। টেথিস সাগর বন্ধ হয়ে যায় এবং পূর্ব আফ্রিকান রিফ্ট ভ্যালির উত্থান ঘটে। জলবায়ু হয়ে ওঠে শীতল ও শুষ্ক।

ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তৃত সাবট্রপিক্যাল বনভূমি সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় সেখানকার বৈচিত্র্যময় বনমানুষরা—যেমন *Dryopithecus* ও বিশালাকার তিন মিটার লম্বা *Gigantopithecus*—ধীরে ধীরে বিলুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু আফ্রিকার ঘন নিরক্ষীয় বনভূমি ভেঙে তৈরি হয় উন্মুক্ত বনভূমি ও ঘাসযুক্ত সাভানার এক বিচিত্র মোজাইক পরিবেশ।

Shakil Mahmud • Research Monograph

এই পরিবর্তিত আফ্রিকান বনভূমিতে খাড়া শরীরের, রঙিন দৃষ্টিসম্পন্ন, বৃহৎ মস্তিষ্কের একদল নরবানর গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে এক নতুন বিবর্তনীয় পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। গাছের মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় ডাল থেকে ডালে না গিয়ে মাটিতে দুই পায়ে হেঁটে চলাই হয়ে ওঠে বাঁচার একমাত্র উপায়। শুরু হয় মহান গ্রেট এপ বিভাজন এবং মানব বিবর্তনের পরবর্তী রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ক্যাটারাইন বিভাজন: ট্রাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টি এবং মায়োসিন নরবানর মহাজাগরণ"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১৫। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-15-the-catarrhine-split-and-miocene-apes-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষোড়শ খণ্ড

গ্রেট এপ বিভাজন এবং দ্বিপদ চলনের বায়োমেকানিক্স

গ্রেট এপ বিভাজন এবং দ্বিপদ চলনের বায়োমেকানিক্স

1,383 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



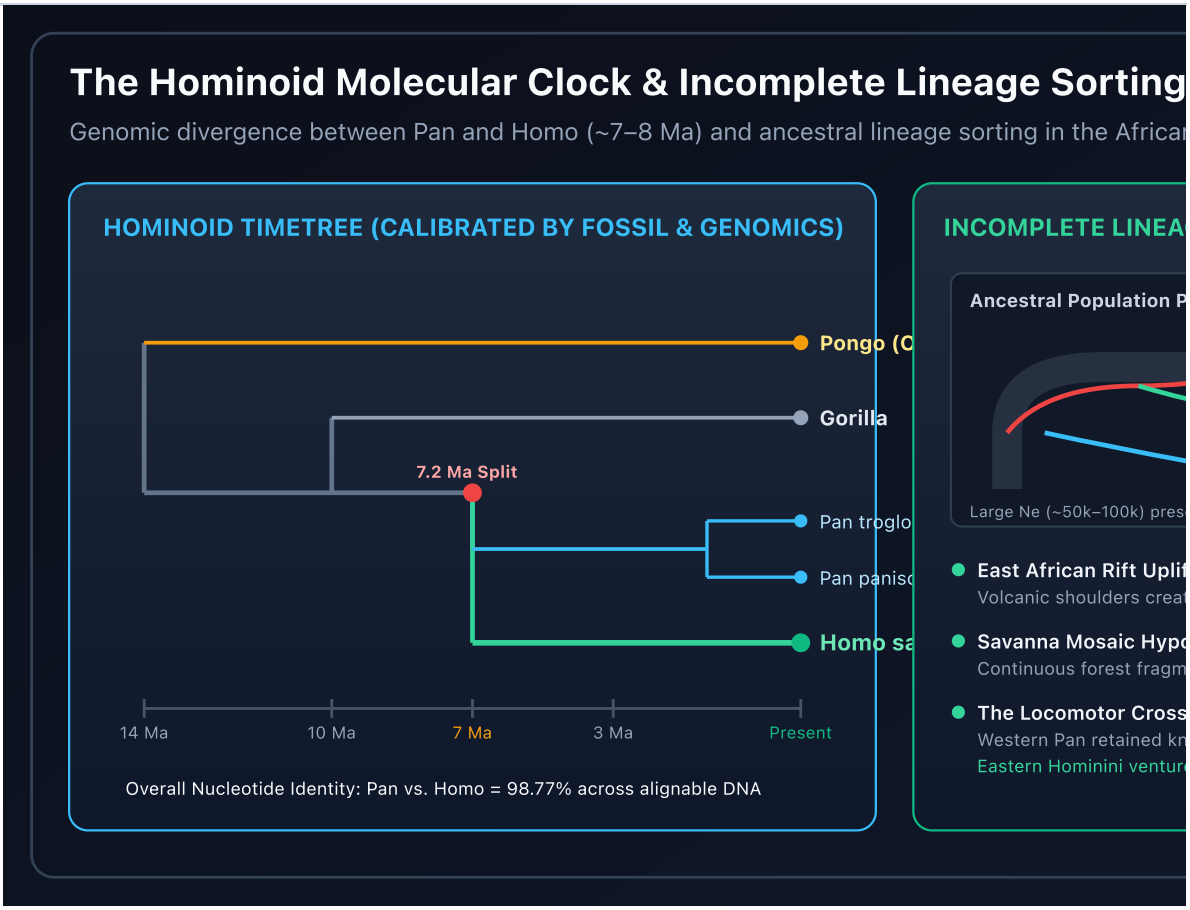
চিত্র ১৬: *চিত্র: দ্বিপদী চলার আদিম সূচনা: ইথিওপিয়ার প্রাচীন অরণ্যে সোজা হয়ে হেঁটে চলা আদিম হোমিনিন আরডিপিথেকাস রামিডাস (Ardipithecus ramidus / 'Ardi', ~৪.৪ মিলিয়ন বছর আগে)।*

সাত থেকে আট মিলিয়ন বছর পূর্বে নিরক্ষীয় আফ্রিকার টেকটোনিক ভূপ্রকৃতিতে মানব বিবর্তনের ইতিহাসে ঘটেছিল চরম রূপান্তর: গ্রেট এপ বা বনমানুষদের বংশধারা থেকে আমাদের প্রত্যক্ষ মানব পূর্বপুরুষদের (ট্রাইব **হোমিনিনি**) চূড়ান্ত বিভাজন ঘটে শিম্পাঞ্জি ও বোনোবোর (গণ **প্যান**) পূর্বপুরুষদের সাথে। যদিও একক নিউক্লিওটাইড স্তরে আমাদের ডিএনএ এখনো তাদের সাথে ৯৮.৭৭% অভিন্ন, এই বিভাজনের মাধ্যমেই স্তন্যপায়ী প্রাণিজগতের সবচেয়ে নাটকীয় শারীরিক রূপান্তরের সূচনা হয়েছিল: **অভ্যাসগত দ্বিপদ চলন বা বাইপেডালিজম (Habitual Bipedalism)**। চারপায়ে মাটিতে হাঁটা ও নাকল-ওয়াকিং পরিহার করে আমাদের পূর্বপুরুষরা দাঁড়িয়েছিল সোজা দুটি পায়ের ওপর—একটি বায়োমেকানিক্যাল অলৌকিকতা যা আমাদের শ্রোণীদেশ বা পেলভিস পুনর্গঠন করেছিল, পায়ের পেশীগুলোকে নতুন রূপ দিয়েছিল এবং হাতের পাঞ্জাকে মুক্ত করে দিয়েছিল হাতিয়ার ও বিশ্বজয়ের জন্য।

১. প্যান-হোমো বিভাজন ও আণবিক ঘড়ি (Molecular Clock)

১৮৭১ সালে চার্লস ডারউইন তার *The Descent of Man* গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যেহেতু গরিলা ও শিম্পাঞ্জি শারীরিক গঠনে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি, তাই আফ্রিকা মহাদেশই মানবজাতির আদি জন্মভূমি। এক শতাব্দী পরে অ্যালান উইলসন ও ভিনসেন্ট সারিচ প্রোটিন ও ডিএনএ ক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে **আণবিক ঘড়ি (Molecular Clock)** নিখুঁতভাবে ক্রমাঙ্কন করে ডারউইনের ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করেন। তারা দেখান যে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির বিভাজন কোটি কোটি বছর আগে নয়, ঘটেছিল অন্ত্য মায়োসিন যুগে মাত্র **৭০ থেকে ৮০ লাখ বছর পূর্বে** (**৭\text{–}৮\text{ Ma}**):

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৬.১: হোমিনয়েড আণবিক ঘড়ি ও লিনিয়েজ সর্টিং। বামে: আণবিক সময়রেখা যাতে ওরাংওটাং (~১৪ Ma), গরিলা (~১০ Ma), প্যান-হোমো বিভাজন (~৭.২ Ma) এবং শিম্পাঞ্জি-বোনোর বিভাজন (~১.৮ Ma) প্রদর্শিত। ডানে: ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ সর্টিং (ILS)—কীভাবে আদিম বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কারণে মানুষের জিনোমের প্রায় ১.৫% শিম্পাঞ্জির চেয়ে গরিলার সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও সামগ্রিকভাবে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোম ৯৮.৭৭% অভিন্ন।

ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ সর্টিং (ILS)

সম্পূর্ণ মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করেছে এক অদ্ভুত রহস্য: যদিও মানুষ ও শিম্পাঞ্জি নিকটতম ট্যাক্সন, তবুও **আমাদের জিনোমের প্রায় ১.৫% অংশ শিম্পাঞ্জির চেয়ে গরিলার সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ**! জিনতত্ত্বে একে বলা হয় **ইনকমপ্লিট লিনিয়েজ সর্টিং (ILS)**। এর কারণ হলো গরিলা ও শিম্পাঞ্জির বিভাজনের পূর্বে আদিম হোমিনিনদের জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত বিশাল ($N_e \approx ৫০,০০০\text{–}১০০,০০০$ ব্যক্তি)। এই বিশাল বৈচিত্র্যের কারণে কিছু পলিমরফিক অ্যালিল পরবর্তী প্রজাতি বিভাজনের ভেতরেও অক্ষত থেকে গেছে।

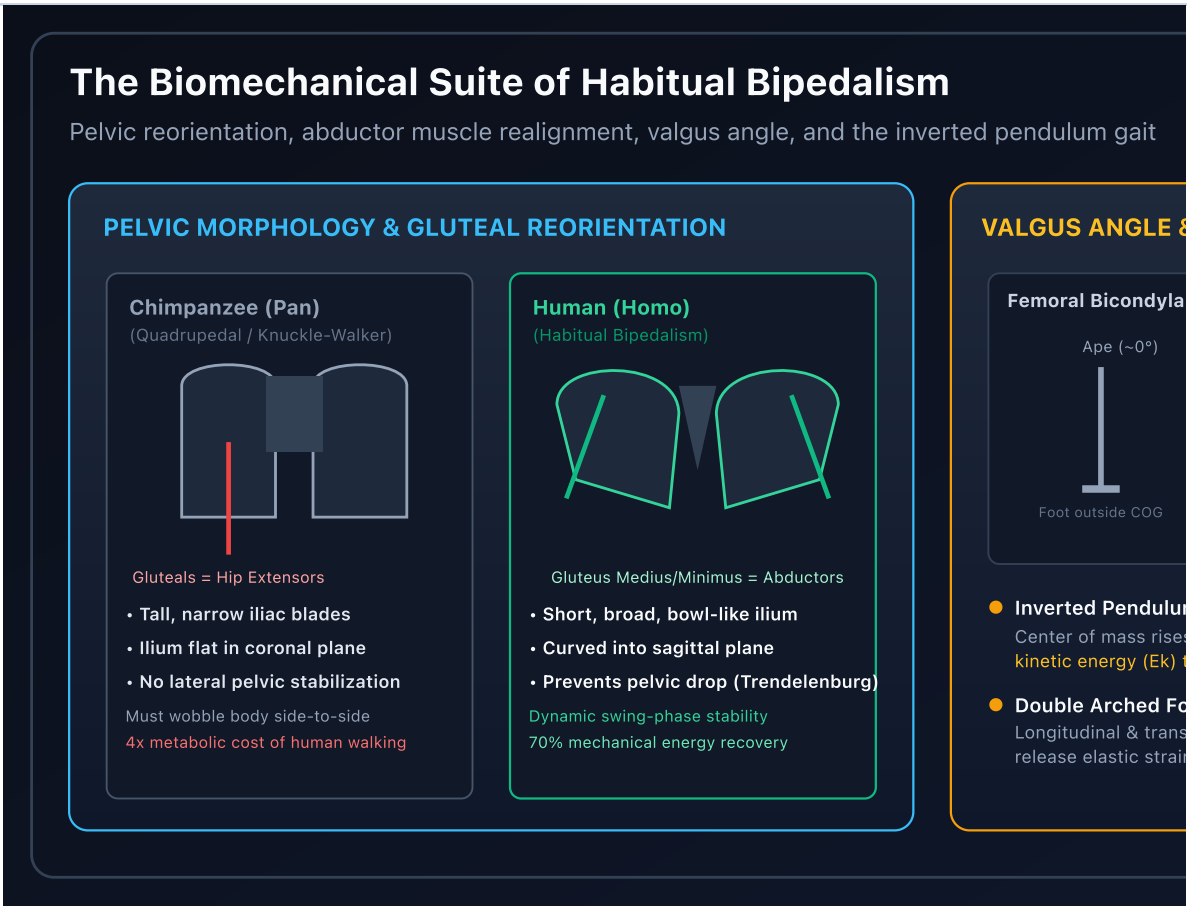
পূর্ব আফ্রিকান রিফ্টের টেকটোনিক ইঞ্জিন

কী কারণে এই বিভাজন ঘটেছিল? ভূবিজ্ঞানী ও প্যালিওক্লাইমেটোলজিস্টরা চিহ্নিত করেছেন **পূর্ব আফ্রিকান রিফ্ট ভ্যালি**র আকস্মিক উত্থানকে। এক কোটি থেকে ৬০ লাখ বছর পূর্বে আফ্রিকার টেকটোনিক প্লেট ফেটে দুই ভাগ হতে শুরু করে এবং রিফ্টের পাহাড়গুলো হাজার হাজার মিটার ওপরে উঠে যায়। এই সুবিশাল পর্বতমালা সৃষ্টি করে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rain Shadow): পশ্চিম আফ্রিকায় কঙ্গো অববাহিকার রেইনফরেস্টে যখন বৃষ্টি অব্যাহত ছিল (যেখানে শিম্পাঞ্জির পূর্বপুরুষরা রয়ে যায়), পূর্ব আফ্রিকা তখন হয়ে ওঠে শীতল, শুষ্ক ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতনির্ভর।

ঘন বনভূমি ভেঙে সৃষ্টি হয় উন্মুক্ত বনাঞ্চল, কাঁটাঝোপ ও সাভানার এক বিচিত্র মোজাইক বাস্তুতন্ত্র। এই উন্মুক্ত পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এক দল প্রাচীন নরবানরকে খাদ্যের সন্ধানে এক বন থেকে অন্য বনে হেঁটে যেতে হতো। এই পরিবর্তনই বাধ্য করে দুই পায়ে দাঁড়াতে।

২. দ্বিপদ চলনের বায়োমেকানিক্যাল অলৌকিকতা

দুটি পায়ের ওপর শরীরের সম্পূর্ণ ভারসাম্য রেখে হাঁটা স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এক বিরল ঘটনা। পাখি বা ডাইনোসররা তাদের লম্বা লেজ দিয়ে অনুভূমিকভাবে ভারসাম্য বজায় রাখত; কিন্তু একমাত্র মানুষই তার শরীরের ওপরের অংশকে খাড়া রেখে দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটতে পারে। আর এই পরিবর্তনের পেছনে ছিল অসাধারণ শক্তি সাশ্রয়ী এক মেকানিজম:



চিত্র ১৬.২: মানব দ্বিপদ চলনের বায়োমেকানিক্স। বামে: শিম্পাঞ্জির লম্বা, চ্যাপ্টা পেলভিস (যা কোমর বাঁকাতে সাহায্য করে) বনাম মানুষের খাটো, চওড়া, বাটির মতো স্যাজিটাল পেলভিস (যা গ্লুটিয়াস মিডিয়াসকে পার্শ্বীয় অ্যাবডাক্টরে রূপান্তরিত করে এক পায়ে ভর দেওয়ার সময় পেলভিস কাত হওয়া রোধ করে)। ডানে: ফিমার অস্থির ৯-১০ ডিগ্রি ভালগাস কোণ, যা শরীরের ভারকেন্দ্রের ঠিক নিচে পা-কে স্থাপন করে উল্টো পেন্ডুলামের মতো শক্তি পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করে।

উল্টো পেন্ডুলাম নীতি (Inverted Pendulum Gait)

মানুষের সাধারণ হাঁটা পদার্থবিজ্ঞানের **উল্টো পেন্ডুলাম নীতি** মেনে চলে। প্রতি পদক্ষেপে যখন একটি পা মাটিতে থাকে, শরীরটি সেই পায়ের ওপর পেন্ডুলামের মতো ভর করে ওপরে ওঠে। সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছালে গতিশক্তি (E_k) রূপান্তরিত হয় মহাকর্ষীয় বিভবশক্তিতে (E_p); আবার পা নিচে নামার সময় বিভবশক্তি ফিরে যায় গতিশক্তিতে।

বায়োমেকানিক্যাল গবেষণায় দেখা গেছে, এই প্রাকৃতিক রূপান্তরের মাধ্যমে শরীর প্রায় **৭০% যান্ত্রিক শক্তি পুনরুদ্ধার** করতে পারে। অন্যদিকে শিম্পাঞ্জির চারপায়ে নাকল-ওয়াকিংয়ে এই শক্তি পুনর্ব্যবহারের কোনো উপায় নেই; ফলে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে একটি শিম্পাঞ্জি মানুষের তুলনায় **চার গুণ বেশি ক্যালোরি ক্ষয় করে**! শুষ্ক আফ্রিকার বিশাল প্রান্তরে খাদ্যের খোঁজে চষে বেড়ানোর জন্য দ্বিপদ চলন আমাদের পূর্বপুরুষদের এক অপরাজেয় মাইলেজ সুবিধা দিয়েছিল।

পেলভিসের বৈপ্লবিক রূপান্তর ও গ্লুটিয়াল পেশী

এই শক্তি সাশ্রয়ী পদক্ষেপের জন্য কঙ্কালতন্ত্রে বিপুল পরিবর্তন আসে:

- **স্যাজিটাল কার্ভেচার:** শিম্পাঞ্জির ইলিয়াম হাড় লম্বা, চ্যাপ্টা এবং পিঠের সমান্তরালে (Coronal plane) অবস্থিত। মানুষের ক্ষেত্রে ইলিয়াম হাড় খাটো ও চওড়া হয়ে পেটের দিকে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে (Sagittal plane) একটি বাটির মতো রূপ নেয়, যা পেটের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে নিচের দিকে পড়ে যাওয়া থেকে আটকে রাখে।
- **গ্লুটিয়াস মিডিয়াসের রূপান্তর:** শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে *গ্লুটিয়াস মিডিয়াস* ও *মিনিমাস* পেশী নিতম্বের পেছনে সংযুক্ত থাকে এবং পা পেছনে ঠেলতে সাহায্য করে। মানুষের ক্ষেত্রে ইলিয়াম সামনে বাঁকা হয়ে যাওয়ায় এই পেশীগুলো উরুর হাড়ের পাশে চলে আসে এবং পরিণত হয় **হিপ অ্যাবডাক্টরে (Abductors)**।
- **ট্রেন্ডেলেনবার্গ সাইন রোধ:** হাঁটার সময় যখন একটি পা বাতাসে থাকে, তখন মাধ্যাকর্ষণের টানে শরীর একদিকে হেলে পড়ার কথা। মানুষের ক্ষেত্রে মাটিতে থাকা পায়ের গ্লুটিয়াস মিডিয়াস পেশী তাৎক্ষণিকভাবে টানটান হয়ে পেলভিসকে সমান্তরাল রাখে। এই মেকানিজম না থাকলে প্রতি পদক্ষেপে মানুষ ডানে-বামে আছড়ে পড়ত।

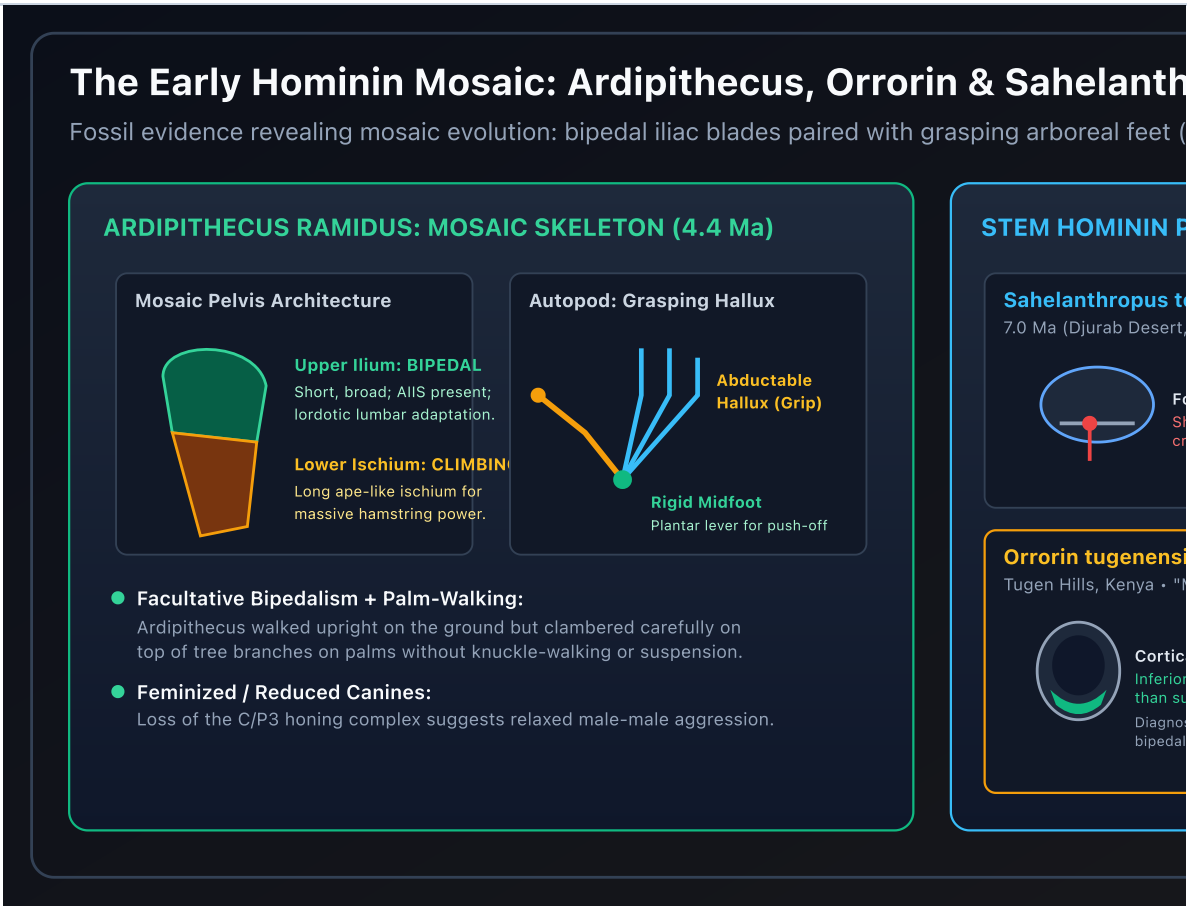
ভালগাস কোণ (Bicondylar Valgus Angle)

শিম্পাঞ্জির উরুর হাড় (Femur) কোমর থেকে সোজাসুজি শূন্য ডিগ্রি কোণে নিচে নেমে যায়; ফলে এক পায়ে দাঁড়ালে শরীরকে মারাত্মক হেলেদুলে ভারসাম্য রাখতে হয়। মানুষের ফিমার হাড় কোমর থেকে ভেতরের দিকে **৯ থেকে ১০ ডিগ্রি কোণে (Valgus Angle)** বাঁকানো থাকে। এর ফলে হাঁটু ও পায়ের পাতা শরীরের প্রাকৃতিক ভারকেন্দ্রের (Center of Gravity) ঠিক নিচে অবস্থান করে, যা অপ্রয়োজনীয় পার্শ্বীয় দোলন পুরোপুরি দূর করে।

৩. প্রাচীন হোমিনিন অগ্রদূত: সাহেলানথ্রোপাস, ওরোসিন ও আর্ডিপিথেকাস

গত দুই দশকে আবিষ্কৃত তিনটি যুগান্তকারী জীবাশ্ম মানব বিবর্তনের সময়রেখাকে ৭০ লাখ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে:

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৬.৩: স্টেম হোমিনিনদের মোজাইক বিবর্তন। বামে: ৪৪ লাখ বছর আগের আর্ডিপিথেকাস রামিডাসের আংশিক কঙ্কাল (আর্ডি), যার উপরের পেলভিস দ্বিপদ চলনের জন্য অভিযোজিত হলেও নিচের অংশে ডালে চড়ার শক্তিশালী পেশীর চিহ্ন এবং পায়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার বুড়ো আঙুল বিদ্যমান। ডানে: সাহেলানথ্রোপাসের সোজা গলার প্রমাণবাহী ফোরামেন ম্যাগনাম (৭০ লাখ বছর) এবং ওরোসিনের দ্বিপদ লোড-বহনকারী ফিমারের কর্টিক্যাল অস্থি (৬০ লাখ বছর)।

১. সাহেলানথ্রোপাস চাদেনসিস (৭০ লাখ বছর, চাদ)

২০০১ সালে মধ্য আফ্রিকার চাদের তোরেস-মেনালা মরুভূমিতে আবিষ্কৃত হয় জীবাশ্ম করোটি **TM 266-01-060 (“তুমাঈ”)**। মস্তিষ্কের আয়তন শিম্পাঞ্জির সমান (৩৬০\text{–}৩৭০\text{ cm}^3) হলেও এটি দুটি সুস্পষ্ট মানব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী:

1. মাথার খুলির যে ছিদ্র দিয়ে মেরুদণ্ডের সুষুম্নাকাণ্ড প্রবেশ করে (**ফোরামেন ম্যাগনাম**), তা বানরের মতো পেছনের দিকে নয়, বরং মানুষের মতোই করোটির তলদেশের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত। এটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে তুমাঈর মাথাটি একটি সোজা, উল্লম্ব গ্রীবার ওপর স্থিত ছিল।
2. ক্যানাইন দাঁতগুলো বনমানুষের মতো বিশাল বা ধারালো নয় এবং এদের মধ্যে সি/পি৩ হনিং কমপ্লেক্স অনুপস্থিত, যা নির্দেশ করে যে পুরুষদের মধ্যে সঙ্গিনী দখলের প্রাণঘাতী কামড়া-কামড়ি হ্রাস পেয়েছিল।

২. ওরোসিন টুজেনেনসিস (৬০ লাখ বছর, কেনিয়া)

২০০০ সালে কেনিয়ার টুজেন পাহাড়ে আবিষ্কৃত “মিলেনিয়াম ম্যান”-এর উরুর হাড়ের (ফিমার) উচ্চ-রেজোলিউশন সিটি স্ক্যানে দেখা গেছে যে, ফিমার নেকের নিচের অংশের কর্টিক্যাল হাড়ের পুরুত্ব উপরের অংশের তুলনায় **তিন গুণেরও বেশি**। এটি প্রমাণ করে যে ওরোসিন নিয়মিত দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত এবং সেই দ্বিপদ গ্রাউন্ড রিঅ্যাকশন বল সহ্য করার জন্যই তার হাড়ে এই অপ্রতিসম দৃঢ়তা তৈরি হয়েছিল।

৩. আর্ডিপিথেকাস রামিডাস (৪৪ লাখ বছর, ইথিওপিয়া) — “আর্ডি”-র মোজাইক রহস্য

২০০৯ সালে টিম হোয়াইট ও তার দল উন্মোচন করেন ইথিওপিয়ার আরামিসে সংরক্ষিত ৪৪ লাখ বছরের প্রাচীন আংশিক কঙ্কাল **“আর্ডি” (ARA-VP-6/500)**। আর্ডি জীববিজ্ঞানের **মোজাইক বিবর্তন (Mosaic Evolution)**-এর সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল:

- **মোজাইক পেলভিস:** পেলভিসের উপরের ইলিয়াম অংশটি ছিল খাটো ও চওড়া, যা প্রমাণ করে আর্ডি মাটিতে দুই পায়ে হাঁটতে পারত। কিন্তু নিচের ইশ্চিয়াম অংশটি ছিল প্রাচীন বনমানুষের মতো লম্বা, যা গাছে চড়ার জন্য বিশাল হ্যামস্ট্রিং পেশীকে ধরে রাখত।
- **আঁকড়ে ধরার পা:** আর্ডির পায়ের বুড়ো আঙুল (Hallux) বনমানুষের মতোই ৯০ ডিগ্রি কোণে বাইরে বের করা যেত, যা দিয়ে সে গাছের ডাল শক্তভাবে আঁকড়ে ধরত। তবে পায়ের মাঝখানের টার্সাল হাড়গুলো ছিল অনমনীয়, যা মাটিতে হাঁটার সময় পা বেঁকে যাওয়া রোধ করত।

৪. সাভানা তত্ত্বের পতন ও নতুন উপলব্ধি

এক শতাব্দী ধরে নৃতাত্ত্বিক বইপত্রে শেখানো হতো যে, ঘন জঙ্গল ছেড়ে উন্মুক্ত ঘাসযুক্ত সাভানায় নামার কারণেই মানুষ দুই পায়ে হাঁটতে শিখেছিল। আর্ডিপিথেকাসের আবিষ্কার এই পুরনো “সাভানা হাইপোথিসিস”-কে চিরতরে ভুল প্রমাণিত করেছে।

আর্ডির সাথে সংরক্ষিত হাজার হাজার জীবাশ্ম বীজ, পাতা এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে আরামিস কোনো শুষ্ক ঘাসভূমি ছিল না; এটি ছিল একটি **ঘন, ছায়াঘেরা সাবট্রপিক্যাল বনাঞ্চল**, যেখানে গাছে ঘুরে বেড়াত কোলোবাইন বানর এবং মাটিতে চরত কুডু হরিণ। আমাদের পূর্বপুরুষরা উন্মুক্ত সাভানায় এসে প্রথম দ্বিপদ হয়নি; বরং গাছের মোটা ডালে সাবধানে ফল সংগ্রহের সময় এবং এক গাছ থেকে অন্য গাছে ফল বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই বনে থাকতেই তাদের মধ্যে দ্বিপদ হাঁটার বীজ রোপিত হয়েছিল।

পরবর্তীতে প্লিওসিন যুগে জলবায়ু যখন আরও বেশি শুষ্ক হয়ে ওঠে, তখন বনাঞ্চলের এই দ্বিপদ অভিযোজনই উন্মুক্ত সাভানায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, যা জন্ম দেয় আমাদের বিবর্তনের পরবর্তী মহাতারকাদের: **অস্ট্রালোপিতেকাস (Australopithecus)**।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "গ্রেট এপ বিভাজন এবং দ্বিপদ চলনের বায়োমেকানিক্স"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১৬। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-16-the-great-ape-split-and-bipedalism-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তদশ খণ্ড

অস্ট্রালোপিতেকাস, লেটোলির পদচিহ্ন এবং রোবাস্ট প্যারানথ্রোপাস

অস্ট্রালোপিতেকাস, লেটোলির পদচিহ্ন এবং রোবাস্ট প্যারানথ্রোপাস

1,321 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

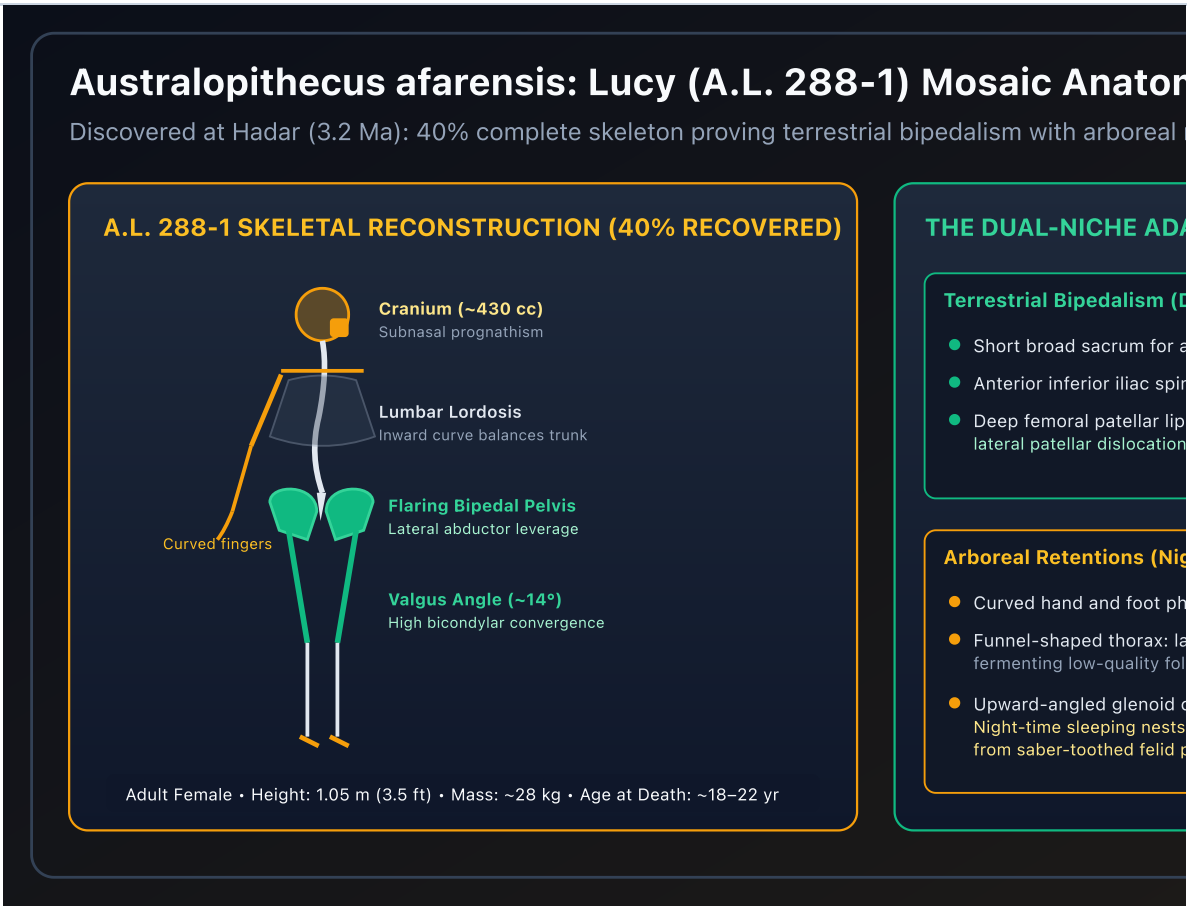


চিত্র ১৭: *চিত্র: অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস (‘লুসি’, ~৩.২ মিলিয়ন বছর আগে)-এর ফরেনসিক পুনর্নির্মাণ; পূর্ব আফ্রিকার সাভানায় সোজা হয়ে হাঁটার ঐতিহাসিক দ্বিপদী রূপ।*

চল্লিশ থেকে বিশ লাখ বছর পূর্বে আফ্রিকান মহাদেশে ঘটেছিল হোমিনিন বিবর্তনের এক বৈচিত্র্যময় মহাবিস্ফোরণ। অন্ত্য মায়োসিনের প্রাথমিক হোমিনিনদের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করে এক অত্যন্ত সফল ট্যাক্সন: **অস্ট্রালোপিতেকাস (Australopithecus)**, যার আভিধানিক অর্থ “দক্ষিণের নরবানর”। গলার নিচ থেকে তাদের শারীরিক কাঠামো ছিল আধুনিক মানুষের মতোই দুই পায়ে সোজা হয়ে হাঁটার উপযোগী; অথচ গলার ওপর তাদের করোটির আকার ছিল শিম্পাঞ্জির মতোই ক্ষুদ্র। তানজানিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাইয়ে তারা রেখে গিয়েছিল ২৭ মিটার দীর্ঘ খালি পায়ের এমন এক পদচিহ্ন, যা লক্ষ লক্ষ বছর পেরিয়ে আজও জীবন্ত। কিন্তু প্লিও-প্লিস্টোসিন যুগসন্ধিতে আফ্রিকা যখন চরম শুষ্ক হয়ে ওঠে, তখন মানব বিবর্তন দুটি বিপরীতমুখী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে: দানবীয় চর্বণক্ষমতাসম্পন্ন **প্যারানথ্রোপাস** এবং মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা ও পাথুরে হাতিয়ারের কারিগর **হোমো**।

১. লুসি (A.L. 288-1) এবং অস্ট্রালোপিতেকাসের অঙ্গসংস্থান

১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর ইথিওপিয়ার হাডার মরুভূমির রৌদ্রদগ্ধ খাদের মধ্যে জীবাশ্মবিদ ডোনাল্ড জোহানসন ও টম গ্রে একটি ডান বাহুর আলনা হাড় আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের খননকাজে আবিষ্কৃত হয় **A.L. 288-1**, যা ইতিহাসে **“লুসি”** নামে বিশ্বখ্যাত হয় (খননক্যাম্পে তখন বাজছিল দ্য বিটলসের গান *Lucy in the Sky with Diamonds*)। ৩২ লাখ বছর আগের এই একটি কঙ্কালের প্রায় **৪০% অংশ অক্ষত অবস্থায়** পাওয়া যায়, যা *অস্ট্রালোপিতেকাস আফারেনসিস* প্রজাতির শারীরস্থানকে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে:



চিত্র ১৭.১: লুসির শারীরস্থান (A.L. 288-1, ৩২ লাখ বছর)। বামে: লুসির ৪০% সংরক্ষিত কঙ্কালের পুনর্গঠন (উচ্চতা: ১.০৫ মিটার, ওজন: ২৮ কেজি, মস্তিষ্কের আয়তন: ~৪৩০ সিসি), যাতে চওড়া দ্বিপদ পেলভিস, কটিদেশের লর্ডোসিস এবং ১৪ ডিগ্রি ফিমার ভালগাস কোণ স্পষ্ট। ডানে: দ্বৈত-পরিবেশীয় জীবনধারা—দিনে মাটিতে সম্পূর্ণ দ্বিপদ চলন এবং রাতে শিকারী স্যাবার-টুথ বিড়াল থেকে বাঁচতে বাঁকানো আঙুল ও ঊর্ধ্বমুখী কাঁধ দিয়ে গাছে বাসা তৈরির সক্ষমতা।

স্থলচর দ্বিপদ চলনের প্রমাণ

লুসির কঙ্কাল মানব বিবর্তনের একটি চরম ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছিল: বিজ্ঞানীরা আগে ভাবতেন আগে মানুষের মস্তিষ্ক বড় হয়েছিল এবং পরে মানুষ দুই পায়ে হাঁটতে শিখেছিল। কিন্তু লুসি প্রমাণ করল যে **মস্তিষ্ক বড় হওয়ার লক্ষ লক্ষ বছর আগেই আমাদের পূর্বপুরুষরা দুই পায়ে পুরোপুরি সোজা হয়ে হাঁটতে শিখেছিল**:

- **দ্বিপদ পেলভিস বা শ্রোণীচক্র:** লুসির ইলিয়াম হাড় ছিল খাটো ও ডানে-বামে চওড়া, যা হাঁটার সময় শরীরের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গ্লুটিয়াল পেশীগুলোকে নিখুঁত যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান করত।
- **লাম্বার লর্ডোসিস:** মেরুদণ্ডের নিচের অংশে ভেতরের দিকে সুস্পষ্ট বাঁক (লর্ডোসিস) ছিল, যা শরীরের উপরিভাগের ভারকেন্দ্রকে সরাসরি নিতম্বের সন্ধির ওপর স্থাপন করত।
- **ভালগাস কোণ (~১৪°):** লুসির উরুর হাড় (Femur) কোমর থেকে ভেতরের দিকে প্রায় ১৪ ডিগ্রি কোণে নেমে এসে হাঁটুর কাছে মিলিত হয়েছিল। খাটো পা ও চওড়া পেলভিসের কারণে লুসির এই কোণ আধুনিক মানুষের (৯\text{–}১০^\circ) চেয়েও বেশি ছিল, যা তাকে হেলেদুলে হাঁটার ক্লান্তি থেকে পুরোপুরি মুক্তি দিয়েছিল।

দ্বৈত-পরিবেশীয় হাইপোথিসিস (Dual-Niche)

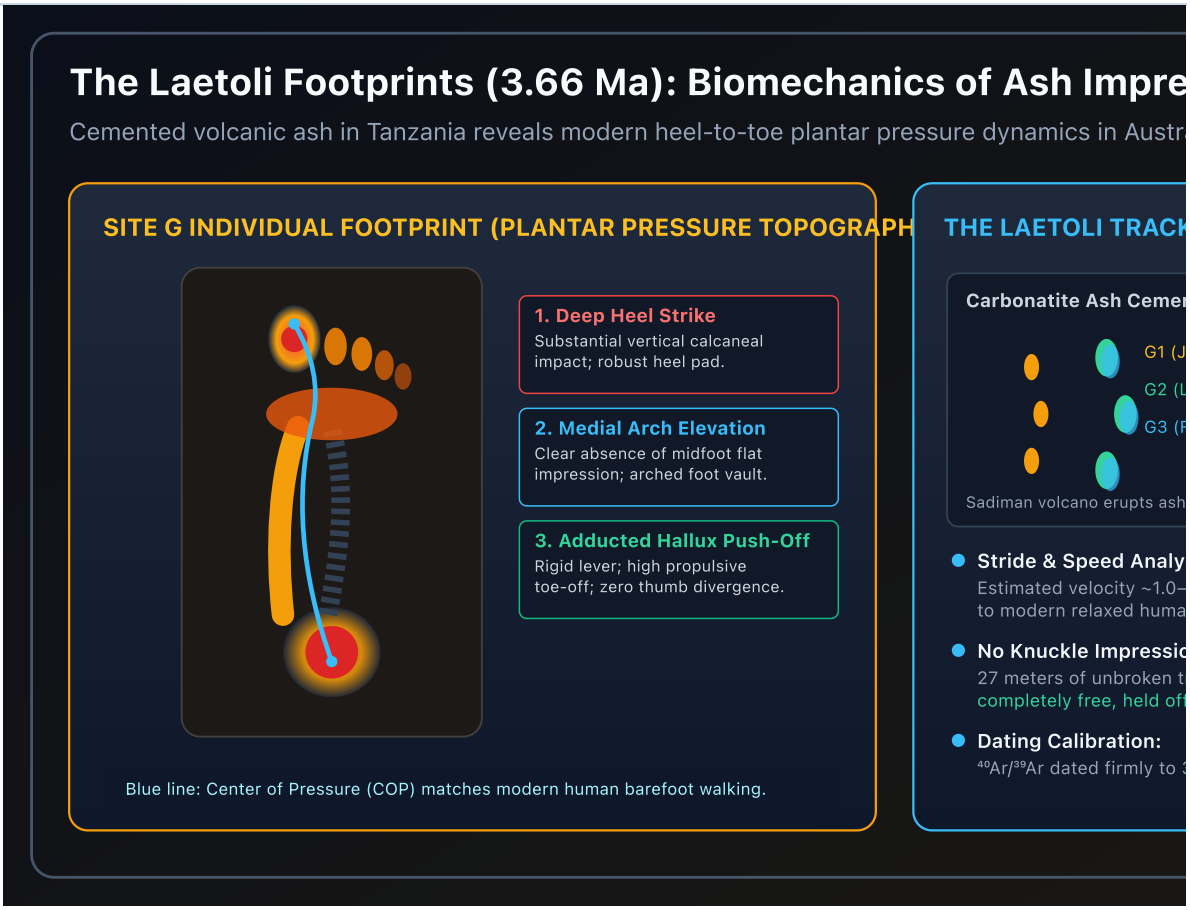
দ্বিপদ হাঁটার ক্ষমতা থাকলেও লুসির শরীরে গাছে চড়ার বেশ কিছু স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল: তার হাত ও পায়ের আঙুলের হাড়গুলো ছিল স্পষ্টতই ধনুকের মতো বাঁকানো, উরুর সাপেক্ষে হাতের বাহু ছিল কিছুটা দীর্ঘ এবং কাঁধের জয়েন্ট বা গ্লেনয়েড ক্যাভিটি ওপরের দিকে মুখ করা ছিল।

নৃবিজ্ঞানীরা একে বলেন **ডুয়াল-নিশ অ্যাডাপটেশন**: দিনের বেলা লুসি ও তার দল মাটিতে দুই পায়ে হেঁটে সাভানার প্রান্তরে ফলমূল ও কন্দ সংগ্রহ করত; কিন্তু রাতের অন্ধকারে তৎকালীন আফ্রিকান সাভানার রক্তপিপাসু শিকারী প্রাণী—যেমন স্যাবার-টুথ বিড়াল (*Homotherium*) ও দানবীয় হায়েনার হাত থেকে বাঁচতে তারা গাছে চড়ে শাখা-প্রশাখার ওপর নিরাপদ ডালপালার বাসা বানিয়ে ঘুমাত, ঠিক যেমনটি বর্তমান বুনো শিম্পাঞ্জিরা করে।

২. লেটোলির পদচিহ্ন: আগ্নেয়গিরির ছাইয়ে হাঁটার অমর দলিল

জীবাশ্ম হাড় থেকে পেশীর টান বা চলনের গতি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু পায়ের আসল ছাপ কখনো মিথ্যা বলে না। ১৯৭৮ সালে উত্তর তানজানিয়ার লেটোলিতে মেরি লিকির নেতৃত্বাধীন প্রত্নতাত্ত্বিক দল আবিষ্কার করেন মানব ইতিহাসের অন্যতম রোমাঞ্চকর নিদর্শন: **লেটোলি পদচিহ্ন (Site G)**।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৭.২: লেটোলির পদচিহ্ন (৩৬.৬ লাখ বছর)। বামে: একটি পায়ের ছাপের নিখুঁত ৩ডি স্ক্যান—যাতে গভীর গোড়ালির চাপ, উত্থিত মধ্য আর্চ এবং সোজাসুজি বুড়ো আঙুল থেকে চূড়ান্ত ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোনোর প্রমাণ স্পষ্ট। ডানে: ২৭ মিটার দীর্ঘ পদচিহ্ন রেখা, যেখানে তিনটি হোমিনিন (G1, G2 এবং G2-এর পায়ের ছাপে পা ফেলে চলা G3) সাদিমান আগ্নেয়গিরির ভেজা কার্বোনাটাইট ছাইয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

আগ্নেয়গিরির ছাইয়ে বাঁধানো ক্ষণ

প্রায় **৩৬ লাখ ৬০ হাজার বছর পূর্বে** নিকটবর্তী সাদিমান আগ্নেয়গিরি থেকে হালকা ক্ষারীয় ছাইয়ের বৃষ্টিপাত হয়। এর ঠিক পরপরই মৃদু বৃষ্টি এসে সেই ছাইকে নরম ভেজা সিমেন্টের মতো লেইয়ে পরিণত করে। সেই নরম স্তরের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় তিনটি আদিম হোমিনিন—যাদের প্রত্নতাত্ত্বিকরা নাম দিয়েছেন G1 (আকারে ছোট নারী বা কিশোর), G2 (বড় আকারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ) এবং G3 (তৃতীয় এক হোমিনিন, যে পা ফেলেছিল ঠিক G2-এর পায়ের চিহ্নের ভেতর দিয়ে)। ২৭ মিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পর পরবর্তী অগ্ন্যুৎপাতের ছাই সেই পদচিহ্নগুলোকে অক্ষতভাবে সিলগালা করে দেয়।

পায়ের তলার বায়োমেকানিক্স

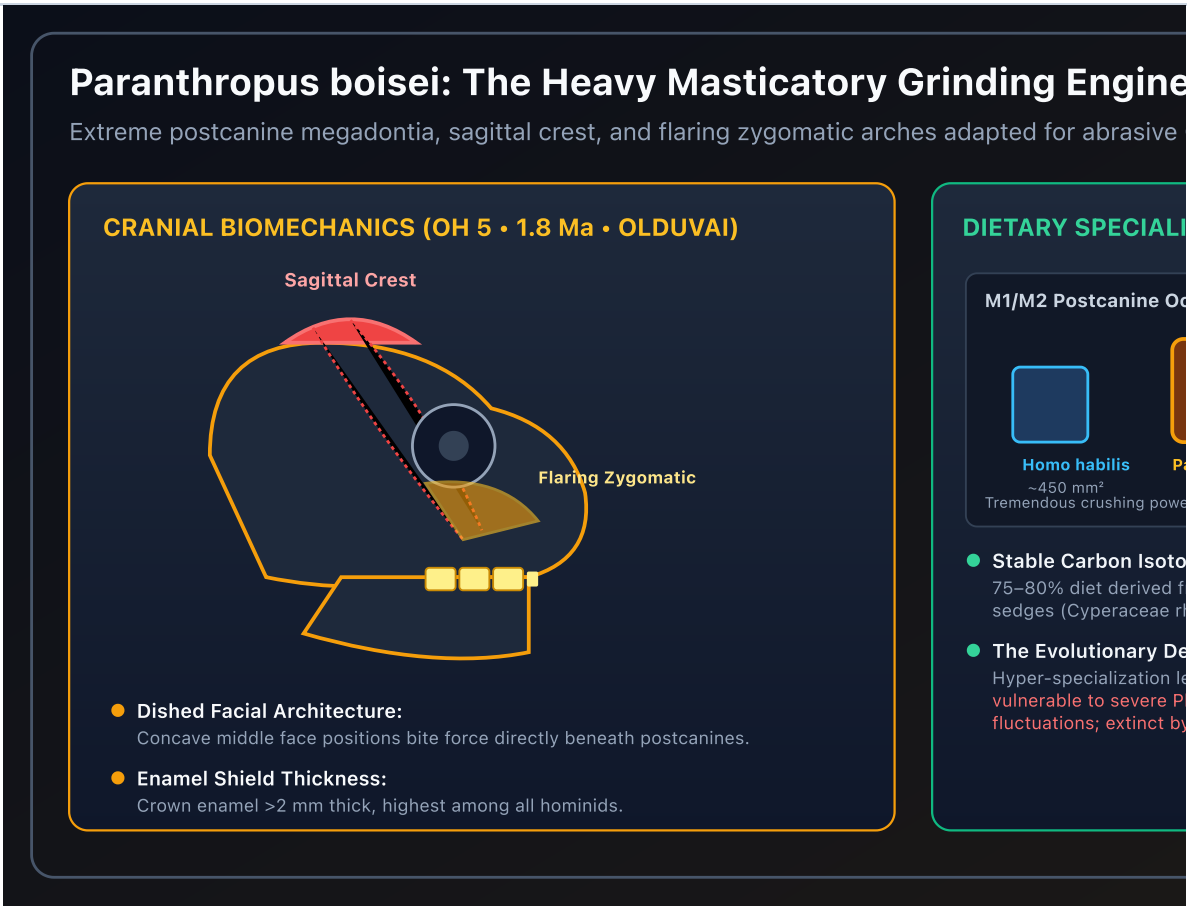
আধুনিক লেজার স্ক্যানিং ও বায়োমেকানিক্যাল পরীক্ষায় লেটোলির পায়ের ছাপ থেকে যে তথ্য মিলেছে তা বিস্ময়কর:

1. **সুস্পষ্ট গোড়ালির চাপ (Heel Strike):** পায়ের ছাপের পেছনের অংশটি অত্যন্ত গভীর ও গোলাকার, যা প্রমাণ করে পদক্ষেপের শুরুতে সম্পূর্ণ শারীরিক ভার গোড়ালির নরম প্যাডের ওপর পড়েছিল।
2. **উচ্চ অনুদৈর্ঘ্য খিলান (Medial Longitudinal Arch):** বনমানুষদের পায়ের ছাপের মতো এটি সমতল ছিল না। পায়ের ভেতরের মধ্যভাগে মাটির স্পর্শহীনতা প্রমাণ করে তাদের পায়ে মানুষের মতো চমৎকার খিলান বা আর্চ ছিল, যা হাঁটার শক-অ্যাবজরবার হিসেবে কাজ করত।
3. **সোজা বুড়ো আঙুল (In-line Hallux):** আর্ভিপিতেকাসের মতো বুড়ো আঙুল পাশে ছড়িয়ে ছিল না; বরং মানুষের মতোই অন্য চার আঙুলের সমান্তরালে সোজাসুজি বিন্যস্ত ছিল।
4. **আঙুলের অগ্রভাগের ধাক্কা (Toe Push-Off):** সবচেয়ে গভীর ছাপটি রয়েছে বুড়ো আঙুলের গোড়ার অংশে, যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে তারা প্রতিটি পদক্ষেপের শেষে আধুনিক মানুষের মতোই বুড়ো আঙুলে চাপ দিয়ে শরীরকে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

৩. দানবীয় চর্বণযন্ত্র: প্যারানথ্রোপাস ও মেগাডনশিয়া

২৬ লাখ বছর পূর্বে প্লিও-প্লিস্টোসিন যুগসন্ধিতে পৃথিবীর অক্ষীয় ঘূর্ণনের পরিবর্তনের ফলে আফ্রিকার জলবায়ু চরম শুষ্ক ও পরিবর্তনশীল হয়ে ওঠে। আর্দ্র বনভূমি ধ্বংস হয়ে সাভানার প্রান্তরে আধিপত্য বিস্তার করে কর্কশ C_4 প্রজাতির ঘাস, কন্দ ও শক্ত বীজ।

এই খাদ্য সংকটে অস্ট্রালোপিতেকাসের একটি শাখা এমন এক চরম অভিযোজনের পথ বেছে নেয় যা প্রাণিজগতে বিরল: **রোবাস্ট অস্ট্রালোপিতেকাস বা প্যারানথ্রোপাস (গণ *Paranthropus*)**। ১৯৫৯ সালে ওল্ডুভাই গর্জে মেরি লিকি আবিষ্কার করেন *প্যারানথ্রোপাস বইজির* জীবাশ্ম করোটি **OH 5 (“নাটক্র্যাকার ম্যান” বা বাদামভাঙ্গা মানব)**, যা জীবজগতের এক অবিশ্বাস্য চর্বণযন্ত্রের রূপ তুলে ধরে:



চিত্র ১৭.৩: প্যারানথ্রোপাস বইজির (OH 5) বিশালাকার চর্বণ কাঠামো। বামে: খুলির শীর্ষদেশে টেম্পোরালিস পেশী ধরে রাখার জন্য হাড়ের ব্লেড-সদৃশ স্যাজিটাল ক্রেস্ট, পেশী প্রবেশের জন্য চওড়া জাইগোম্যাটিক আর্চ এবং খাড়া চোয়াল। ডানে: মানুষের চেয়ে চার গুণ বড় মাড়ির দাঁত (মেগাডনশিয়া) এবং ২ মিলিমিটারের চেয়ে পুরু এনামেলের স্তর, যা পাথুরে শক্ত শিকড় ও কর্কশ ঘাস চিবানোর জন্য উপযুক্ত ছিল।

পেষণযন্ত্রের বায়োমেকানিক্স

প্যারানথ্রোপাস বইজির করোটি ছিল মাংসপেশীর সর্বোচ্চ পেষণ বল প্রয়োগের এক জীবন্ত কারখানা:

- **স্যাজিটাল ক্রেস্ট (Sagittal Crest):** দানবীয় চর্বণ পেশী *টেম্পোরালিস*-কে শক্তভাবে ধরে রাখার জন্য তাদের মাথার খুলির ঠিক মাঝখান দিয়ে একটি খাড়া হাড়ের শৈলশিরা বা ক্রেস্ট তৈরি হয়েছিল—যেমনটি দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গরিলার মাথায়।
- **প্রসারিত গালের হাড় (Flaring Zygomatic Arches):** তাদের গালের হাড় এত বেশি বাইরের দিকে প্রসারিত ছিল যে তার নিচ দিয়ে অনায়াসে দুই মুঠো পেশীর তন্তু নিচের চোয়ালে নেমে আসতে পারত।
- **থালা-সদৃশ মুখমণ্ডল:** তাদের মুখমণ্ডল সামনের দিকে বাড়ানো ছিল না; বরং ভেতরে দাবানো ছিল, যা মাড়ির দাঁতের ওপর সরাসরি উল্লম্ব চাপ প্রয়োগে সর্বোচ্চ শক্তি দিত।
- **পোস্ট-ক্যানাইন মেগাডনশিয়া:** সামনের ছেদন দাঁতগুলো ছোট হলেও তাদের পেছনের প্রিমোলার ও মোলার মাড়ির দাঁতগুলো ছিল **আধুনিক মানুষের দাঁতের চার গুণ বড়**! এই দাঁতগুলোর ওপর ছিল **২ মিলিমিটারেরও বেশি পুরু এনামেলের বর্ম**, যা প্রাইমেটদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আইসোটোপের চমক: তারা আসলে কী খেত?

বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা তাদের "নাটক্র্যাকার মানব" ডাকতেন এই বিশ্বাসে যে তারা শক্ত বাদাম ও ফলের খোলস ভাঙত। কিন্তু ২০১১ সালে জিবায়োকেমিস্ট থুর সেলিং দাঁতের এনামেলের কার্বন আইসোটোপ ($\delta^{13}C$) বিশ্লেষণ করে বিশ্বকে চমকে দেন:

প্যারানথ্রোপাসের খাদ্যের **৭৫% থেকে ৮০% ছিল** C_4 **উদ্ভিদের অংশ**—অর্থাৎ গাছের বাদাম নয়, বরং জলাভূমির শক্ত সাইপেরাস ঘাসের কন্দ, মাটির নিচের বালুকাময় শিকড় ও জলজ উদ্ভিদের রাইজোম! তারা বাদাম ভাঙার জন্য নয়, বরং মাটিমাখা কর্কশ ও তন্তুময় ঘাসের শিকড় হাজার বার পেষণ করার জন্যই এই দানবীয় জৈবিক জাঁতাকল বিবর্তিত করেছিল।

৪. বিবর্তনের ত্রিমুখী মোড় ও বিলুপ্তি

বিশ লাখ বছর পূর্বে পূর্ব আফ্রিকার ওল্ডুভাই ও তুর্কানা অববাহিকায় একই সাথে বসবাস করত মানব পরিবারের দুই বিপরীতধর্মী কাজিন:

1. **বিশেষজ্ঞ কৌশল (প্যারানথ্রোপাস):** নিম্নমানের শক্ত ঘাস ও শিকড় চিবিয়ে বেঁচে থাকার কৌশল গ্রহণ করেছিল এবং নিজের শরীরকেই জাঁতাকলে পরিণত করেছিল।
2. **সাধারণ কৌশল (আদি হোমো):** দাঁত ও চোয়ালের আকার ছোট রেখেছিল, শরীরের পরিপাকতন্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করেছিল এবং মস্তিষ্কের আকার বাড়িয়ে খাবারের প্রক্রিয়াকরণকে দেহের বাইরে পাথরের ধারালো হাতিয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিল।

১২ লাখ বছর পূর্বে চরম শুষ্কতার যুগে জলাভূমি শুকিয়ে গেলে প্যারানথ্রোপাস তার বিশেষজ্ঞ খাদ্য হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে এবং চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করা আমাদের বংশধারা এগিয়ে যায় ইতিহাসের পরবর্তী ধাপে: সূচনা ঘটে মানব প্রজাতির আসল পতাকাধারী গণ **হোমো (Homo)**-র।

Shakil Mahmud • Research Monograph

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "অস্ট্রালোপিথেকাস, লেটোলির পদচিহ্ন এবং রোবাস্ট প্যারানথ্রোপাস"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১৭। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-17-australopithecus-and-paranthropus-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টাদশ খণ্ড

হোমো গণের আবির্ভাব এবং ওল্ডোয়ান পাথুরে প্রযুক্তি

হোমো গণের আবির্ভাব এবং ওল্ডোয়ান পাথুরে প্রযুক্তি

1,366 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৮: *চিত্র: হোমো হ্যাবিলিস ('হ্যান্ডিম্যান', ~১.৯ মিলিয়ন বছর আগে)—পাথরের হাতিয়ার তৈরি করা প্রথম মানব প্রজাতি; প্রসারিত মস্তিষ্ক এবং ওল্ডোওয়ান ধারালো পাথরের অস্ত্র তৈরির দক্ষতা।*

আটাশ লাখ বছর পূর্বে বৈশ্বিক শীতলীকরণ ও আফ্রিকার তীব্র শুষ্কতার পটভূমিতে আমাদের বিবর্তনীয় যাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করে: আত্মপ্রকাশ ঘটে আমাদের নিজেদের ট্যাক্সন—গণ **হোমো (Homo)**-র। রেইনফরেস্ট ধ্বংসের চরম খাদ্য সংকটে আমাদের পূর্বপুরুষরা কাজিন *প্যারানথ্রোপাস*-এর মতো দানবীয় চর্বণ দাঁত বিবর্তিত করেনি। তার পরিবর্তে তারা আবিষ্কার করেছিল এক যুগান্তকারী কৌশল: **প্রস্তর প্রযুক্তি (Lithic Technology)**। পাথরের ফাটল ধরার পদার্থবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা পরিপাকের প্রাথমিক কাজটিকে শরীরের বাইরে স্থানান্তরিত করে। ধারালো পাথুরে হাতিয়ারের সাহায্যে তারা ভেঙে ফেলে ম্যামথ ও অ্যান্টিলোপের দীর্ঘ হাড়ের শক্ত বর্ম এবং মুক্ত করে পুষ্টি ও চর্বিতে ভরপুর অস্থিমজ্জা (Bone Marrow)। এই চরম পুষ্টিই মানব মস্তিষ্কের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের প্রধান জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছিল।

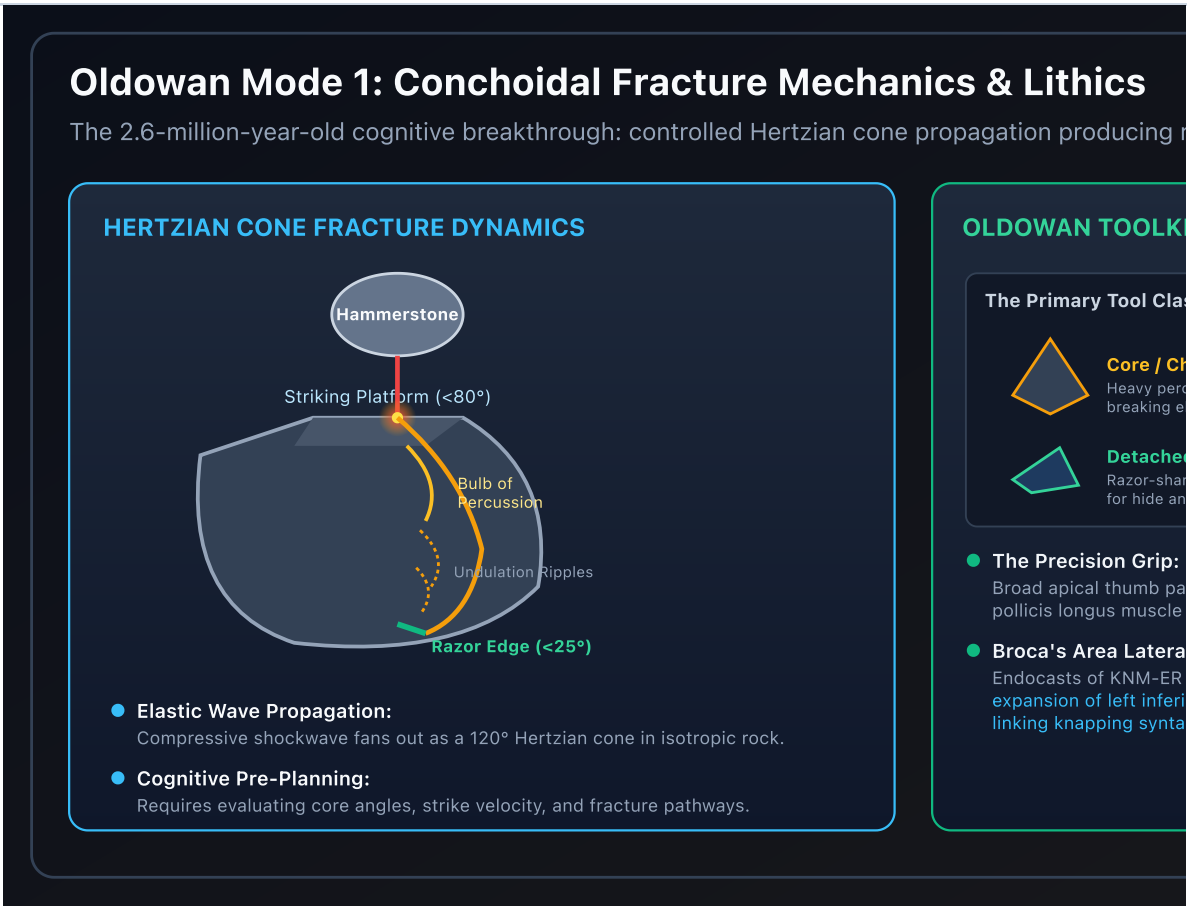
১. প্রাচীনতম হোমো এবং করোটি ও দাঁতের রূপান্তর

২০১৩ সালে ইথিওপিয়ান গবেষক চালাচেউ সিউম ইথিওপিয়ার লেডি-গেরারু অঞ্চলে একটি নিচের চোয়ালের বাম পাশের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। **LD 350-1** নামে ক্যাটালগকৃত এই জীবাশ্মটি নিখুঁতভাবে **২৮ লাখ থেকে ২৭.৫ লাখ বছর পূর্বের (২.৮\text{–}২.৭৫\text{ Ma})** বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা আমাদের গণ *হোমো*র উৎপত্তির ইতিহাসকে প্রায় পাঁচ লাখ বছর পিছিয়ে দেয়। এতে রয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাসের মতো চিবুকের আদিম গঠন এবং আধুনিক হোমোর মতো সরু মাড়ির দাঁতের এক অনন্য মেলবন্ধন।

১৮ থেকে ২০ লাখ বছর পূর্বে তানজানিয়ার ওল্ডুভাই গর্জে এবং কেনিয়ার তুর্কানা হ্রদের তীরে প্রাচীন হোমো দুটি প্রধান ধারায় বিকশিত হয়:

- **হোমো হ্যাবিলিস (Homo habilis বা "দক্ষ মানব"):** ১৯৬৪ সালে লুইস লিকি ও তার দল হলটাইপ **OH 7** এবং পরবর্তীতে অক্ষত করোটি **KNM-ER 1813** থেকে এই প্রজাতি শনাক্ত করেন। তাদের মস্তিষ্কের আয়তন অস্ট্রালোপিথেকাসের ৪৩০ সিসি থেকে লাফিয়ে **৫১০–৬৫০ সিসি**-তে পৌঁছায়। মাড়ির দাঁতের আকার নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায় এবং চোয়ালের আকৃতি ইংরেজি 'ইউ' থেকে ডিম্বাকৃতি বা প্যারাবোলিক রূপ ধারণ করে।
- **হোমো রুডলফেনসিস (Homo rudolfensis):** কেনিয়ার **KNM-ER 1470** করোটি (১৯ লাখ বছর) যার উজ্জ্বল প্রমাণ, যার মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ছিল বিস্ময়কর **৭৫০–৭৭৫ সিসি**।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৮.১: ওল্ডোয়ান মোড ১ কনকয়ডাল ফ্র্যাকচারের পদার্থবিজ্ঞান। বামে: হাতুড়ি-পাথর দিয়ে ৮০ ডিগ্রির কম সূক্ষ্ম কোণে পাথুরে কোরে আঘাত করার মাধ্যমে হার্টজিয়ান শকওয়েভ বা তরঙ্গের বিস্তার, যা বাল্ব অব পারকাশন ও ক্ষুরধার ব্লেড তৈরি করে। ডানে: ওল্ডোয়ান হাতিয়ারের শ্রেণিবিভাগ (চপার বনাম ফ্লেক) এবং হোমো হ্যাবিলিসের মস্তিষ্কে ব্রোকার অঞ্চলের স্নায়বিক বিকাশ।

স্নায়বিক বিকাশ: ব্রোকার অঞ্চল ও প্রিসিশন গ্রিপ

হোমো হ্যাবিলিসের করোটির ভেতরের ছাঁচে (Endocast) এক যুগান্তকারী স্নায়বিক রূপান্তর দেখা যায়: তাদের মস্তিষ্কের বাম পাশের ফ্রন্টাল লোবের নিচে **ব্রোকার অঞ্চল (Broca's Cap, BA 44/45)** স্পষ্টভাবে ফুলে উঠেছিল। আধুনিক ভাষা বিবর্তিত হতে আরও সময় লাগলেও, মস্তিষ্কের এই অংশটি মূলত **ধারাবাহিক মোটর পরিকল্পনা (Hierarchical Motor Syntax)** নিয়ন্ত্রণ করে—অর্থাৎ একটি পাথরকে নির্দিষ্ট কোণে ও নির্দিষ্ট গতিতে আঘাত করে কাঙ্ক্ষিত ব্লেড তৈরি করার মানসিক হিসাব-নিকাশ এখান থেকেই পরিচালিত হতো।

এর সাথে যুক্ত হয়েছিল হাতের **প্রিসিশন গ্রিপ (Precision Grip)**: মানুষের বুড়ো আঙুলের ডগা চওড়া হয়ে ওঠে এবং আঙুলের মাংসপেশী (*Flexor pollicis longus*) শক্তিশালী হয়, যা পাথরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আঘাতের প্রচণ্ড অভিঘাত সহ্য করার ক্ষমতা দেয়।

২. ওল্ডোয়ান মোড ১: কনকয়ডাল ফ্র্যাকচারের পদার্থবিজ্ঞান

ইথিওপিয়ার গোনা (২৬ লাখ বছর) এবং ওল্ডুভাই গর্জে আবিষ্কৃত **ওল্ডোয়ান শিল্প (Oldowan Mode 1)** মানব প্রযুক্তির প্রথম ঐতিহাসিক অধ্যায়। অতীতে একে সাধারণ ভাঙা পাথর মনে করা হলেও আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে ওল্ডোয়ান ব্লেড তৈরি করা গভীর পদার্থবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফসল:

হার্টজিয়ান কোণ ও তরঙ্গের মেকানিক্স

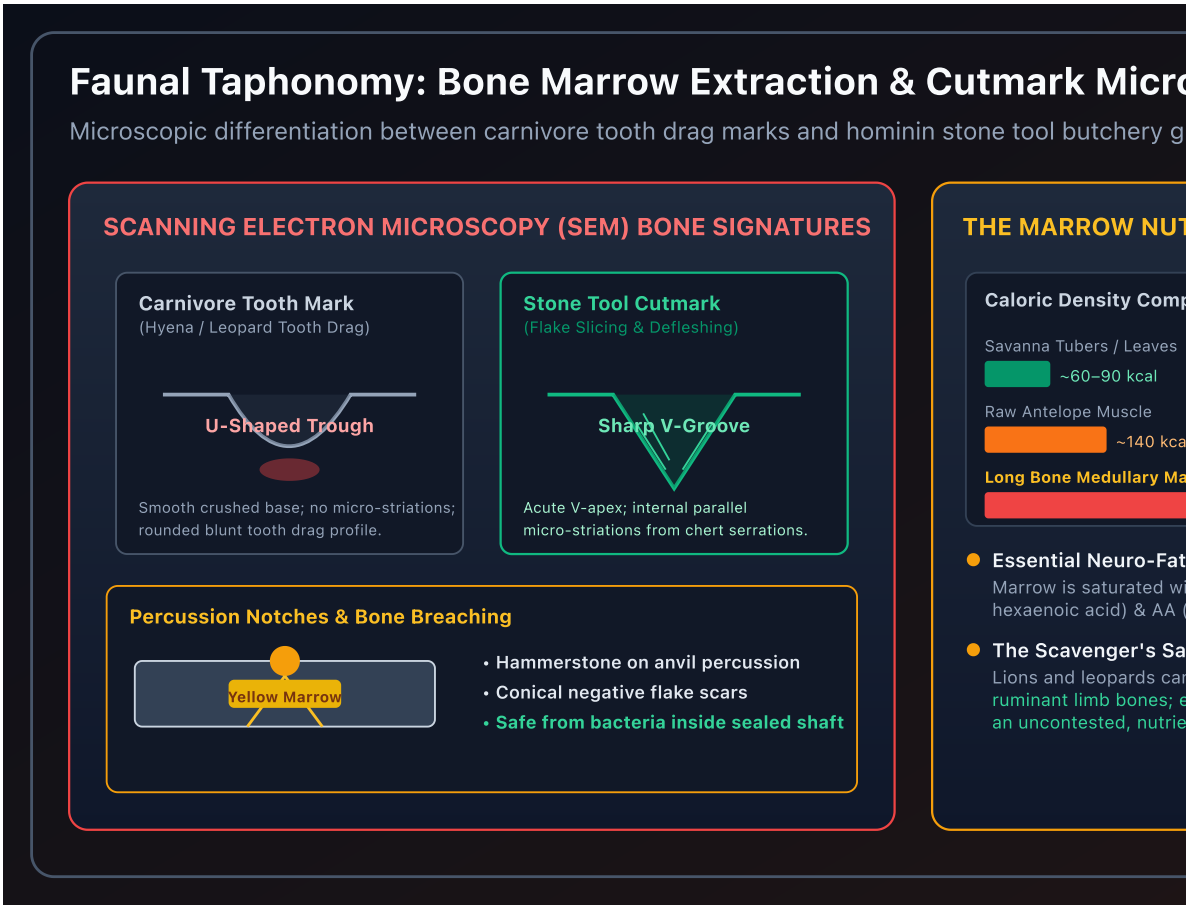
হোমো এলোমেলোভাবে যেকোনো পাথরে আঘাত করত না। তারা বেছে নিত ব্যাসাল্ট, চ্যার্ট বা কোয়ার্টজাইটের মতো আইসোট্রপিক পাথর, যার ভেতরে কোনো প্রাকৃতিক দুর্বল ফাটল থাকে না:

1. **স্ট্রাইকিং প্ল্যাটফর্ম জ্যামিতি:** প্রাচীন কারিগররা এমন একটি কোর পাথর বেছে নিত যার স্ট্রাইকিং প্ল্যাটফর্মের কোণ ছিল **৮০ ডিগ্রির কম**। ৯০ ডিগ্রির বেশি কোণে আঘাত করলে পাথর কেবল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত, কোনো ধারালো ব্লেড বের হতো না।
2. **হার্টজিয়ান তরঙ্গের বিস্তার:** হাতুড়ি-পাথরের তীব্র আঘাতে পাথরের ভেতরে প্রায় ১২০ ডিগ্রি কোণে একটি স্থিতিস্থাপক সংকুচিত শকওয়েভ (Hertzian Cone) ছড়িয়ে পড়ত।
3. **ফ্লেকের অঙ্গসংস্থান:** পাথর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ধারালো ফ্লেকে স্পষ্ট কিছু চিহ্ন থাকে:
    - **ইমপ্যাক্ট পয়েন্ট:** যেখানে হাতুড়ি সরাসরি স্পর্শ করেছিল।
    - **বাল্ব অব পারকাশন (Bulb of Percussion):** আঘাতের তরঙ্গে সৃষ্ট মসৃণ উত্তল স্ফীতি।
    - **রিপল বা ঢেউয়ের খাঁজ:** পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ঢেউ খেলে, পাথরেও চাপের তরঙ্গের তেমনি সূক্ষ্ম অর্ধবৃত্তাকার খাঁজ পড়ে।
    - **ক্ষুরধার প্রান্ত:** ফ্লেকের ধারালো প্রান্তের কোণ ছিল **১৫ থেকে ২৫ ডিগ্রি**—যা আজকের আধুনিক সার্জিক্যাল স্টিলের স্ক্যালপেলের চেয়েও ধারালো!

জাদুঘরে এতদিন যেসব ভারী গোল পাথর (চপার) সাজিয়ে রাখা হতো, গবেষণায় দেখা গেছে সেগুলো ছিল কেবল মূল কোর; হোমোদের আসল লক্ষ্য ছিল ছিটকে আসা পাতলা, ক্ষুরধার **মাইক্রো-ফ্লেক ব্লেডগুলো**, যা তাদের ধারালো কৃত্রিম নখ ও দাঁত হিসেবে কাজ করেছিল!

৩. হাড়ের জীবাশ্মতত্ত্ব: স্ক্যাভেঞ্জিং ও অস্থিমজ্জার ভাণ্ডার

কেন পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে হলো? আফ্রিকান নদী অববাহিকায় সংরক্ষিত পশুদের হাড়ের **ট্যাফোনমি (Taphonomy বা জীবাশ্ম ক্ষয় ও রূপান্তরের বিজ্ঞান)** সেই গোপন রহস্য উন্মোচন করেছে:



চিত্র ১৮.২: হাড়ের ফ্যাটি অস্থিমজ্জা ও স্ক্যাভেঞ্জিংয়ের প্রমাণ। বামে: ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে শিকারী পশুর গোলাকার ‘U’ আকৃতির দাঁতের দাগ বনাম হোমোদের পাথুরে হাতিয়ারের তীক্ষ্ণ ‘V’ আকৃতির কাটমার্কের সূক্ষ্ম রেখা। মাঝে: অ্যানভিলের ওপর হাতুড়ি-পাথরের আঘাতে হাড় ভেঙে ভেতরের ফ্যাটি হলুদ মজ্জা উন্মোচন। ডানে: পুষ্টির তুলনা—ঘাস ও কন্দের তুলনায় হাড়ের মজ্জা প্রতি ১০০ গ্রামে ৭৫০ কিলোক্যালরির বেশি শক্তি এবং মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড (DHA/AA) সরবরাহ করেছিল।

স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রমাণ

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে হাড়ের দাগ বিশ্লেষণ করে নৃবিজ্ঞানীরা শিকারী পশুর কামড় এবং মানুষের হাতিয়ারের দাগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন:

- **শিকারী প্রাণীর দাঁতের দাগ:** হায়েনা বা চিতা যখন হাড়ে কামড় দেয়, তখন হাড়ের কোষগুলো চ্যাপ্টা হয়ে তৈরি করে একটি অগভীর, মসৃণ **‘U’ আকৃতির গর্ত**।
- **পাথুরে হাতিয়ারের কাটমার্ক:** হোমো যখন চ্যার্ট পাথরের ফ্লেক দিয়ে মাংস বা টেন্ডন কাটত, তখন পাথরের সূক্ষ্ম খাঁজগুলো হাড়ে তৈরি করত খাড়া ও তীক্ষ্ণ **‘V’ আকৃতির খাঁজ**, যার ভেতরে সমান্তরাল সূক্ষ্ম স্ক্র্যাচ দাগ থাকে।
- **পারকাশন নচ বা হাড় ভাঙার দাগ:** পাথরের নেহাইয়ের ওপর হাড় রেখে ওপর থেকে হাতুড়ি মারলে হাড়ের গায়ে খাঁজকাটা বৃত্তাকার ইমপ্যাক্ট স্কার এবং প্রজাপতি-সদৃশ ফ্র্যাকচার তৈরি হয়—যা স্পষ্ট প্রমাণ করে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হাড় চূর্ণ করেছিল।

হলুদ অস্থিমজ্জা: জীবাণুমুক্ত ক্যালোরির স্বর্ণখনি

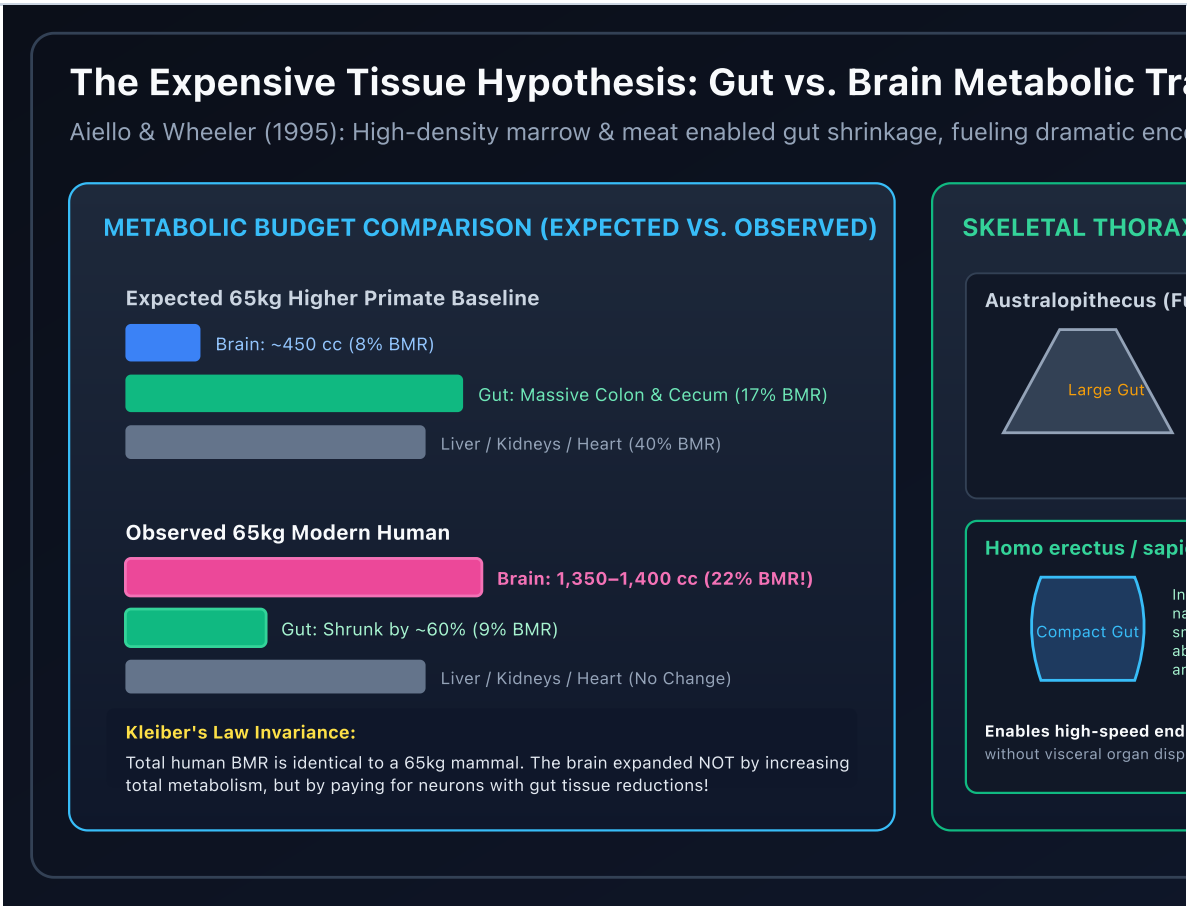
তৎকালীন আফ্রিকার হিংস্র সাভানায় হোমোদের হাতি বা গণ্ডার শিকার করার প্রয়োজন ছিল না। স্যাবার-টুথ বিড়ালরা শিকারের নরম মাংস খেয়ে কঙ্কাল ফেলে চলে যেত। হায়েনারাও পূর্ণবয়স্ক হাতি বা গণ্ডারের পায়ের নিরেট কর্টিক্যাল হাড় ভাঙতে পারত না।

সেই নিরেট হাড়ের নল ছিল বাইরের ব্যাকটেরিয়া ও শিকারীদের হাত থেকে সম্পূর্ণ সিলগালা এক খাদ্যভাণ্ডার। হাতুড়ি-পাথর দিয়ে সেই শক্ত নলাকার হাড় ভেঙে হোমো বের করে আনত ক্যালোরিতে ভরপুর **হলুদ অস্থিমজ্জা (Yellow Marrow)**। প্রতি ১০০ গ্রাম অস্থিমজ্জা থেকে মিলত **৭৫০ কিলোক্যালরিরও বেশি শক্তি**, যা প্রায় শতভাগ উচ্চমানের লিপিড এবং মস্তিষ্কের সেল মেমব্রেন ও সিন্যাপ্স গঠনের অপরিহার্য উপাদান: **ডিএইচএ (DHA)** এবং **অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড (AA)**।

৪. এক্সপেনসিভ টিস্যু হাইপোথিসিস: মস্তিষ্ক বনাম পরিপাকতন্ত্র

ছোট শরীরের আদি মানব কীভাবে বিশাল মস্তিষ্কের শক্তির জোগান দিয়েছিল? ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞানী লেসলি আইয়েলো ও পিটার হুইলার মানব বিবর্তনের অন্যতম সেরা তত্ত্ব উপস্থাপন করেন: **এক্সপেনসিভ টিস্যু হাইপোথিসিস (The Expensive Tissue Hypothesis)**।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৮.৩: এক্সপেনসিভ টিস্যু হাইপোথিসিস (Aiello & Wheeler, 1995)। বামে: মেটাবলিক বাজেটের তুলনা—মানুষের মস্তিষ্ক যেখানে শরীরের মোট বেসাল মেটাবলিক হারের (BMR) ২২% শক্তি খরচ করে, সেখানে মানবদেহের মোট মেটাবলিজম ক্লাইবারের সূত্র অনুযায়ী সাধারণ স্তন্যপায়ীর সমানই রয়ে গেছে; এই শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল পরিপাকতন্ত্রকে প্রায় ৬০% সংকুচিত করে। ডানে: পাঁজর ও পেটের রূপান্তর—অস্ট্রালোপিথেকাসের বিশালাকার চোঙা-সদৃশ পাঁজর বনাম হোমোর সরু কোমর ও ব্যারেল-আকৃতির পাঁজর।

বিপাকীয় ধাঁধা ও ক্লাইবারের সূত্র

মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত ব্যয়বহুল এক অঙ্গ। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন দেহের মোট ওজনের মাত্র **২%**, অথচ এটি আমাদের বিশ্রামের মোট শক্তির **২০% থেকে ২৫% একাই গ্রাস করে**! প্রতি গ্রামে মস্তিষ্ক কঙ্কালের পেশীর তুলনায় বিশ গুণ বেশি শক্তি পোড়ায়।

অথচ পদার্থবিজ্ঞানের **ক্লাইবারের সূত্র** ($BMR \propto M^{0.75}$) অনুযায়ী, মানুষের দেহের মোট শক্তি ক্ষয়ের হার একটি ৬৫ কেজি ওজনের সাধারণ স্তন্যপায়ীর সমান। আমাদের দেহে কোনো অলৌকিক শক্তি উৎপাদনকারী চুল্লি নেই। তবে মস্তিষ্ক এই বিপুল শক্তি পেল কোথা থেকে?

অন্ত্রের সংকোচন ও মস্তিষ্কের উল্লম্ফন

আইয়েলো ও হুইলার লক্ষ্য করেন যে স্তন্যপায়ী দেহে পাঁচটি প্রধান ব্যয়বহুল অঙ্গ রয়েছে: হৃদপিণ্ড, বৃক্ক, যকৃত, মস্তিষ্ক এবং পরিপাকতন্ত্র (GI Tract)। রক্ত সঞ্চালনের জন্য হৃদপিণ্ড বা রক্ত পরিশোধনের জন্য কিডনির আকার কমানো অসম্ভব। একমাত্র অঙ্গ যা খাদ্যের মানের ওপর নির্ভর করে ছোট করা সম্ভব, তা হলো **পরিপাকতন্ত্র**:

- **বনমানুষের বিশাল অন্ত্র:** নিম্নমানের আঁশযুক্ত পাতা ও ঘাস পরিপাক করতে গরিলার মতো প্রাণীদের বিশাল গাঁজন প্রকোষ্ঠ (Caecum) এবং দীর্ঘ কোলন প্রয়োজন। এই বিশাল ভুঁড়ির জন্য তাদের পাঁজরের নিচের অংশ ছিল চওড়া ও চোঙা-সদৃশ (Funnel-shaped)।
- **হোমো গণের পরিপাক বিপ্লব:** ওল্ডোয়ান ব্লেড দিয়ে চর্বি, নরম মাংস ও মজ্জা খাওয়ার কারণে হোমো অত্যন্ত সহজে হজমযোগ্য পুষ্টি গ্রহণ করতে শুরু করে। এর ফলে অন্ত্রের বিশাল কোলন ও গাঁজন অংশের আর প্রয়োজন থাকেনি; পরিপাকতন্ত্রের আকার **প্রায় ৬০% সংকুচিত হয়ে যায়**!

পরিপাকতন্ত্র ছোট করার ফলে যে বিপুল মেটাবলিক শক্তি সাশ্রয় হলো, বিবর্তন সেই উদ্বৃত্ত শক্তি সরাসরি বিনিয়োগ করল নিউরনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে। কঙ্কালের মধ্যেও এর স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়: অস্ট্রালোপিথেকাসের ভারী তলপেট ও চোঙা পাঁজর রূপান্তরিত হলো হোমোর **সরু কোমর ও নলাকার ব্যারেল পাঁজরে**। খাদ্যকে দেহের বাইরে পাথরের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষ জিতে নিল তার মস্তিষ্কের স্বাধীনতা, যা পরবর্তী ধাপে জন্ম দেবে আগুন নিয়ন্ত্রক ও বিশ্বজয়ী **হোমো ইরেক্টাস**-এর।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "হোমো গণের আবির্ভাব এবং ওল্ডোয়ান পাথুরে প্রযুক্তি"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১৮। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-18-the-dawn-of-genus-homo-and-lithic-technology-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ঊনবিংশ খণ্ড

হোমো ইরেক্টাস, আগুনের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশ্বিক অভিযাত্রা

হোমো ইরেক্টাস, আগুনের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশ্বিক অভিযাত্রা

1,693 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



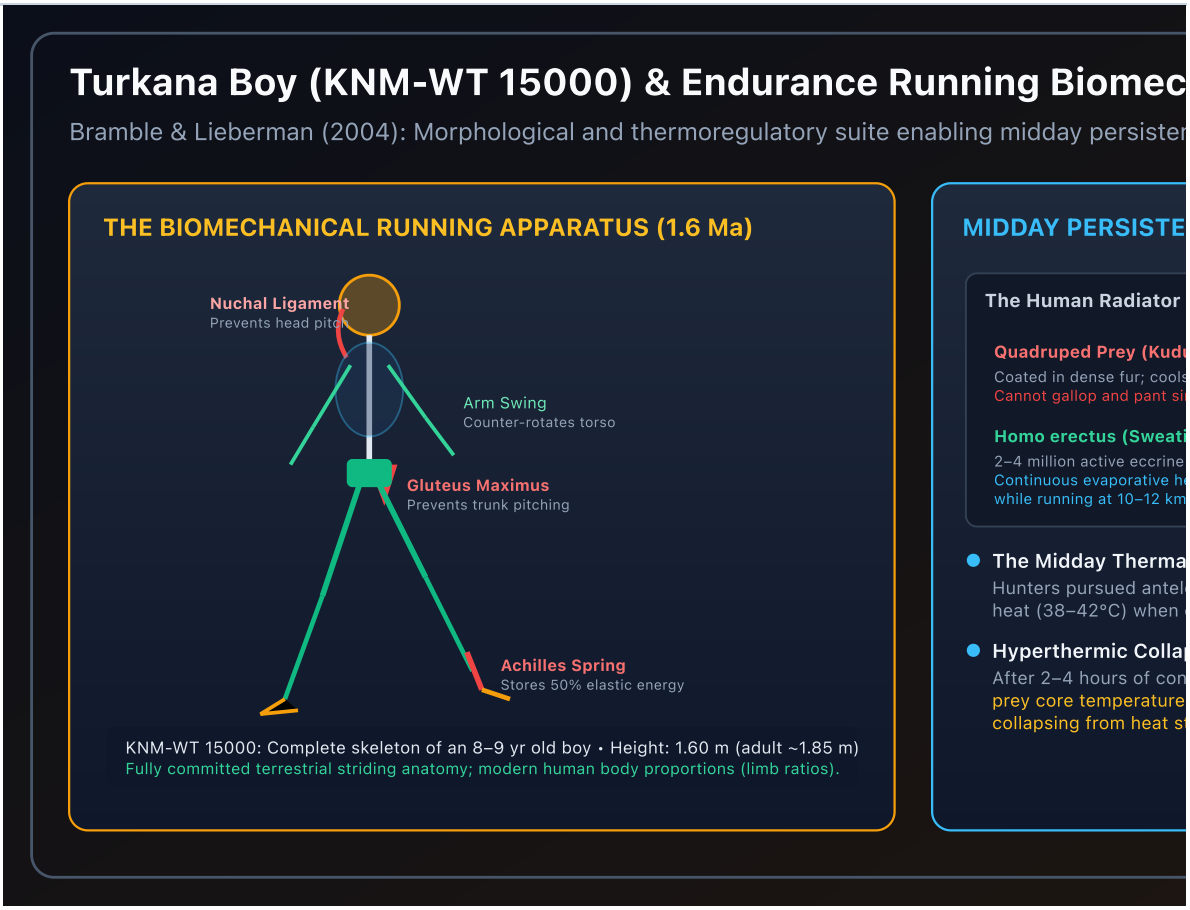
চিত্র ১৯: *চিত্র: পূর্ব আফ্রিকার সাভানায় হোমো ইরেক্টাসের বিজ্ঞানসম্মত পুনর্নির্মাণ (~১.৬ মিলিয়ন বছর আগে); দূরপাল্লার দৌড়ের শরীর, আগুনের ব্যবহার এবং সিমেট্রিক্যাল অ্যাশুলিয়ান কুঠার।*

উনিশ লাখ বছর পূর্বে পূর্ব আফ্রিকার রৌদ্রদগ্ধ সাভানা জন্ম দেয় মানব বিবর্তনের এক অপরাজেয় টাইটান: **হোমো ইরেক্টাস (Homo erectus)**। পূর্বপুরুষদের খর্বাকায় শরীর ও বনমানুষের মতো হাত-পায়ের অনুপাত চিরতরে ত্যাগ করে হোমো ইরেক্টাস ধারণ করে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের মতো লম্বা, ছিপছিপে কঙ্কাল কাঠামো—যা মূলত তৈরি হয়েছিল দূরপাল্লার **ধৈর্যশীল দৌড় বা এনডুরেন্স রানিং (Endurance Running)**-এর জন্য। শরীরের পশম বিলুপ্ত করে এবং লাখ লাখ ঘামগ্রন্থি বিবর্তিত করে তারা পরিণত হয় প্রকৃতির একমাত্র দুপুরবেলার অবিরাম শিকারীতে। তাদের হাতে সাধারণ পাথুরে ফ্লেক রূপান্তরিত হয় নিখুঁত জ্যামিতিক প্রতিসাম্যের **আশুলিয়ান হাতকুড়ালে (Acheulean Handaxe)**। সর্বোপরি, আদিম **আগুনের নিয়ন্ত্রণ** অর্জন করে তারা খাবারের জৈবরাসায়নিক রূপান্তর ঘটায় এবং প্রথম মানব প্রজাতি হিসেবে আফ্রিকা মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে পদার্পণ করে সুদূর জর্জিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও চীনের তুষারাবৃত গুহায়।

১. তুর্কানা বয় (KNM-WT 15000) এবং দূরপাল্লার দৌড়ের বায়োমেকানিক্স

১৯৮৪ সালের আগস্টে কেনিয়ার তুর্কানা হ্রদের তীরে বিশ্বখ্যাত জীবাশ্ম সংগ্রাহক কামোয়া কিমেউ একটি করোটির ক্ষুদ্র টুকরো খুঁজে পান। রিচার্ড লিকি ও অ্যালান ওয়াকারের নেতৃত্বে পাঁচ বছরের অক্লান্ত খননকাজে আবিষ্কৃত হয় **KNM-WT 15000**, যা আজ **“তুর্কানা বয়” (Turkana Boy)** নামে পরিচিত। ১৬ লাখ বছর প্রাচীন এই কঙ্কালটি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে অক্ষত আদিম মানব কঙ্কাল (যার ৮০% হাড় পুরোপুরি সংরক্ষিত):

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ১৯.১: তুর্কানা বয়ের দৌড়ের শারীরিক কাঠামো (KNM-WT 15000, ১৬ লাখ বছর)। বামে: দৌড়ের বায়োমেকানিকাল কাঠামো—মাথার ভারসাম্য রক্ষাকারী নিউকাল লিগামেন্ট, হাত দোলা ও কোমর ঘোরানোর কাউন্টার-রোটেশন, হাঁটার সময় নিষ্ক্রিয় কিন্তু দৌড়ের সময় শরীর খাড়া রাখার দানবীয় গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস এবং ৫০% শক্তি পুনরুদ্ধারকারী অ্যাকিলিস টেন্ডন স্প্রিং। ডানে: বাষ্পীভবন ও ঘামের মেকানিজম—লাখ লাখ এক্রাইন ঘামগ্রন্থির মাধ্যমে ৪০ ডিগ্রি দুপুরে অবিরাম দৌড়ে শিকারকে হিট স্ট্রোকে কাবু করার দৃশ্য।

আধুনিক মানুষের শারীরিক কাঠামো

মৃত্যুকালে তুর্কানা বয়ের বয়স ছিল মাত্র ৮ থেকে ৯ বছর; অথচ তখনই তার উচ্চতা ছিল ১.৬০ মিটার (৫ ফুট ৩ ইঞ্চি) এবং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সে হতো ১.৮৫ মিটার লম্বা ও ৬৮ কেজি ওজনের এক সুঠাম পুরুষ। তার মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় **৮৮০–৯০০ সিসি**—যা অস্ট্রালোপিথেকাসের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো তার শারীরিক অনুপাত: দীর্ঘ ও শক্তিশালী পা, ছোট হাতের বাহু এবং একটি সুবিন্যস্ত সরু ব্যারেল-আকৃতির পাঁজর।

ব্র্যাম্বল ও লিবারম্যানের এনডুরেন্স রানিং হাইপোথিসিস

কেন হোমো ইরেক্টাসের পা এত লম্বা এবং কোমর এত সরু হলো? ২০০৪ সালে হার্ভার্ডের ডেনিস ব্র্যাম্বল ও ড্যানিয়েল লিবারম্যান প্রমাণ করেন যে মানুষ দূরপাল্লার দৌড়ের এক অনন্য বিস্ময়। চারপেয়ে হরিণ বা চিতাবাঘ স্বল্প দূরত্বে মানুষের চেয়ে দ্রুত ছুটলেও, রোদের মধ্যে ১০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ ম্যারাথন দৌড়ে মানুষ পৃথিবীর যেকোনো স্তন্যপায়ীকে হারিয়ে দিতে পারে:

- **নিউকাল লিগামেন্ট (Nuchal Ligament):** বনমানুষদের মাথার পেছনে এই লিগামেন্ট থাকে না কারণ তারা চারপায়ে মাথা অনুভূমিক রাখে। মানুষের খুলির পেছনে একটি হাড়ের খাঁজ তৈরি হয় যেখানে শক্ত রবারের মতো নিউকাল লিগামেন্ট যুক্ত থাকে; দৌড়ের সময় প্রতি পদক্ষেপে মাথাটি যেন সজোরে সামনে ঝুঁকে না পড়ে, এটি মাথাকে স্থির রাখে।
- **শরীরের কাউন্টার-রোটেশন:** বানরদের কাঁধ ও মাথা একসাথে আটকে থাকে। হোমো ইরেক্টাসের ক্ষেত্রে কাঁধ খুলি থেকে মুক্ত হয় এবং পাঁজরের নিচে সরু কোমর তৈরি হয়। ডান পা সামনে যাওয়ার সময় বাম হাত সামনে যায় এবং শরীর বিপরীতমুখী মোচড় দিয়ে কৌণিক ভরবেগকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।
- **গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস (Gluteus Maximus):** মানুষের নিতম্বের এই পেশীটি দেহের সর্ববৃহৎ পেশী। মজার বিষয় হলো, সমতলে হাঁটার সময় এই পেশী প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে! এটি কেবল দৌড়ানোর সময় প্রচণ্ড শক্তিতে সংকুচিত হয়, যাতে পা মাটিতে স্পর্শ করার তীব্র ধাক্কায় সোজা শরীরটি সামনের দিকে ছিটকে না পড়ে।
- **অ্যাকিলিস টেন্ডন স্প্রিং:** পায়ের পেছনের অ্যাকিলিস টেন্ডনটি প্রসারিত হয়ে স্প্রিংয়ের মতো কাজ করে, যা দৌড়ের সময় প্রায় ৫০% গতিশক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তী লাফে ফিরিয়ে দেয়।

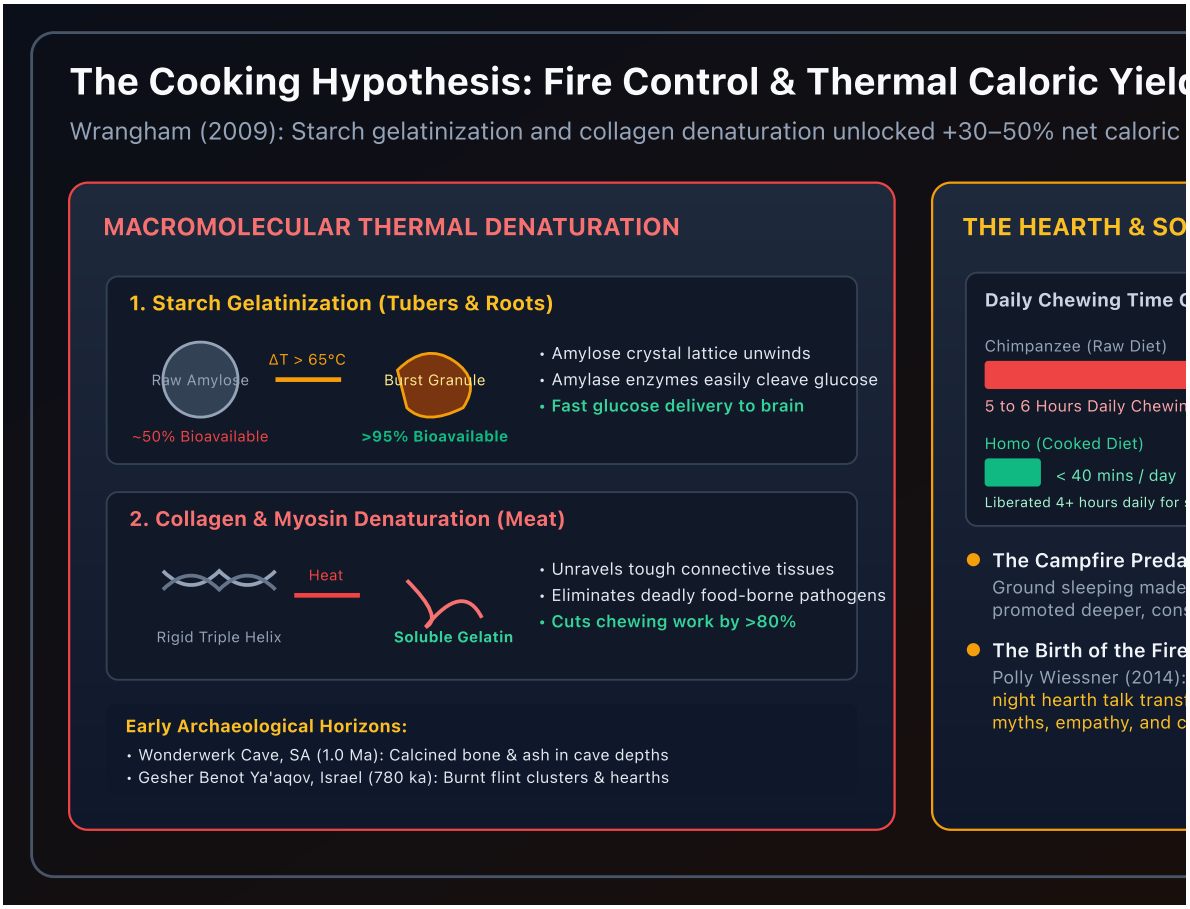
ঘামগ্রন্থির রেডিয়েটর ও পারসিস্টেন্স হান্টিং

দৌড়ানোর সময় স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে বিপুল তাপ উৎপন্ন হয় (১,০০০ ওয়াটেরও বেশি)। হরিণ বা অ্যান্টিলোপের শরীর ঘন পশমে ঢাকা থাকে এবং তারা কেবল হাঁপানোর (Panting) মাধ্যমে জিহ্বা দিয়ে তাপ ছড়ায়। কিন্তু সমস্যা হলো, পূর্ণ গতিতে দৌড়ানোর সময় চারপেয়ে প্রাণী ফুসফুস ও বুকের চাপের কারণে দ্রুত হাঁপাতে পারে না। গরমের দিনে একটানা দৌড়াতে থাকলে তাদের শরীরের তাপমাত্রা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায় ($৪৩^\circ C$)।

হোমো ইরেক্টাস এক অভাবনীয় সমাধান বের করে: **শরীরের লোম ঝরিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন ত্বক এবং ২০ থেকে ৪০ লাখ সক্রিয় এক্রাইন ঘামগ্রন্থির বিকাশ**। খোলা বাতাসে ত্বকের ওপর ঘামের বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মানুষ শরীরকে শীতল রাখতে পারে। এর ফলে তারা আবিষ্কার করে **পারসিস্টেন্স হান্টিং (Persistence Hunting)**: ভরদুপুরে যখন প্রখর রোদ (৩৮\text{–}৪২^\circ\text{C}) থাকে এবং সিংহরা গাছের ছায়ায় ঘুমায়, তখন আদি মানুষ হরিণের পিছু নিত এবং একটানা ২-৩ ঘণ্টা মাঝারি গতিতে তাড়া করে হরিণকে হিট স্ট্রোকে কাবু করে মাটিতে ফেলে দিত।

২. আগুনের নিয়ন্ত্রণ ও রান্নার হাইপোথিসিস

পাথরের হাতিয়ার যেখানে মানুষের শরীরের বাইরে কৃত্রিম দাঁত হিসেবে কাজ করেছিল, আগুনের নিয়ন্ত্রণ সেখানে তৈরি করে এক কৃত্রিম পরিপাকতন্ত্র। ২০০৯ সালে রিচার্ড র‍্যাংহাম তার *Catching Fire: How Cooking Made Us Human* গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে, রান্না করা খাবারই হোমো ইরেক্টাসের মস্তিষ্কের উল্লম্ফন ঘটিয়েছিল:



চিত্র ১৯.২: রান্নার হাইপোথিসিস ও পুষ্টির রসায়ন। বামে: আগুনের তাপে স্টার্চ জেলটিনাইজেশন (শর্করা শোষণের হার ৫০% থেকে বেড়ে ৯৫% হয়) এবং মাংসের শক্ত কোলাজেন তন্তুর ভাঙন। ডানে: সামাজিক বিপ্লব—দৈনিক চর্বণ সময় ৫-৬ ঘণ্টা থেকে কমে মাত্র ৪০ মিনিটে নেমে আসা এবং রাতের ক্যাম্পফায়ারে বন্যপ্রাণী থেকে রক্ষা পেয়ে মানুষের প্রথম গল্প বলা ও সাংস্কৃতিক আড্ডার সূচনা।

রান্নার জৈবরসায়ন

রান্না কেবল স্বাদ বাড়ায় না, এটি পুষ্টির উপযোগিতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করে:

1. **স্টার্চ জেলটিনাইজেশন:** মাটির নিচের কন্দ বা মূলের কাঁচা শর্করা শক্ত স্ফটিকের মতো থাকে, যার মাত্র ৫০% ক্ষুদ্রান্তে হজম হতে পারে। ৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উত্তপ্ত করলে সেই স্ফটিক ফেটে যায় এবং **৯৫% গ্লুকোজ সরাসরি দেহে শোষিত হয়**!
2. **প্রোটিনের রূপান্তর:** আগুনের তাপে মাংসের শক্ত কোলাজেন তন্তু ভেঙে নরম ও সহজে হজমযোগ্য জেলটিনে পরিণত হয়। বিষাক্ত উদ্ভিদের টক্সিন ধ্বংস হয় এবং মাংসের প্রাণঘাতী ব্যাকটিরিয়া মারা যায়।
3. **ক্যালোরির উল্লম্ফন:** পরীক্ষায় দেখা গেছে রান্না করা খাবার **৩০% থেকে ৫০% বেশি কার্যকর ক্যালোরি** সরবরাহ করে এবং পরিপাকের শক্তির অপচয় অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে দেয়।

আগুনের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

লক্ষ লক্ষ বছর আগের ছাই খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও বেশ কিছু প্রাচীন স্থানে আগুনের অকাট্য প্রমাণ মিলেছে:

- **ওয়ান্ডারওয়ার্ক কেভ, দক্ষিণ আফ্রিকা (১০ লাখ বছর):** গুহার প্রবেশমুখ থেকে ৩০ মিটার ভেতরে গভীর অন্ধকারে পোড়া হাড় ও কাঠের ছাই পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করে এটি কোনো দাবানল ছিল না।
- **সোয়ার্টক্রানস, দক্ষিণ আফ্রিকা (১০ লাখ বছর):** ২৭০টিরও বেশি প্রাণীর হাড় উদ্ধার করা হয়েছে যা ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপে নিয়ন্ত্রিত আগুনে পোড়ানো হয়েছিল।
- **গেশার বেনট ইয়াকভ, ইসরায়েল (৭.৮ লাখ বছর):** পোড়া পাথরের হাতিয়ার ও কাঠ নির্দিষ্ট ক্যাম্পফায়ারের বৃত্তাকার চুল্লিতে সাজানো অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সান্ধ্যকালীন আগুন ও সামাজিক বিপ্লব

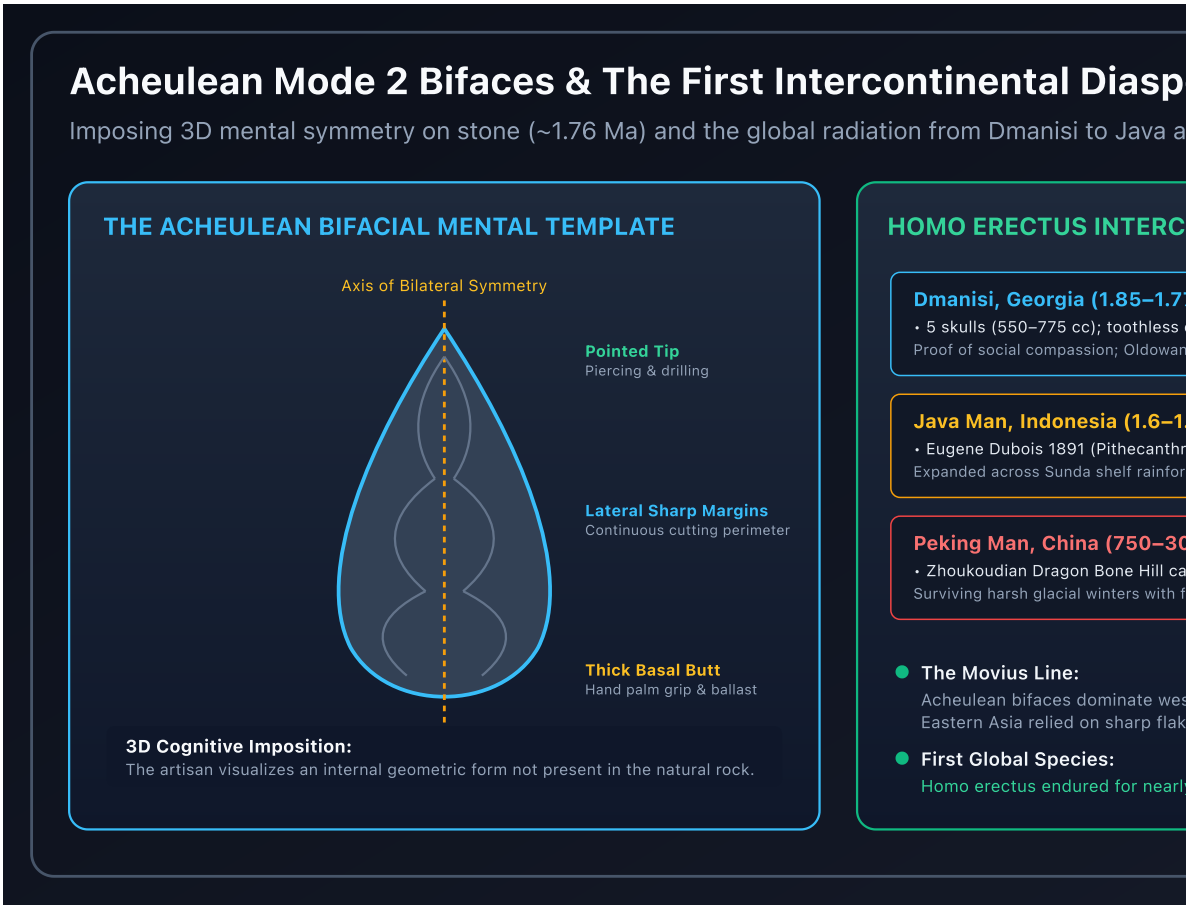
বর্তমান বুনো বনমানুষরা তাদের দিনের **৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় কেবল কাঁচা খাবার চিবিয়ে পার করে**! রান্না করা খাবারের কারণে মানুষের চর্বণ সময় নেমে আসে **দৈনিক মাত্র ৪০ মিনিটে**! এই সাশ্রয়কৃত ৪-৫ ঘণ্টা সময় মানুষ বিনিয়োগ করে হাতিয়ার তৈরি, পরিকল্পনা ও দলীয় বন্ধনে।

তদুপরি, রাতের ক্যাম্পফায়ার হিংস্র হায়েনা ও সিংহের হাত থেকে বাঁচিয়ে এক আলোকোজ্জ্বল অভয়ারণ্য তৈরি করে। লক্ষ লক্ষ বছর পর মানুষ গাছ ছেড়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমোতে শুরু করে। এর ফলে গভীর ও অবিচ্ছিন্ন **REM ঘুম** সম্ভব হয়, যা স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নৃবিজ্ঞানী পলি ওয়াইসনার দেখিয়েছেন, দিনের বেলার কথাবার্তা যেখানে ছিল শিকার ও খাদ্যের হিসাবে সীমাবদ্ধ, রাতের ক্যাম্পফায়ারের স্নিগ্ধ আলো মানুষকে উপহার দেয় রূপকথা, মিথোলজি, সহানুভূতি ও ভাষার এক অপার সাংস্কৃতিক দিগন্ত।

Shakil Mahmud • Research Monograph

৩. আশুলিয়ান মোড ২: হাতকুড়ালের জ্যামিতিক প্রতিসাম্য

প্রায় ১৭ লাখ ৬০ হাজার বছর পূর্বে কেনিয়ার কোকিসেলেইতে পাথুরে প্রযুক্তি প্রবেশ করে তার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক স্তরে: **আশুলিয়ান শিল্প (Acheulean Mode 2)**:



চিত্র ১৯.৩: আশুলিয়ান প্রতিসাম্য ও হোমো ইরেক্টাসের বৈশ্বিক যাত্রা। বামে: টিয়ারড্রপ বা অশ্রুবিন্দুর আকৃতির আশুলিয়ান হাতকুড়াল—যাতে পাথরের উভয় পাশে ফ্লেকিং করে নিখুঁত দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য ও সোনালী অনুপাত (Golden Ratio) খোদাই করা হয়েছে। ডানে: হোমো ইরেক্টাসের বৈশ্বিক মানচিত্র—জর্জিয়ার দিমানিসি (১৮ লাখ বছর) থেকে ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও চীনের ঝৌকৌদিয়ান পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি।

ত্রিমাত্রিক মানসিক টেমপ্লেট

ওল্ডোয়ানের সাধারণ চপারের তুলনায় আশুলিয়ান **বাইফেস বা হাতকুড়াল (Handaxe)** মস্তিষ্কের চরম বিমূর্ত চিন্তার প্রমাণ বহন করে:

1. **উভয়মুখী ফ্লেকিং (Bifacial Knapping):** পাথরের উভয় পিঠ থেকে পাতলা ফ্লেক তুলে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারালো কিনারা তৈরি করা হতো।
2. **দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral Symmetry):** পাথরটির মাঝখান দিয়ে একটি কাল্পনিক রেখা টানলে বাম ও ডান অংশ হবে একে অপরের হুবহু প্রতিবিম্ব। আফ্রিকার অসংখ্য হাতকুড়ালের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত বিখ্যাত **সোনালী অনুপাত ($\Phi \approx ১.৬১৮$)** নিখুঁতভাবে মেনে চলে! কারিগর একটি রুক্ষ পাথরের ভেতরে আগে থেকেই সেই সুন্দর রূপটি কল্পনা করত এবং আঘাতের পর আঘাত দিয়ে সেই রূপকে বের করে আনত।
3. **প্লিস্টোসিনের সুইস আর্মি নাইফ:** এটি ছিল বহুমুখী কাজের অস্ত্র—সূঁচালো ডগা দিয়ে মাটি বা হাড় খোঁড়া হতো, দুই পাশের ধার দিয়ে হাতির চামড়া কাটা হতো এবং গোড়ার ভারী ভোঁতা অংশ হাত দিয়ে ধরে বাদাম বা হাড় ভাঙা হতো।

টানা **১৫ লাখ বছর ধরে**—মানব ইতিহাসের দীর্ঘতম প্রযুক্তিগত যুগ হিসেবে—এই আশুলিয়ান হাতকুড়াল প্রজন্মের পর প্রজন্ম অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত ছিল।

৪. বৈশ্বিক অভিযাত্রা: আফ্রিকার বাইরে প্রথম পদচিহ্ন

রান্না করা মাংসের উচ্চ ক্যালোরি, দূরপাল্লার দৌড়ের ক্লান্তিহীন শরীর এবং আশুলিয়ান হাতিয়ারের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হোমো ইরেক্টাস আফ্রিকার ভৌগোলিক খাঁচা ভেঙে ফেলে। জীবাশ্ম রেকর্ডে ধরা পড়েছে তাদের বিশ্বজয়ের অবিস্মরণীয় পদচিহ্ন:

১. দিমানিসি, জর্জিয়া (১৮.৫–১৭.৭ লাখ বছর)

ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে মধ্যযুগীয় দুর্গের নিচে দাভিদ লর্ডকিপানিডজের দল আবিষ্কার করেন পাঁচটি প্রায় অক্ষত করোটি (যার মধ্যে বিখ্যাত **Skull 5 বা D4500**)। তাদের দেহের উচ্চতা ছিল মাঝারি (১.৫০ মিটার) এবং মস্তিষ্ক ছিল তুলনামূলক ছোট (৫৫০\text{–}৭৭৫\text{ সিসি})—যা প্রমাণ করে আফ্রিকার বাইরে পা রাখার জন্য বিশাল ১,০০০ সিসির মস্তিষ্কের প্রয়োজন ছিল না।

এখানে আবিষ্কৃত **D3444** খুলিটির সমস্ত দাঁত মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই পড়ে গিয়েছিল এবং চোয়ালের হাড়ের গর্তগুলো পুরোপুরি বুজে গিয়েছিল। এই বৃদ্ধ মানুষটি নিজে শক্ত মাংস বা শিকড় চিবিয়ে খেতে পারত না; দলের অন্য সদস্যরা তাকে নরম করে খাবার খাইয়ে বা রান্না করে বাঁচিয়ে রেখেছিল—যা মানব ইতিহাসের **বৃদ্ধদের যত্ন ও সামাজিক সহমর্মিতার প্রাচীনতম প্রমাণ**।

২. জাভা মানব, ইন্দোনেশিয়া (১৬–১০ লাখ বছর)

১৮৯১ সালে ডাচ অ্যানাটমিস্ট ইউজিন ডুবোয়া ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের ত্রিনিল নদীর পাড়ে একটি খুলির ছাদ ও ফিমার হাড় আবিষ্কার করেন এবং নাম দেন *Pithecanthropus erectus*। পরবর্তীতে সাংগিরানে আবিষ্কৃত বহু জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে তৎকালীন বরফ যুগে উন্মুক্ত সুন্দা ল্যান্ডব্রিজ পেরিয়ে হোমো ইরেক্টাস প্রায় বিশ লাখ বছর আগেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ট্রপিক্যাল রেইনফরেস্টে বসতি স্থাপন করেছিল!

৩. পিকিং মানব, চীন (৭.৫–৩ লাখ বছর)

চীনের বেইজিংয়ের কাছে ঝৌকৌদিয়ানের ড্রাগন বোন হিল গুহায় আবিষ্কৃত হয় ৪০টিরও বেশি ব্যক্তির জীবাশ্ম। তাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল **১,০০০ থেকে ১,২২৫ সিসি**। প্রচণ্ড তুষারাবৃত শীতের মধ্যে তারা গুহার ভেতর নিয়ন্ত্রিত আগুন জ্বেলে ও পশুর চামড়া গায়ে জড়িয়ে টিকে ছিল।

মোভিয়াস রেখা (The Movius Line)

১৯৪৮ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক হ্যালাম মোভিয়াস লক্ষ্য করেন যে ভারত মহাসাগরের পূর্বে (চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়) কোনো উন্নত আশুলিয়ান হাতকুড়াল পাওয়া যায় না; সেখানে পাওয়া যায় কেবল সাধারণ ওল্ডোয়ান ফ্লেক। নৃবিজ্ঞানীরা একে বলেন **মোভিয়াস লাইন**। এর কারণ হলো পূর্ব এশিয়ার ঘন বনে সহজলভ্য ছিল **বাঁশ (Bamboo)**—যা পাথরের চেয়ে হালকা, কাঁচের মতো ধারালো এবং দ্রুত পুনর্নবীকরণযোগ্য; কিন্তু জৈব উপাদান হওয়ায় তা জীবাশ্ম স্তরে অবশিষ্ট থাকেনি।

প্রায় বিশ লাখ বছর ধরে হোমো ইরেক্টাস পৃথিবী শাসন করেছিল। কিন্তু মধ্য প্লিস্টোসিনের শেষে বৈশ্বিক জলবায়ুর তীব্র তুষার যুগে তারা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে জন্ম দেয় মানব বিবর্তনের সবচেয়ে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের: নিয়ান্ডারথাল, ডেনিসোভান এবং শেষ পর্যন্ত আধুনিক **হোমো স্যাপিয়েন্স**।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "হোমো ইরেক্টাস, আগুনের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশ্বিক অভিযাত্রা"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ১৯। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-19-homo-erectus-fire-and-global-expansion-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • বিংশ খণ্ড

আর্কাইক মোজাইক এবং আধুনিক মানবজাতির মহাজাগরণ

আর্কাইক মোজাইক এবং আধুনিক মানবজাতির মহাজাগরণ

1,668 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

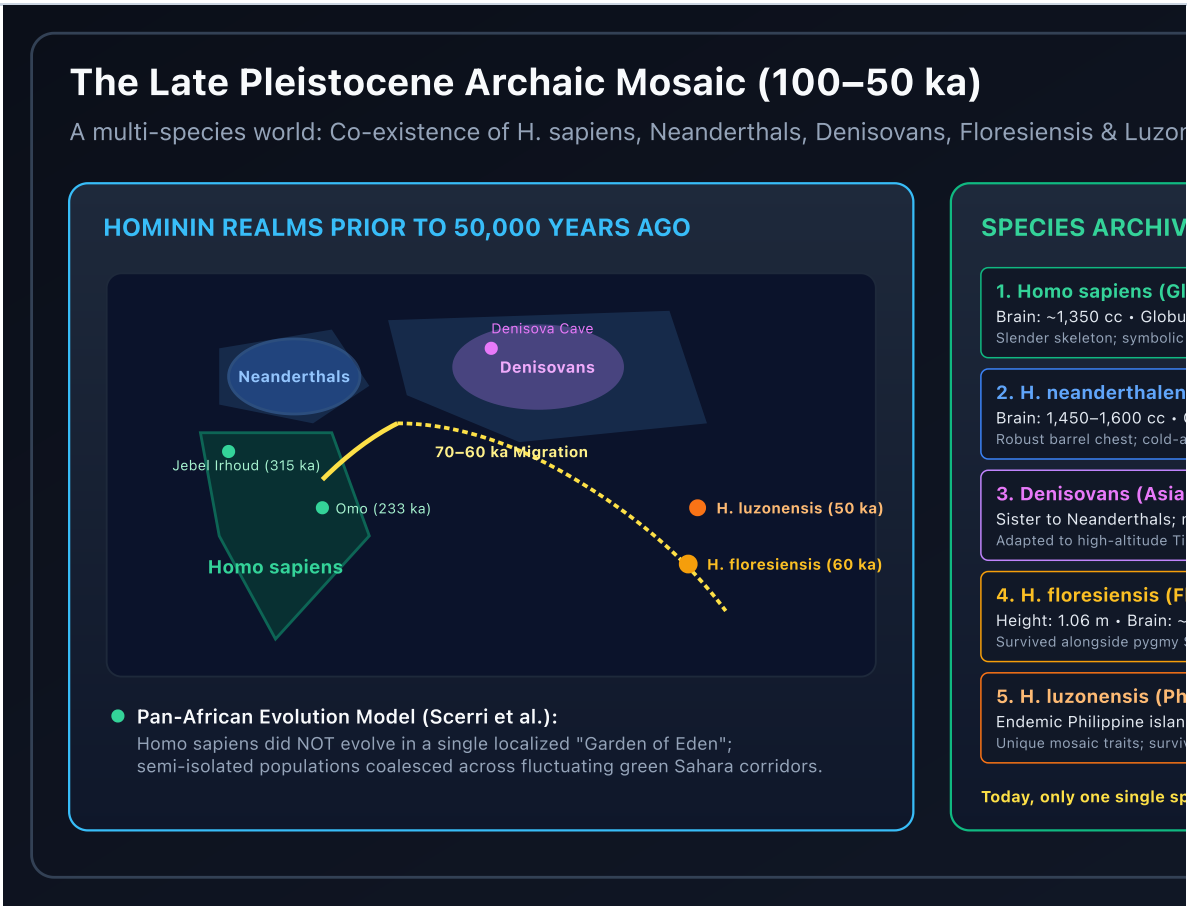


চিত্র ২০: *চিত্র: শোভে গুহার প্রাচীরে আঁকা ঘোড়া ও গণ্ডারের ৩৬,০০০ বছরের প্রাচীন চিত্রকর্ম; প্রতীকী ভাষা, সৃজনশীল মন এবং আধুনিক মানুষের সংজ্ঞানাত্মক বিপ্লবের অকাট্য প্রমাণ।*

তিন লাখ বছর পূর্বে আফ্রিকা মহাদেশের উর্বর ও পরিবর্তনশীল ভূপ্রকৃতিতে জন্ম নেয় আমাদের নিজেদের প্রজাতি: **হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo sapiens)** বা আধুনিক মানব। কিন্তু প্রচলিত গল্পের মতো কোনো একক “ইডেন উদ্যান” থেকে হঠাৎ করে আমাদের উৎপত্তি হয়নি; বরং আমাদের জন্ম হয়েছিল এক প্যান-আফ্রিকান মোজাইক প্রক্রিয়ায়—মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সবুজ সাহারার নদীপথ দিয়ে লক্ষ বছর ধরে জিন ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে। তদুপরি, আমাদের অস্তিত্বের সিংহভাগ সময় আমরা পৃথিবীতে একা ছিলাম না। মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেও এই পৃথিবী ছিল টলকিনের উপন্যাসের মতো বহু-প্রজাতির এক বৈচিত্র্যময় জগৎ—যেখানে আমাদের পাশাপাশি বাস করত বরফ যুগের দানবীয় *নিয়ান্ডারথাল*, সাইবেরিয়া ও তিব্বতের রহস্যময় *ডেনিসোভান*, ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপের বামন মানব বা “হবিট” (*হোমো ফ্লোরেসিয়েনসিস*) এবং ফিলিপাইনের *হোমো লুজোনেনসিস*। প্রাচীন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং প্রমাণ করেছে যে আধুনিক মানুষ তাদের সাথে কেবল বসবাসই করেনি, ভালোবেসে তাদের রক্ত ও প্রতিরোধী জিন নিজেদের জিনোমে ধারণ করেছে। সবশেষে এক মহাজাগতিক **প্রতীকী বিপ্লব (Symbolic Revolution)**-এর মাধ্যমে মানুষ জৈবিক বিবর্তনের গতিপথকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনে রূপান্তরিত করে এবং চারশো কোটি বছরের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মহাবিশ্বকে জানার একমাত্র বুদ্ধিমান চোখ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১. অন্ত্য প্লিস্টোসিনের বহু-প্রজাতির পৃথিবী (আর্কাইক মোজাইক)

বহু বছর ধরে নৃতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক মানুষ আনুমানিক দেড় থেকে দুই লাখ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকার একটি ছোট্ট অঞ্চলে হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে জঁ-জ্যাক উবলাঁর দল মরক্কোর **জেবেল ইরহুদ (Jebel Irhoud)** গুহার আগুনে পোড়া পাথুরে হাতিয়ার থার্মোলুমিনেসেন্স পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানবিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেন। দেখা যায় যে মরক্কোয় আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্স বসবাস করত **৩ লাখ ১৫ হাজার বছর পূর্বে** (৩১৫ ka)—যা আমাদের প্রজাতির উৎপত্তির ইতিহাসকে এক ধাক্কায় এক লাখ বছরেরও বেশি পিছিয়ে দেয়!



চিত্র ২০.১: অন্ত্য প্লিস্টোসিনের আর্কাইক মোজাইক (১০০–৫০ হাজার বছর পূর্বে)। বামে: হোমো স্যাপিয়েন্সের বিশ্বজয়ের পূর্বের গ্রহীয় মানচিত্র—ইউরোপ জুড়ে নিয়ান্ডারথালদের আধিপত্য, সাইবেরিয়া ও তিব্বতে ডেনিসোভানদের রাজত্ব, আফ্রিকার প্যান-আফ্রিকান ক্র্যাডল এবং ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বামন মানব প্রজাতিসমূহ। ডানে: ৫০ হাজার বছর পূর্বে একই সাথে পৃথিবীতে জীবিত পাঁচটি মানব প্রজাতির করোটি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা।

প্যান-আফ্রিকান বিবর্তন মডেল

মরক্কোর জেবেল ইরহুদ (৩১৫ ka), ইথিওপিয়ার ওমো কিবিশ (২৩৩ ka) ও হার্তো (১৬০ ka) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্লোরিসবাড (২৬০ ka)-এর জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে মানুষ কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশে জন্মায়নি। পুরো আফ্রিকা মহাদেশ ছিল হোমো স্যাপিয়েন্সের মাতৃভূমি। আর্দ্র যুগে যখন সাহারা মরুভূমি সবুজ চারণভূমি ও নদীতে রূপ নিত, তখন উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হতো এবং জিন ও হাতিয়ার আদান-প্রদান করত। আমাদের প্রজাতি হলো একটি সম্পূর্ণ মহাদেশের গতিশীল জলবায়ু ও হাজারো জনগোষ্ঠীর এক মহান সমন্বিত সৃষ্টি।

পঞ্চাশ হাজার বছর আগের পাঁচটি মানব প্রজাতি

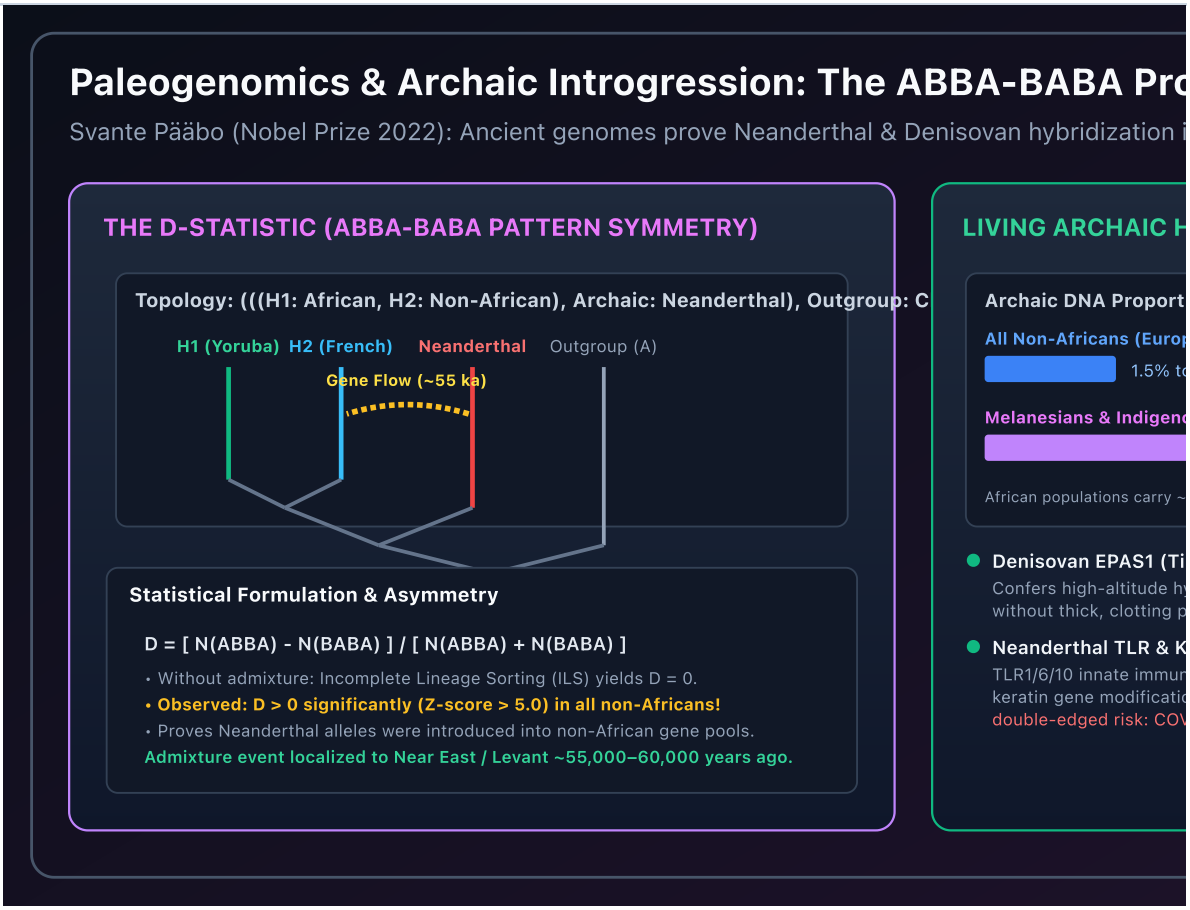
আজ থেকে মাত্র ৫০,০০০ বছর পূর্বেও এই গ্রহে অন্তত পাঁচটি ভিন্ন প্রজাতির মানুষ পাশাপাশি হেঁটে বেড়াত:

1. **হোমো স্যাপিয়েন্স:** গোলাকার করোটি, মুখমণ্ডলের নিচে অবস্থিত সমতল মুখ, গড়ে ১৩৫০ সিসি মস্তিষ্ক এবং প্রাণিজগতের মধ্যে একমাত্র **সুস্পষ্ট চিবুক (True Bony Chin)**-এর অধিকারী।
2. **হোমো নিয়ান্ডারথালেনসিস:** ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার হিমশীতল বরফ যুগের বাসিন্দা। তাদের মস্তিষ্কের আয়তন মানুষের চেয়েও বড় ছিল (১৪৫০\text{–}১৬০০\text{ সিসি})। চওড়া ব্যারেল-পাঁজর এবং খাটো সুঠাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের প্রচণ্ড ঠান্ডায় তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করত।
3. **ডেনিসোভান:** সাইবেরিয়ার ডেনিসোভা গুহার আঙুলের হাড় ও তিব্বতের বাইশিয়ার গুহার চোয়াল থেকে আবিষ্কৃত নিয়ান্ডারথালদের কাজিন প্রজাতি, যারা এশিয়ার বৈরী জলবায়ু ও তিব্বতের উচ্চভূমিতে বসবাস করত।
4. **হোমো ফ্লোরেসিয়েনসিস (হবিট):** ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপের লিয়াং বুয়া গুহায় আবিষ্কৃত বামন মানব প্রজাতি। দ্বীপের সীমিত খাদ্যের কারণে তারা মাত্র ১.০৬ মিটার লম্বা এবং ৪২০ সিসির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হয়েছিল, যা প্রায় ৬০,০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত বেঁচে ছিল।
5. **হোমো লুজোনেনসিস:** ফিলিপাইনের লুজোন দ্বীপে আবিষ্কৃত প্রজাতি (৫০\text{–}৬৭\text{ ka}), যাদের পায়ে ছিল প্রাচীন অস্ট্রালোপিথেকাসের মতো গাছে চড়ার উপযোগী বাঁকানো আঙুল এবং আধুনিক মানুষের মতো ক্ষুদ্র দাঁত।

২. প্যালিয়োজিনোমিক্স: প্রাচীন ডিএনএ এবং এবিবিএ-বিএবিএ (ABBA-BABA) পরীক্ষা

গত এক শতাব্দী ধরে নৃতাত্ত্বিকরা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন: আধুনিক মানুষ কি প্রাচীন নিয়ান্ডারথালদের যুদ্ধ করে মেরে ফেলেছিল, নাকি তাদের সাথে প্রেম ও মিলনের মাধ্যমে সংকরায়ন ঘটিয়েছিল? এই শতবর্ষী বাঁধার চূড়ান্ত সমাধান দেন সুইডিশ জিনতত্ত্ববিদ **সোয়ান্তে প্যাবো (Svante Pääbo)**, যিনি প্রাচীন জীবাশ্ম থেকে ডিএনএ সিকোয়েন্সিংয়ের বৈপ্লবিক গবেষণার জন্য **২০২২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার** লাভ করেন।

Shakil Mahmud • Research Monograph



চিত্র ২০.২: প্যালিয়োজিনোমিক্স ও প্রাচীন সংকরায়ন। বামে: এবিবিএ-বিএবিএ (ABBA-BABA) ডি-স্ট্যাটিস্টিক পরীক্ষা—যাতে অকাট্য গাণিতিক নিয়মে প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়ান্ডারথাল অ্যালিল আফ্রিকা-বহির্ভূত আধুনিক মানুষের ডিএনএ-তে সংকরিত হয়েছে। ডানে: জীবিত মানুষের শরীরে সংরক্ষিত প্রাচীন উত্তরাধিকার—ইউরেশীয়দের দেহে ১.৫–২.৫% নিয়ান্ডারথাল ডিএনএ, মেলানেশীয়দের দেহে ৪–৬% ডেনিসোভান ডিএনএ এবং তিব্বতিদের উচ্চতায় টিকে থাকার ডেনিসোভান EPAS1 জিন।

ডি-স্ট্যাটিস্টিক: সংকরায়নের গাণিতিক প্রমাণ

২০১০ সালে ক্রোয়েশিয়ার ভিন্দিজা গুহার ৪০,০০০ বছরের পুরোনো হাড় থেকে নিয়ান্ডারথালের পূর্ণ জিনোম বের করার পর সোয়ান্তে প্যাবোর গবেষক দল **ডি-স্ট্যাটিস্টিক বা এবিবিএ-বিএবিএ পরীক্ষা** পরিচালনা করেন:

চারটি জিনোম ক্রম বিবেচনা করা হয়: একজন আফ্রিকান মানব (H_1), একজন অ-আফ্রিকান ইউরোপীয়/এশীয় (H_2), একজন নিয়ান্ডারথাল (A) এবং শিম্পাঞ্জি আউটগ্রুপ (O):

- **ABBA প্যাটার্ন:** আফ্রিকান ব্যক্তির মধ্যে আদিম অ্যালিল (A) থাকে, অথচ অ-আফ্রিকান এবং নিয়ান্ডারথাল উভয়ের মধ্যে নতুন মিউট্যান্ট অ্যালিল (B) পাওয়া যায়: $[A, B, B, A]$।
- **BABA প্যাটার্ন:** অ-আফ্রিকানের মধ্যে আদিম অ্যালিল (A) থাকে এবং আফ্রিকান ও নিয়ান্ডারথালের মধ্যে মিউট্যান্ট অ্যালিল (B) পাওয়া যায়: $[B, A, B, A]$।

যদি সংকরায়ন না হয়ে কেবল প্রাচীন জনসংখ্যার বিচ্ছিন্নতা থাকত, তবে সম্ভাবনার নিয়মে ABBA এবং BABA সাইটের সংখ্যা হুবহু সমান হতো ($D = 0$):

$$D = \frac{N(\text{ABBA}) – N(\text{BABA})}{N(\text{ABBA}) + N(\text{BABA})} = 0$$

কিন্তু কোটি কোটি বেস-পেয়ার বিশ্লেষণে দেখা গেল যে প্রতিটি অ-আফ্রিকান মানুষের ডিএনএ-তে **ABBA প্যাটার্ন বিপুল ব্যবধানে BABA-কে ছাড়িয়ে গেছে ($D > 0$, $Z > 5.0$)**! এটি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করল যে নিয়ান্ডারথালদের সাথে আধুনিক মানুষের সংকরায়ন ঘটেছিল। আজ থেকে প্রায় **৫৫,০০০ থেকে ৬০,০০০ বছর পূর্বে** আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশের সময় এই ঐতিহাসিক মিলন ঘটেছিল।

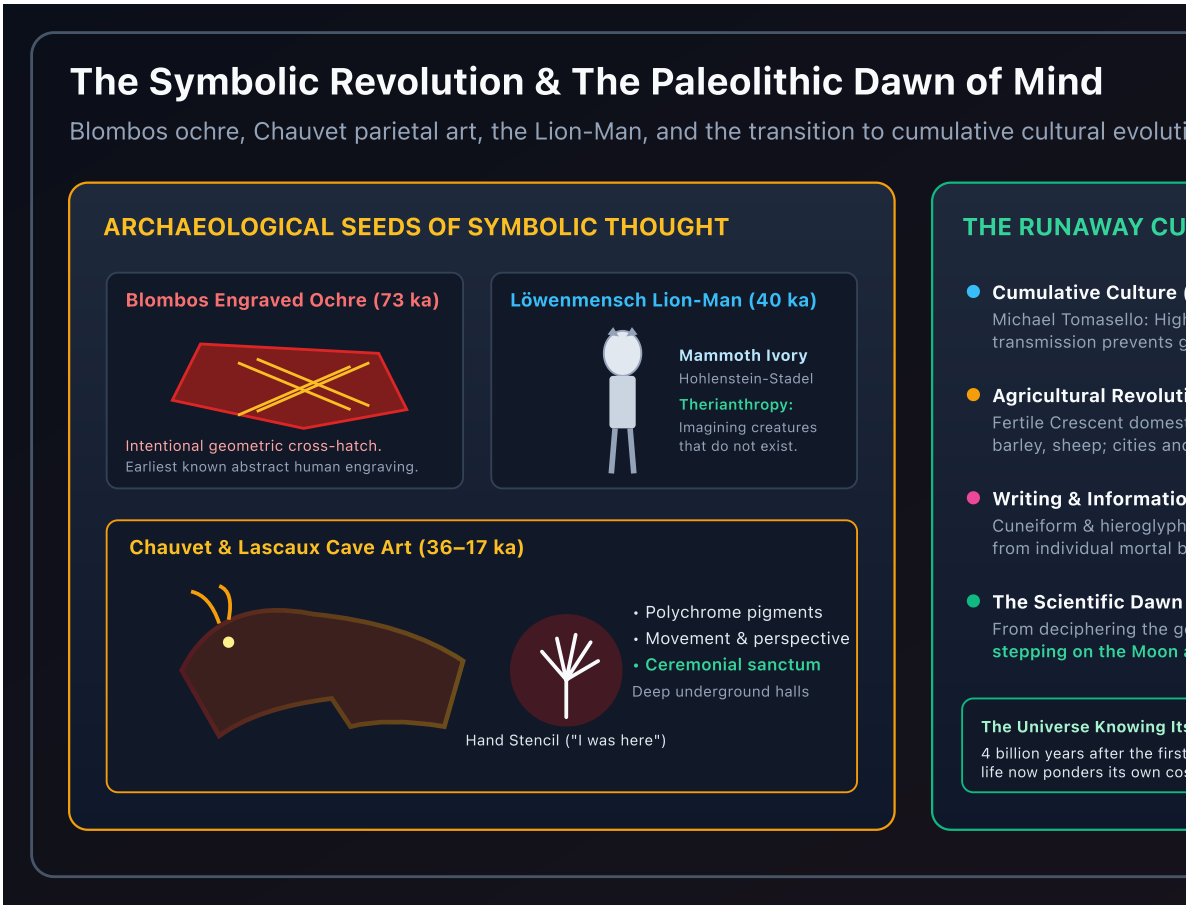
জীবন্ত জেনেটিক উত্তরাধিকার ও অভিযোজন

আমরা কোনো একক প্রজাতির বিশুদ্ধ রক্ত নই; আমরা প্রাচীন মানব প্রজাতির সংকর উত্তরাধিকারী:

- **নিয়ান্ডারথাল ডিএনএ ($১.৫\text{–}২.৫\%$):** আফ্রিকা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের (ইউরোপীয়, এশীয়, আমেরিকান) জিনোমে বিদ্যমান। এই জিনগুলো ইউরেশিয়ার মারাত্মক রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা (যেমন *TLR1, TLR6, TLR10*) দিয়েছিল এবং চামড়া শক্ত করতে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে—যেমন ৩ নম্বর ক্রোমোজোমে থাকা নিয়ান্ডারথাল হ্যাপলোটাইপ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
- **ডেনিসোভান ডিএনএ ($৪\text{–}৬\%$):** পাপুয়া নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং মেলানেশীয়দের জিনোমে বিপুল পরিমাণে টিকে আছে। ২০১৪ সালে বিজ্ঞানী রাসমুস নিলসেন আবিষ্কার করেন যে আধুনিক তিব্বতিরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মিটার ওপরে পাতলা বাতাসে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার যে ক্ষমতা লাভ করেছে, তা এসেছে ডেনিসোভানদের কাছ থেকে পাওয়া একটি উপহার: **EPAS1 জিনের বিশেষ মিউট্যান্ট রূপ!** সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে উঁচুতে গেলে রক্ত অতিরিক্ত ঘন হয়ে স্ট্রোক ঘটে; কিন্তু ডেনিসোভান জিন রক্তকে অতিরিক্ত ঘন না করেই কোষে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।

৩. উচ্চ প্যালিওলিথিক প্রতীকী বিপ্লব এবং মানব মনের মহাজাগরণ

৪৫,০০০ বছর পূর্বে নিয়ান্ডারথাল ও অন্যান্য প্রাচীন প্রজাতি যখন বিলুপ্তির কোলে ঢলে পড়ছিল, তখন আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সের মধ্যে ঘটেছিল এক অবিস্মরণীয় স্নায়বিক ও সাংস্কৃতিক বিস্ফোরণ: **প্রতীকী বিপ্লব (Symbolic Revolution)**।



চিত্র ২০.৩: প্রতীকী বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক মহাজাগরণ। বামে: প্রতীকী চিন্তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ—দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লমবোস গুহার খোদাইকৃত গেরিমাটি (৭৩ হাজার বছর), জার্মানির সিংহ-মানব ভাস্কর্য (৪০ হাজার বছর) এবং ফ্রান্সের শোভে ও লাস্কো গুহার রঙিন বাইসন ও নেগেটিভ হাতের ছাপ। ডানে: মানব অগ্রযাত্রার ধাপ—শিকারি দল থেকে কৃষি বিপ্লব (১২ হাজার বছর), লিখন পদ্ধতি (৫ হাজার বছর), আধুনিক বিজ্ঞান এবং মহাকাশ অভিযানের ঐতিহাসিক যুগসন্ধি।

বিমূর্ত চিন্তার প্রথম জাগরণ

অন্য সমস্ত প্রাণীর থেকে মানুষকে যা আলাদা করেছে তা হলো **প্রতীকী চিন্তাশক্তি (Symbolic Cognition)**—অর্থাৎ বাস্তব জগতের কোনো দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া কেবল মনের কল্পনায় অর্থবহ প্রতীক তৈরি ও শেয়ার করার ক্ষমতা:

1. **জ্যামিতিক খোদাই (ব্লমবোস গুহা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ৭৩,০০০ বছর):** ক্রিস্টোফার হেনশিলউড লাল গেরিমাটির (Ochre) ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে নিখুঁত ক্রস-হ্যাচ জ্যামিতিক নকশা খোদাই করার প্রমাণ আবিষ্কার করেন, যার সাথে পাওয়া গেছে সাগরের ঝিনুক ফুটো করে বানানো ব্যক্তিগত গলার মালা।
2. **সিংহ-মানব বা ল্যোয়েনমেনশ (জার্মানি, ৪০,০০০ বছর):** ম্যামথের দাঁত খোদাই করে তৈরি এই ভাস্কর্যটিতে একটি মানুষের শরীরের ওপর সিংহীর মাথা বসানো হয়েছে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন অ-প্রাকৃতিক ভাস্কর্য—যা প্রমাণ করে মানুষ এমন কিছু কল্পনা করতে শুরু করেছিল যার অস্তিত্ব বাস্তবে নেই: জন্ম নিয়েছিল ধর্মীয় বিশ্বাস, রূপকথা ও শিল্প।
3. **গুহাচিত্রের মহাকাব্য (শোভে ও লাস্কো, ফ্রান্স, ৩৬–১৭ হাজার বছর):** পাতাল গুহার গভীর অন্ধকারে লাল ও কালো রঙ দিয়ে আদিম শিল্পীরা এঁকেছিল বাইসন, উড়ন্ত ঘোড়া এবং গণ্ডারের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এর পাশাপাশি রয়েছে তাদের **হাতের নেগেটিভ স্টেনসিল**—যেখানে পাথরের গায়ে হাত রেখে মুখের ফুঁ দিয়ে রঙ ছিটিয়ে তারা সময়ের বুকে চিরন্তন স্বাক্ষর রেখে গেছে: *"আমি এখানে ছিলাম।"*
4. **সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র (হোহলে ফেল্স, ৪০,০০০ বছর):** শকুন পাখির ডানার হাড় ও ম্যামথের দাঁত ছিদ্র করে তৈরি করা সুষম সুরের বাঁশি প্রমাণ করে মানুষের হৃদয়ে সুরের জন্মও ভাষার মতোই প্রাচীন।

৪. ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক ইঞ্জিন: সমাপনী মহাকাব্য

প্রতীকী বিপ্লবের সাথে সাথে মানব বিবর্তনের চালিকাশক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে সরে এসে রূপ নিল **ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনে (Cumulative Cultural Evolution বা Ratchet Effect)**।

মনোবিজ্ঞানী মাইকেল টমাসেলো দেখিয়েছেন, মানুষের সংস্কৃতির একটি বিশেষ গুণ আছে—একবার কোনো হাতিয়ার বা কৌশল (যেমন সেলাইয়ের সুই, ধনুক-বাণ বা ভেষজ ওষুধ) আবিষ্কৃত হলে ভাষার মাধ্যমে তা পরবর্তী প্রজন্মে অবিকল স্থানান্তরিত হয়; পেছনের দিকে পিছলে যায় না। পরবর্তী প্রজন্ম শূন্য থেকে শুরু করে না, তারা শুরু করে পূর্বপুরুষের শেষ আবিষ্কারের ওপর দাঁড়িয়ে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

সাভানা থেকে নক্ষত্রলোকে

আমাদের চারশো কোটি বছরের জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে চোখের পলক ফেলার মতো সংক্ষিপ্ত সময়—মাত্র বারো হাজার বছরের মধ্যে—সংস্কৃতির এই চাকা ঘুরল উল্কার গতিতে:

- **কৃষি বিপ্লব (১২,০০০ বছর পূর্বে):** মানুষ গম, ধান ও পশু গৃহপালন শিখল। যাযাবর শিকারি দল থিতু হলো স্থায়ী গ্রামে। জন্ম নিল প্রথম শহর, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও রাষ্ট্র।
- **স্মৃতি সংরক্ষণের মুক্তি (৫,০০০ বছর পূর্বে):** সুমের ও মিশরে কিউনিফর্ম ও হায়ারোগ্লিফিক লিপির আবিষ্কার মানব চিন্তাকে একক মস্তিষ্কের নশ্বরতার হাত থেকে মুক্ত করল। একজন মানুষের চিন্তা সহস্র বছর পরেও অবিকল বেঁচে থাকার অমরত্ব পেল।
- **বিজ্ঞান বিপ্লব ও মহাকাশ যুগ (৫০০ বছর–বর্তমান):** পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উন্মোচন করল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতার রহস্য। আমরা আবিষ্কার করলাম ডিএনএর আণবিক নকশা, পদার্পণ করলাম চাঁদের মাটিতে এবং কোটি কোটি মাইল দূরের মহাশূন্যে পাঠালাম জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ।

মহাবিশ্বের নিজেকে জানার চোখ

চারশো কোটি বছর পূর্বে আদিম মহাসাগরের ফুটন্ত অন্ধকার হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের ফাটলে খনিজ প্রকোষ্ঠের ভেতর ক্ষারীয় তরলের মিলনে প্রথম যে অণুটি নিজেকে প্রতিলিপি করতে শিখেছিল—সেখান থেকে আজ পর্যন্ত প্রাণের সেই ডিএনএ শিকল একটিবারের জন্য ছিন্ন হয়নি। বৈশ্বিক তুষার যুগ, মহাসাগরের অক্সিজেনের সংকট, ট্রায়াসিক-জুরাসিক প্রলয়, ডাইনোসরদের মুছে দেওয়া গ্রহাণুর আঘাত কিংবা আফ্রিকার রুক্ষ সাভানার রোদ—কিছুই সেই অবিরাম যাত্রাকে থামাতে পারেনি।

আজ সেই মহাকাব্যের প্রতিটি পদক্ষেপ আপনার নিজের অস্তিত্বের ভেতরে স্পন্দিত হচ্ছে। আপনার রক্তের লবণাক্ততা আদিম সমুদ্রের স্বাক্ষী; আপনার কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া দুইশো কোটি বছর আগের এনডোসিমবায়োসিসের জীবিত দলিল; আপনার কঙ্কালের হাড় চোয়ালহীন প্রাচীন মাছের উদ্ভাবন; আপনার কানের শোনার ক্ষমতা সাইন্যাপসিড সরীসৃপের চোয়াল ভেঙে তৈরি হওয়া বিস্ময়; এবং এই লেখাটি পড়ে বোঝার মস্তিষ্কটি মেসোজোয়িকের নিশাচর স্তন্যপায়ী ও প্লাইস্টোসিনের পাথর খোদাইকারী আদিম মানবের উপহার।

কার্ল সাগান লিখেছিলেন: *“আমরা হলাম মহাবিশ্বের নিজেকে জানার এক সচেতন মাধ্যম।”* প্রাণের চারশো কোটি বছরের এই মহাযাত্রা শেষ পর্যন্ত এমন এক প্রজাতির জন্ম দিয়েছে, যে নিজের উৎপত্তির অতীত রোমন্থন করতে পারে, ভালোবাসতে পারে এবং মহাজাগতিক নীল গ্রহটিকে পরম মমতায় রক্ষা করার শপথ নিতে পারে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "আর্কাইক মোজাইক এবং আধুনিক মানবজাতির মহাজাগরণ"। বিবর্তনের মহাযাত্রা, খণ্ড ২০। https://shakilmahmud.com/bn/evolutionary-odyssey-part-20-the-archaic-mosaic-and-modern-humanity-bn/

আকর গ্রন্থ ও গবেষণা সূত্র

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

এই মনোগ্রাফে আলোচিত তত্ত্ব, গাণিতিক প্রতিপাদন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত আকর গ্রন্থ ও প্রাথমিক গবেষণাপত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:

Darwin, Charles (1859). *On the Origin of Species by Means of Natural Selection.* John Murray, London.

Dawkins, Richard (1976). *The Selfish Gene.* Oxford University Press.

Lane, Nick (2015). *The Vital Question: Energy, Evolution, and the Origins of Complex Life.* W. W. Norton & Company.

Gould, Stephen Jay (1989). *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History.* W. W. Norton & Company.

Shakil Mahmud • Research Monograph

লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

❖

Shakil Mahmud

গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী

শাকিল মাহমুদ একজন স্বাধীন গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের ইতিহাস, আধুনিক ম্যাক্রোঅর্থনীতি, কম্পিউটিংয়ের বিবর্তন এবং স্থান-কালের দার্শনিক তাৎপর্য। তিনি জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গভীর ও সুললিত ভাষায় উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁর সার্বিক কাজ পাওয়া যাবে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা পোর্টাল **shakilmahmud.com** এ।

COLOPHON

Typeset in EB Garamond (English) and Kohinoor Bangla / Noto Serif Bengali (Bengali).
Mathematical typesetting generated with Donald Knuth's TeX algorithms and KaTeX.
Published digitally as a monolithic research monograph by Shakil Mahmud Editorial Series.
Dhaka & Singapore • 2026 • https://shakilmahmud.com